গুরুজনের আদেশও সম্প্রতি পাইয়াছেন, কাজেই রামচন্দ্র তখন গর্ভাবস্থার উপযোগী রথ সজ্জীভূত করতে লক্ষ্মণকে আদেশ দিলেন। লক্ষ্মণ চলিয়া যাইলেন।

পরিশ্রান্তা জানকী তখন আপনার অলস-লুলিত স্বেদসিক্ত বাহু দুইটী রামের বিস্তৃত বক্ষে বিন্যস্ত করিয়া অর্দ্ধশায়িতা হইলে সেই উন্মাদক স্পর্শের ইন্দ্রিয়মোহবিকার রামের চেতনাকে কখন উন্মীলিত, কখন বা বিভ্রান্ত করিতেছিল। সে যে কি, স্পর্শ রাম ঠিক বুঝিতে পারিতেছিলেন না। সীতার একে পূর্ণগর্ভ-ভার, তাহাতে দেহের, ইন্দ্রিয়ের ও মনের শ্রান্তি, তদুপরি শীতল সুখকর পতিস্পর্শ—সীতা রামবাহু উপাধান করিয়া মুহূর্ত্তেই ঘুমাইয়া পড়িল। সেই সুন্দর ঘুমন্ত মুখখানির পানে চাহিয়া, সেই মৃণালদুর্ব্বল অঙ্গলতিতা আলিঙ্গন করিয়া রাম যখন আপনার সুখ-সৌভাগ্যের চিন্তা করিতেছিলেন—এমন সময়ে বিধাতার অভিশাপের মত মূর্ত্তিমান বিরহ দুর্ম্মুখ আসিয়া দ্বারে উপস্থিত হইল। বিরহ ব্যতীত সীতার সবই মধুর, সবই সুন্দর—ঠিক এমন সময়ে সেই বিরহই দেখা দিল। তীব্র সংবেগে বাগ্বজ্র নিক্ষেপ করিয়া রামের সুখ শান্তি শেষ করিয়া দিয়া দুর্ম্মুখ আপনার নামের সার্থকতা সম্পাদন করিল। পরিশেষে ধূমকেতুর মত পশ্চাতে অমঙ্গল ছায়া রাখিয়া প্রস্থান করিল।

এত বড় কুৎসিত নিন্দা যাহারা সীতার চরিত্রে নিক্ষেপ করিল, রামের স্বর্গীয় প্রেম রাজ্যপ্রতিষ্ঠা জন্মের মত নষ্ট করিয়া দিল—সেই ক্ষুদ্রপ্রাণ প্রজারা সাধারণ রাজার বিচারে দণ্ডার্হ বিবেচিত হইত। কিন্তু "লোক গরিমা ব্রতৈকদীক্ষ" মহারাজ রামচন্দ্র সেই প্রজা-দিগকে কিছুমাত্র অনুযোগ করিলেন না, বরং বলিলেন "যচ্চাদ্ভুতং কর্ম্ম বিশুদ্ধিকালে প্রত্যেতু কস্তদ্ধুবি দূরবৃত্তং।" লঙ্কায় আচরিত সেই অগ্নি বিশুদ্ধিরূপ অদ্ভুত কর্ম্ম অযোধ্যার প্রজাবৃন্দের বিশ্বাস না হওয়ারই কথা। একবার যে রাম লক্ষ্মণের মুখে "যাবদার্য্যায়া হুতাশনে বিশুদ্ধিঃ" সীতার অগ্নিশুদ্ধি পর্য্যন্ত এই কথা শুনিয়া বড় গলা করিয়া বলিয়াছিলেন—"উৎপত্তিপরিপূতা সীতার আবার শুদ্ধি কি"? এক্ষণে তিনিই আবার সেই "বিশুদ্ধিকালে" অগ্নিশুদ্ধি সময়ে এই কথাটী ব্যবহার করিলেন। লক্ষ্মণকে যাহা বলিয়াছিলেন—তাহাই তাঁহার অন্তরের কথা, হৃদয়ের দৃঢ় বিশ্বাসের কথা। আর দুর্ম্মুখের নিকট তিনি যে প্রজাদিগের প্রতি-নিধি, দেশের ধর্ম্মার্থকামরক্ষক রাজা—কাজেই তাঁহাকে সাধারণ প্রচলিত ধারণারই অভি-ব্যক্তি লোকমতেরই পুনরুক্তি করিতে হইল। রাজা হইয়া আপনার স্ত্রীর সম্বন্ধে অন্তরের দৃঢ় ধারণা সাধারণ প্রজার বিশ্বাসযোগ্য না হইলে তিনি কেন প্রকাশ করিয়া দুর্ব্বলতা দেখাইবেন? তিনি রাজ্যের শিক্ষা, দীক্ষা, রীতি, নীতি, ধর্ম্ম ও আচারের প্রবর্ত্তক, রক্ষক। কাজেই সাধারণ প্রজার দৃষ্টি লই-য়াই সুবিচারকের বিচার লইয়াই বিচার করিলেন।

"বিশ্রম্ভছরসি নিপত্য লব্ধনিদ্রাং" "প্রিয় গৃহিণী গৃহস্য শোভাং" দৃঢ়বিশ্বাসে চক্ষের উপর পড়িয়া নিদ্রাপ্রাপ্তা গৃহের শোভা প্রিয়গৃহিণী সীতাকে যে ত্যাগ করিতে হইবে, "আতঙ্ক স্ফুরিতকঠোর গর্ভগুর্ব্বী" প্রিয়তমাকে যে সিংহ ব্যাঘ্রাদির বলিরূপে দিতে হইবে, তাহা তিনি তখনই বুঝিতে পারিলেন। সীতার প্রতি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য লৌকিক বিচার করা তিনি আবশ্যক মনে করিলেন না। সীতার চরিত্রে যদি তার বিন্দুমাত্র

সংশয় থাকিত, সুখদুঃখ গণনা করিয়া যদি কার্য্যে অগ্রসর হওয়া তাঁর অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলেই বিচারের আবশ্যক হইলেও হইতে পারিত। সীতার চরিত্র লইয়া বিচার-ইহা অসম্ভব! তাঁহার সম্মুখে প্রজারা কে সাহস করিয়া মনের প্রকৃত ধারণা ব্যক্ত করিবে? সংস্কৃত রামায়ণে রাম লক্ষ্মণাদিকে ডাকাইয়া একপ্রকার বিচারের অভিনয় করিয়া সীতা ত্যাগ করেন। সীতা বিবাসন সত্যকারের আত্মবলি। স্বহস্তে হৃৎপিণ্ডচ্ছেদ বুঝি এত মর্ম্মভেদী নহে। কুশিক্ষা ও কুদৃষ্টান্ত নিবারণার্থই হউক, সূর্য্যবংশের কলঙ্কদূরীকরণ উদ্দেশ্যে বা লোকারাধনা-ব্রতপালন নিমিত্তই হউক—রামের এই কার্য্যে, সীতা-বিবাসন জন্য, সহৃদয় কোমলপ্রাণ দুর্ব্বলমনা ব্যক্তির তাঁহার উপর কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হওয়া কিছু বিচিত্র নহে। এই নির্ব্বাসন ব্যাপারে রামের যে ক্ষোভ, যে মর্ম্মান্তুদ যাতনা, তজ্জন্য গভীর সমবেদনা করেন না—এমন সীতাভক্তও বোধ হয় কেহ নাই। মহারাজ সূর্য্যবংশাবতংস রামচন্দ্রের হস্তপদ, মনপ্রাণ সবই প্রজারাধনা ব্রতের মঙ্গলসূত্রে আবদ্ধ—কাজেই জড়যন্ত্রের মত তিনি সীতা বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইলেন। "ক্রুহি লক্ষ্মণ এষ তে নূতনো রাজা সমাজগপন্নক (কর্ণে এবসেব)" চলিয়া আজ তিনি নিজের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কার্য্যে অগ্রসর হইলেন। সূর্য্যবংশের রাজাসনে না বসিলে ত তাঁহাকে ধর্ম্মপত্নী ত্যাগ করিতে হইত না, সীতার মত প্রিয়তমা, নিষ্কলঙ্কা সহধর্ম্মচারিণীকে হিংস্র ব্যাঘ্র মুখেও দিতে হইত না। আর অযোধ্যার সিংহাসনে বসিয়া ইক্ষাকু বংশীয় কোন রাজাই এমন অপূর্ব্ব নৃশংস কর্ম্ম করিয়া যান নাই—তাই বড় ক্ষোভে, বড় দুঃখে, বড় লজ্জায় রাম আপনাকে নূতন রাজা বলিয়া পরিচিত করিলেন। রাম দুঃখে শোকে অনুতাপে যাহা নৃশংসতার দিক দিয়া অপূ[র্ব্ব] কর্ম্ম করিলেন, আমরা লোকারাধনা ব্রতপালনে[র] দিক দিয়া সেই কার্য্যকে অপূর্ব্বই বলি।

দুর্মুখ চলিয়া গেল। রাজাদিগের চ[র] চক্ষু। কাজেই চক্ষুস্বরূপ দুর্মুখ প্রভু[কে] বঞ্চনা না করিয়া সত্য বলিয়া আপনার কর্ত্ত[ব্য] পালনই করিয়াছে। চক্ষু প্রিয় হউক, অপ্রি[য়] হউক, দুই দেখিতে বাধ্য, আর মনের কা[ছে] তাই পৌঁছাইয়া দেয়। গুপ্তচর দুর্মুখে[র] অপ্রিয়সত্য-কথনই এক্ষেত্রে তাহার ধর্ম্মপালন; এই কর্ত্তব্যকর্ম্ম তাহার নিকটও বড় কঠোর; তথাপি সেই কঠোর কর্ত্তব্য পালনেও পশ্চাৎপদ হয় নাই।

সীতা ত্যাগ করিতে হইবে, রাম বা[ল]কের মত কাঁদিতে লাগিলেন। পরিশে[ষে] বিশ্রান্তশায়িতা সুপ্তা সীতার পদপল্লব মাথ[ায়] লইয়া গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পরিচয় দিলে[ন]। "দেবি অয়ং পশ্চিমস্তে রামস্য শিরসি পদপঙ্ক[জ] স্পর্শ" বলিয়া কাঁদিতে বলিলেন। দেবি, রামে[র] মস্তকে আজ তোমার শেষ পদস্পর্শ—এ কথাটীতে স্বতই সংশয় জন্মে যে, তবে কি রাম মধ্যে মধ্যে সীতার পদদ্বয় মস্তকে গ্র[হণ] করিতেন?

রাম মধ্যে মধ্যে যে সীতার পদদ্বয় মাথ[ায়] করিতেন, এমন কি, কখন কখন করিতে[ন], তাহাও প্রকৃত নহে। তবে সীতার পদ[দ্বয়] যে তাহার মাথায় রাখার যোগ্য, এইরূপ [দৃঢ়] বিশ্বাস তাঁহার ছিল। স্বতঃপূতা জানকী[র] নিকট যে তিনি আপনাকে ক্ষুদ্র মনে করিতে[ন], আপনার অপেক্ষা সীতাকে যে উচ্চাস[নে] বসাইয়া মনে মনে শ্রদ্ধা করিয়া আসিয়াছে[ন], তাহারই অভিব্যক্তি দেখা গেল। র[াম] সীতাকে হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে এত[...]

মনে মনে যে পূজাই করিতেন, "দেবযোনিসম্ভবা" "স্বজন্মানুগৃহীত বসুন্ধরা" বহ্নির মত স্বতঃপবিত্রা সীতাকে যে উপাসনীয়া ভাবিতেন, তাহার পরিচয় পাওয়া যাইল। সীতার প্রভু পতি হইয়া সীতার উপর এতদূর গভীর শ্রদ্ধা, এতাদৃশ গৌরবের ভাব রাম অপর লোককে দূরে থাকু, আপনাকেও জানিতে দিতে চান না। ধর্ম্মতঃ সীতা যে তাঁহার দাসী, সীতার তিনি যে উপাস্য দেবতা, তার নারী-হৃদয়ের সর্ব্বময় প্রভু, তিনি কেমন করিয়া এই সাধারণ-বিরুদ্ধ "মস্তকে পদগ্রহণ কার্যাটা" লোক সমক্ষে করিবেন? আর সীতাই বা কেন তাঁহার দেবতা রামকে পাদস্পর্শ করিতে দিয়া অপরাধিণী হইবেন? আজ সীতা গভীর নিদ্রা-মগ্না, আর আজি সে জন্মের মত চিরতরে বিদায় লইয়া নির্ব্বাসিতা হইতে চলিয়াছে। আজ আর লজ্জা সঙ্কোচ কি? এতদিন আপনার হৃদয়ে সীতার স্থান কিরূপ ছিল, সীতার উপর তাঁহার কি উচ্চ ধারণা ছিল—এক কথায় সীতা কি ছিল—তাহার পরিচয় আজ না দিলে আর কখনও দেওয়া ঘটিবে না। এতদিন যে ভাবটীকে অতি সন্তর্পণে হৃদয়ে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন, আজ তাহার বহিঃপ্রকাশের উপযুক্ত অবসর। এ সুযোগ আর মিলিবে না। অন্তরের প্রতিচ্ছবি আজ বাহির হইয়া দেখা দিল, ধারণা কার্য্যাকারে ব্যক্ত হইল। সীতা অবশ্য জানিল না, তথাপি রাম নিজের অন্তরের কাছে আজ একটী দায় হইতে খালাস পাইলেন। নিজের কাছেই প্রায়শ্চিত্ত করিয়া লইলেন। সীতাকে জানাইয়া বা সীতার জাগরণাবস্থায় করিলে, উহা প্রশংসনীয় কার্য্য হইত না।

এইরূপ মানসিক দুর্ব্বল অবস্থায় কুম্ভীনসী বাক্ষসীর গর্ভজাত মধুদৈত্যের পুত্র লবণের উপদ্রবের কথা শোনা গেল। লবণোৎপীড়িত ঋষিগণ "অব্রহ্মণ্য" বলিয়া অযোধ্যার দ্বারে আসিয়া রামের নিকটে সাহায্যার্থী হইয়া দাঁড়াইলেন। প্রজার প্রতিনিধি আদর্শ নরপতি রামচন্দ্র নিজের দুঃখকষ্ট অমনই ভুলিয়া গেলেন। কঠোর কর্ত্তব্যের টানে আপনার হৃদয়কে গড়িয়া লইয়া শত্রুঘ্নকে লবণদমনার্থ প্রেরণ করিতে মনস্থ করিলেন। বীরত্বের যশোমাল্য শত্রুঘ্নের শিরে অর্পণ করিবেন বলিয়াই চলিয়া যাইতে যাইতে তৎক্ষণাৎ আবার ফিরিয়া ধীরে ধীরে সীতার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আবাল্য-পরিচিত ঘুমন্ত মুখখানির উপর এক বার শেষ সস্পৃহ দৃষ্টিপাত করিলেন। "ভগবতী বসুন্ধরে, তোমার শ্লাঘণীয়া দুহিতাকে দেখিও" বলিয়া ধীরে ধীরে সেস্থান ত্যাগ করিলেন। স্বামীত্যক্তা দুহিতাকে জননী কখন ত্যাগ করেন না। আর অসহায় সীতার সহায়স্বরূপা কেহই নাই। পৃথিবী, তুমি সহায় হইও। রামের কথায় ধরিত্রী তাঁহার জিনিষটী রক্ষা করিলেন। এ কথাগুলি নিজেই রামের কাছে বলেন।

সদ্যোনিদ্রোত্থিতা দুঃস্বপ্নবিপ্রলব্ধা সীতা দুর্ম্মুখের মুখে শুনিলেন যে, "কুমার লক্ষ্মণ বন গমনার্থ রথ সজ্জীভূত করিয়া অপেক্ষা করিতেছেন, এইক্ষণেই যাইতে হইবে। সীতা বনবাসের কথায় আর্য্যপুত্র তোমাকেও কিন্তু যেতে হবে, এই কথা বলায় রাম উত্তর দিয়াছিলেন, "অয়ি কঠিনহৃদয়ে এতদপি বক্তব্যং"—অয়ি কঠিনহৃদয়ে, ইহা আর বলিতে হইবে? কাজেই সীতা জানে, আর্য্যপুত্র সঙ্গেই যাইবেন।

সীতা ধীরে ধীরে দুর্ম্মুখের অনুগমন করিতে লাগিল। তরলপ্রাণা হরিণী বংশী-

নাদ মনে করিয়া আনন্দে ছুটিয়া যাইতেছে। কিন্তু যখন বুঝিতে পারিবে যে, উহা তাহারই মরণের সঙ্কেত, তখন তাহার অবস্থা কিরূপ হইবে? অযোধ্যায় সীতাকে প্রকৃত ব্যাপার কি জানিতে দেওয়া কোন-মতেই নিরাপদ নহে। তাই কাপট্য অবলম্বন আবশ্যক হইল। তপোধনদিগকে, সকল গুরুজনদিগকে আর্য্যপুত্রের চরণকমলে প্রণাম করিয়া সীতা যবনিকা অন্তরালে চলিয়া যাইল। প্রথমাঙ্কের যবনিকা পড়িয়া গেল।

শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী।

সিনেট-সভায় স্যর আশুতোষের সভাজন আলোচনা।

মাননীয় স্যর শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহোদয় হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির পদে একটিন্ নিযুক্ত হইয়াছেন। প্রধান বিচারপতি বিদায় গ্রহণ করিলে জজদের মধ্যে যিনি সিনিয়র, তিনি একটিনি করিয়াই থাকেন—এস্থলে তাহাই হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বেও স্যর রমেশচন্দ্র মিত্র ও স্যর চন্দ্রমাধব ঘোষ একাধিকবার এইরূপ একটিনি করিয়াছিলেন। অতএব ইহাতে অপ্রত্যাশিত বা অভূতপূর্ব্ব কোন ব্যাপার ঘটে নাই। যাহা হউক, তথাপি, দেশের একজন এই অত্যুন্নত পদাভিষিক্ত হইয়াছেন—তাই শিক্ষিত সাধারণ এতদুপলক্ষে আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। বিশ্ব বিদ্যালয়ের সিনেট সভাও স্যর আশুতোষকে সভাজিত করিয়াছেন; তা বেশ। কিন্তু সিনেট্ সভায় যে সভাজন করা হইয়াছে, তদুপলক্ষে উক্তি প্রত্যুক্তিতে আমাদের মনে কিঞ্চিৎ খটকা বাঁধিয়াছে। তাই এই বিষয়ে দু একটা কথা বলা আবশ্যক মনে করিতেছি।

মাননীয় স্যর শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার ভাইস চ্যান্সেলার মহোদয় বলিয়াছেন "He (স্যর আশুতোষ) has advanced the cause of education as no other person in this generation has done" * অর্থাৎ স্যার আশুতোষ শিক্ষা ব্যাপারের যাদৃশ উন্নতি বিধান করিয়াছেন, এতৎকালীন কেহই তাদৃশ করেন নাই।

মাননীয় স্যর নীলরতনকে আমরা একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি বলিয়াই মনে করি। তিনি নিতান্ত দারিদ্র্যাবস্থা হইতে আপন বাহুবলে সমৃদ্ধিবান হইয়াছেন, এবং সত্যের জন্য বিবেকের অনুগত হইয়া পৈতৃক ধর্ম্ম ও সমাজ পরিত্যাগ করিয়াছেন। এতাদৃশ ব্যক্তি যাহা বলিবেন, তাহাতে আমাদের শ্রদ্ধা বিশ্বাস স্থাপন করাই উচিত। যদি কেবল ৮।১০ হাজার ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়ীর আয়তন বাড়িতেছে, আফিসে কেরাণীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, এবং রীডার, লেক্‌চারার, প্রফেসর ইত্যাদি বহু সংখ্যক নিযুক্ত হইতেছেন, এই সকল

---

* ইহা এবং পরবর্ত্তী কোটেসনগুলি বিগত ২৮শে মার্চ্চ তারিখের "বেঙ্গলী" হইতে উদ্ধৃত।

দেখিয়া 'এডুকেশন্ এড্‌ভান্‌স্' করিতেছে মনে করিতে হয়, তবে আমরা নাচার। ফলতঃ এ যুগে কেন, কোনও যুগেই এমন ব্যাপার দেখা যায় নাই। তবে ইহা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হইবে, ইহা প্রত্যাশিত। কিন্তু নিম্নলিখিত ব্যাপার গুলির প্রতি নিরীক্ষণ করিলে স্যর নীলরতন কি শিক্ষার উন্নতি হইতেছে বলিতে পারেন? প্রথমতঃ শিক্ষার অপকর্ষ দেখান যাইতেছে। পূর্ব্বে ১ম শ্রেণীতে পাস্ কম হইত; দ্বিতীয় শ্রেণী এবং তৃতীয় শ্রেণীতেই অধিক ছাত্র পাস্ হইত। এখন প্রথম শ্রেণীতেই (ম্যাট্রি-কুলেশন্ ও আই-এ, আই-এস্ সি-তে অন্ততঃ) সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাস্ হয়—তারপর দ্বিতীয় শ্রেণীতে; তৃতীয় শ্রেণীতে অতি কমই যায়। যে ছাত্রগুলি পাস্ হয়, তাহাদের অপটুতা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। এখনকার আই-এ পাস্ অপেক্ষা পূর্ব্বকার এণ্ট্রান্স পাস্ ছাত্র অধিকতর শিক্ষিত হইত, অনেকেরই এমন ধারণা। তিন চারিটী প্রশ্ন দিয়া যে কোনও একটীর উত্তর চাওয়াতেই বিশেষতঃ ছেলেরা পাস্ করিবার সুবিধা পায় এবং কম পড়িয়া অধিকতর ফললাভ করে। ইহার উপর গ্রেস্ (ফাউ) নম্বর দিবার ব্যবস্থা আছে; ফেইল ছাত্রকে ২।৪ নম্বর ফাউ দিয়া পাস্ করাটা তেমন দোষাবহ নহে; কিন্তু বি-এ অনার্স তথা এম্-এ, পরীক্ষায়ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাস্ হইবার নম্বর রাখিয়াও 'গ্রেস্' পাইয়া প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছে—একথাও শুনা গিয়াছে।

তারপর নানা বিষয়ে এম্-এ পরীক্ষা হইতেছে এবং লেকচারার, প্রফেসর ইত্যাদিও নিযুক্ত হইতেছেন—বাস্তবতঃ দেখাইতেছে ভালই। কিন্তু তাহাতেও প্রকৃত শিক্ষা কত-দূর কি হইতেছে, ভগবানই জানেন। নিয়ম হইয়াছে, যিনি যে বিষয়ে লেক্‌চারার, তিনি সেই বিষয়ে পরীক্ষক থাকিবেন। লেকচারার ও ছাত্র উভয়েরই ইহাতে পরম সুবিধা। অধ্যাপক যতটুকু জানেন ও শিক্ষা দিয়াছেন, সেই সীমার ভিতরেই প্রশ্ন দিলেন, ছাত্রেরাও লেক্‌চারারের নোট্ পড়িয়াই প্রথম শ্রেণীতে পাস্ হইবার উপযুক্ত নম্বর রাখিতে পারে। পূর্ব্বে প্রথম শ্রেণীর কলেজ মাত্রেই নানা বিষয়ে এম-এ পড়াইবার অধিকারী ছিল—এখন আর তাহা হইবার যো নাই। অবশ্য দু একটা কলেজে এম-এ পড়ান হয়, তাও দু একটা বিষয়ে মাত্র। ইহাতে ইউনিভার্সিটী লেক্‌চারারগণের ও ছাত্রবর্গের প্রাগুক্ত সুবিধার পথ প্রশস্তই হইয়াছে। এদিকে কলেজগুলিতে এম্-এ ক্লাস্ না থাকায় অধ্যাপকগণ উচ্চতর বিষয়ে শিক্ষাদান পূর্ব্বক যে আত্মোন্নতি করিতেন, তাহার পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এখন দেখুন, স্যর নীলরতন যে বলেন, শিক্ষা ব্যাপারের উন্নতি হইয়াছে, তাহা কতদূর বিচারসহ।

এই গেল শিক্ষার অপকর্ষ; অতঃপর গুরুতর কথা হইতেছে—নীতির অপকর্ষ। শিক্ষা দ্বারা ত সন্নীতি সদাদর্শ বিস্তার লাভ করিবে? কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, এবিষয়ে আমরা কিঞ্চিৎ হতাশ হইতেছি। স্যর আশুতোষ প্রবল প্রতিভাবান্ এবং প্রকাণ্ড কর্ম্মী, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তদীয় মহনীয় চরিত্রে দুএকটা এমন ছিদ্র আছে—যাহাতে ঐ সকল গুণ সত্ত্বেও আমরা তাঁহার বিরুদ্ধে দু চারি কথা না বলিয়া পারি না। সেটা আমাদের দুর্ভাগ্য—কিন্তু আমরা নিরুপায়।

তাঁহার প্রধান দোষ, তিনি স্তুতিবাদে গলিয়া

যান। যদি তিনি স্বকীয় সম্পত্তি হইতে স্তাবকদের পুরস্কার বিধান করিতেন, তাহা হইলে আমাদের কোনও কিছু বলিবার ছিল না। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় "সর্ব্বশুক্লা সরস্বতীর" নিকেতন—ইহার পরিচালনায় স্তাবকের প্রশ্রয় দেওয়া কি উচিত? তাঁহার নামে উৎসর্গকরা হইয়াছে, এমন অনেক পুস্তক পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছে। পরীক্ষক হইতে হইলে তাঁহার আলয়ে যাতায়াত করিতে হয়—এ ধারণাও লোকের মনে জন্মিতে পারিয়াছে। স্তর আশুতোষের স্বভাবসিদ্ধ অমায়িকতাবশতঃ সকলেই তাঁহার বাড়ীতে গিয়া দেখা সাক্ষাৎ আলাপ পরিচয় করিতে পারে। এটা ভালকথা—কিন্তু তখন চাটুবাদের অবসর পাইয়া কত স্বার্থপর লোক যে স্বকার্য্যোদ্ধার করিয়া তাঁহাকে অপযশের ভাজন করিয়াছে—তাহার ইয়ত্তা নাই। আবার আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ (বোধ হয় এইরূপ লোকদেরই প্ররোচনায়) স্তর আশুতোষ সামাজিক কোনও কোনও বিষয়ে এমন দু একটা কাজ করিয়াছেন, যাহাতে সমাজে মতান্তরমূলক দলাদলি হইয়া পড়িয়াছে। কতকগুলি স্বার্থপর লোক ঐ সূত্রেও তাঁহাকে পঙ্কে ফেলিয়া উহাদের আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে। স্তোকবাক্যে অন্ধীকৃত হইয়া (অতি চতুর হইলেও) তিনি ইহাদের হাত এড়াইতে পারেন নাই—"দূর হ শয়তান্" বলিয়া তাড়াইয়া দেন নাই।*

সে যাহা হউক, এই দলাদলির আঁচ বিশ্ববিদ্যালয়কেও স্পর্শ করিয়াছে। যাঁহারা নির্ভীক প্রতিবাদী, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রুটী-মৎস্য' (লোভস্ এণ্ড ফিসেজ্) হইতে বঞ্চিত আছেন। †

সে যাহা হউক, ইহা অপেক্ষাও একটী গুরুতর দোষ স্তর আশুতোষে অধুনা দেখিতে পাইতেছি—তাহা স্বীয় আত্মীয় কুটুম্বের বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে পৃষ্ঠপোষণ। জামাতা শ্রীমান্ প্রমথনাথ ভাল পাস্ করা ছেলে, সন্দেহ নাই। তথাপি তাঁহার এই অল্প বয়সে সেনেটে ‡ তথা সিণ্ডিকেটে প্রবেশ লাভ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদ প্রাপ্তি, তথা স্তর আশুতোষের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ রমাপ্রসাদের এম-এ, পাস্ করিয়াই আই-এ,-পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াও বি, এ, পরীক্ষকতা লাভ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে নিয়োগ; এই দুই ব্যাপার না ঘটিলেই শোভন হইত। §

---

* এরূপ করা দূরে থাকুক, তিনি এ সকল ব্যক্তি দ্বারা কার্য্যসাধনও করিয়া থাকেন। শুনিয়াছি, কোনও মোরব্বি সদৃশ ব্যক্তি তাঁহাকে এরূপ লোকের সংশ্রব না রাখিতে বলায়, তাঁহাকে নাকি স্তর আশুতোষ বলিয়াছিলেন "বড় বড় জেনারেল যেমন স্কাউট রাখেন, এগুলিও তাদৃশ জানিবেন"। কথা সত্য হইলে স্তর আশুতোষ নিজকে শত্রুসঙ্কুল সমরক্ষেত্রের জেনারেল মনে করেন, দেখা গেল। এ মনবৃত্তি কি স্পৃহনীয়?

† শুনা যায়, মুখ্যতঃ এরূপ কারণেই নাকি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কারমাইকেল অধ্যাপক হইতে পারেন নাই। এ বার্ত্তা শুনিয়া জনৈক অধ্যাপক বলিয়া উঠিয়াছিলেন—

"মাশুতোষ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ
হরপ্রসাদমূলজ্যা ভাণ্ডার্কে করুণা যতঃ।"

‡ সিনেট শব্দটী লেটিন সেনিস্ (=বৃদ্ধ) শব্দ হইতে জাত; ফলতঃ রোমের সিনেট সভা বয়োবৃদ্ধ দেরদ্বারাই গঠিত হইত। কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে বৃদ্ধকে পরাভূত করিয়া নবযুবকেরা প্রবেশলাভ করিতেছেন, ইহাও শুভাবহ বলিতে পারি না।

§ একই বৎসরের মধ্যে স্তর আশুতোষের (১) জামাতা প্রেমচাঁদ বৃত্তি পাইলেন (২) জ্যেষ্ঠপুত্র এম-এ পরীক্ষায় প্রথম (৩) মধ্যমপুত্র আই-এ পরীক্ষায় প্রথম এবং (৪) তৃতীয়পুত্র মেট্রিকুলেসন্ পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিলেন। অনেকেরই ইহাতে বিস্ময়ের সঞ্চার হইয়াছে। এই বৎসরটা অন্ততঃ স্তর আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাদির সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত থাকিতে পারিলে ভাল হইত না কি? অনেক প্রশ্নপত্রও যে তাঁহার সঙ্গে পরামর্শক্রমে রচিত হয়।

স্যর আশুতোষের ছেলে বা জামাতা তৎ-কর্ত্তৃক পৃষ্ঠপোষিত হইবেন, এটা বিশেষ কিছু অন্যায় নহে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কে না হওয়াটাই ভাল ছিল। কেননা, এইরূপ বিষয় শিক্ষার্থী যুবকগণের গোচরীভূত যত কম হয়, ততই ভাল—যেহেতু এটা ভাল 'আদর্শ' নহে। ইতঃপূর্ব্বে গ্রেস্ দিয়া পাসের কথা বলা হইয়াছে। আবার এই গ্রেস্ দেওয়া ব্যাপার যদি ব্যক্তি বিশেষের অনুরোধে হয়, তবে ইহা কতদূর অন্যায়,তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। এরূপটাও হইতেছে বলিয়া আমরা শুনিতে পাইতেছি। তাহার সব কথা সত্য না হইতেও পারে কিন্তু

মৃষা বা সত্যং বা হরতি মহিমানং জনরবঃ।

ফলকথা এভাবে নৈতিক অপকর্ষ যে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে কিছুটা আসিয়াছে, একথা অস্বীকার করা যায় না—এবং ঐ অবস্থায় সৎশিক্ষার উন্নতি হইতেছে, ইহা বলা চলে কি?

এই যে ১৯২৭ সালে একাধিকবার মেট্রি-কুলেশনের প্রশ্ন চুরি ঘটিল, ইহার দ্বারাও কি নৈতিক অধঃপতনের সূচনা হইতেছে না? অপ্রীতিকর বিষয় আর ঘাঁটিব না; কিন্তু এসব সত্ত্বেও আজকাল শিক্ষার 'উন্নতির' কথা সাজে কি? আশা করি, বিচক্ষণ স্যর নীল-রতন এ সকল ব্যাপারের একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন।

স্যর নীলরতনের প্রশংসাবাদের উত্তরে স্যর আশুতোষ যাহা বলিয়াছেন, এখন তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। তিনি বলিয়াছেন "I began life as a research student in Mathematics when re-serch was unknown in this country. And the mission of my life was to be a research professor in my University. Mr. Justice Bannerji, who was then Vice-chancellor of this University made a desperate attempt to create a chair for me, but such were the times that he failed to collect even a modest in-come of Rs. 4000 a year which was all that he and I thought would be sufficient to maintain me as a research Professor. The con-sequence was that I drifted into Law etc." অর্থাৎ তিনি গণিত বিষয়ে গবেষক ছাত্ররূপে জীবন আরম্ভ করেন—তখন এদেশে গবেষণা বলিয়া একটা জিনিস যে আছে, তাহা কেহ জানিত না। নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে 'রিসার্চ্চ প্রফেসর' হওয়াই তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল। তখন জষ্টিস্ বন্দ্যোপাধ্যায় (স্যর গুরুদাস) ভাইস্-চান্সেলার ছিলেন—তিনি বার্ষিক ৪০০০৲ টাকা মাত্র বৃত্তি বরাদ্দ করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই—এমনই তখনকার অবস্থা ছিল। ঐ ৪০০০৲ টাকা মাত্র বার্ষিক হইলেই তিনি (স্যর আশু-তোষ) রিসার্চ্চ প্রফেসাররূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যথেষ্ট মনে করিতেন। তাহা না পাওয়াতে তাঁহাকে আইনের প্রবাহে উদ্ধ-মান হইতে হইয়াছিল। ইত্যাদি—। তাঁহার এই বক্তৃতার সারবত্তা পরীক্ষা করা যাউক। প্রথমতঃ তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বে এদেশে 'রিসার্চ্চ' কেহ জানিত কিনা, দেখা যাউক। স্যর আশুতোষের জন্মের প্রায় ৮০ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটী সংস্থাপিত হয়—ইহার উদ্দেশ্য কি, তাহা সকলেই জানেন এবং এখনও ইহা বর্ত্তমান আছে। তারপর কলিকাতায়ই 'এশিয়াটিক রিসার্চেস্' প্রকাশিত হয়—ইহারও নামটার কি অর্থ দেখুন। স্যর উইলিয়ম জোন্স্,

কোলব্রুক, উইল্‌সন্‌, কনিংহাম প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষিগণ এদেশে একটা গবেষণার যুগ প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন; তাহাতে এতদ্দেশীয় ব্যক্তিগণও যোগদান করিয়াছিলেন—তন্মধ্যে ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের নাম সর্ব্বাগ্রে গ্রহীতব্য। সুতরাং তাঁহার পূর্ব্বে এদেশে 'রিসার্চ্চ' কেহ জানিত না, এ কথাটা স্যর আশুতোষের বলা কতদূর সঙ্গত, দেখুন। বিজ্ঞান বিষয়েও বোধ হয় স্যর আশুতোষের জন্মের সমকালেই ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার 'বিজ্ঞান-সভা' স্থাপন করিয়াছিলেন—স্যর আশুতোষ কার্য্যজীবনে প্রবেশের প্রারম্ভে সেই এসোসিয়েশনে গণিত বিষয়ক আলোচনা করিতেন। তারপর তাঁহার অপর উক্তির চর্চ্চা করিব। স্যর গুরুদাস ভাইস্-চান্সেলার হন ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে এবং ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ঐ কাজে ছিলেন। স্যর আশুতোষের কথার ভাবে এই বুঝি যে, তিনি স্যর গুরুদাসের ভাইস্-চান্সেলারির সময় পর্য্যন্ত আইনের দিকে মনোযোগ দেন নাই—কিরূপে "রিসার্চ্চ" প্রফেসর হন, সেই চেষ্টায়ই তন্ময় ছিলেন। এখন স্যর আশুতোষের আইন সম্বন্ধীয় পড়াশুনার যতটা আমরা জানিতে পারিয়াছি, নিম্নে বিবৃত হইতেছে :—

(১) ১৮৮৪।৮৫।৮৬ এই তিন বৎসর তিনি ঠাকুর ল-লেক্‌চারগুলি এটেণ্ড (attend) করিয়া প্রতিবারই ~~পরীক্ষা~~ প্রদানপূর্ব্বক প্রথম হইয়া ঠাকুর স্বর্ণপদক পাইয়াছিলেন।

(২) ঐ সময়েই তিনি 'ল' ক্লাসে পড়িতেছিলেন এবং ১৮৮৮ সনে বি-এল, পাস্ করেন।

(৩) তৎসমকালেই বোধ হয় তিনি হাইকোর্টে ওকালতী করিবার জন্য স্যর রাস-বিহারী ঘোষের আর্টিক্‌ল্ ক্লার্ক ছিলেন।

(৪) তৎকালে (১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের পর) 'অনর্স-ইন্-ল' পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন এবং ১৮৯১ সনের নবেম্বরে ঐ পরীক্ষা দেন।

এখন পাঠকবর্গ বিবেচনা করিয়া দেখুন, আইন তাঁহাকে কোন্ সময়াবধি আকর্ষণ করিয়াছিল। তারপর তিনি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ৪০০০৲ টাকা মাত্র বার্ষিক পাইলেই সন্তুষ্ট হইয়া 'রিসার্চ্চ প্রফেসর'রূপে জীবন কাটাইতে পারিতেন। এই উক্তির চর্চ্চা করিতে গিয়া প্রথমতঃ জিজ্ঞাসা করিব, স্যর আশুতোষ কি অর্থের কাঙ্গাল ছিলেন? তাহার পিতা স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় একজন সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন—এমন কি, তিনি তদীয় পুত্রগণের শিক্ষার্থে যথেষ্ট অর্থব্যয় করিতে পারিয়াছিলেন। হেমন্তকুমারের মৃত্যু হইলে স্যর আশুতোষই পৈতৃক বিত্তের একমাত্র উত্তরাধিকারী হন। অতএব তাঁহার সাংসারিক অবস্থা বেশ স্বচ্ছলই ছিল। দ্বিতীয়তঃ তিনি তখনও ষ্টুডেণ্টশিপ্ পাইতেছিলেন। তাঁহার "জিওমেট্রি অব্ কনিকস্" দ্বারাও বিস্তর আয় হইতেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক হইয়াও ইচ্ছা করিলে তিনি বিলক্ষণ দুপয়সা পাইতে পারিতেন।* তৃতীয়তঃ গবেষণার দিকে প্রবল ঝোঁক থাকিলে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসার না হইতে পারিলেও প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রফেসর অনায়াসে হইতে পারিতেন। এবং এমনও শুনিয়াছি,

* শুনিয়াছি, তিনি নাকি পরীক্ষায় ফিস্ গ্রহণ করেন নাই। পূর্ব্বে সিণ্ডিকেটের মেম্বরগণ পরীক্ষক হইতেন না। তা যদি অর্থোপার্জ্জনের প্রয়োজন হইত, সিণ্ডিকেটে না গেলেও ত পারিতেন।

তাঁহাকে ঐ পদে নিযুক্ত করিবার জন্য শিক্ষা-বিভাগের কর্তৃপক্ষীয়ের ইচ্ছাও ছিল—তিনিই নাকি গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারই প্রায় সমসাময়িক স্যর জগদীশচন্দ্র ও স্যর প্রফুল্লচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে কাজগ্রহণ করিয়া গবেষণায় জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন। তিনিও সেই পথ ধরিলে পৃথিবী-বিখ্যাত ও চিরস্মরণীয় হইতে পারিতেন। তবে "সাতমণ তেলও পুড়িবে না রাধাও নাচিবে না" এই ন্যায়ে, তাঁহার কথায় ইহাই বোধ হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে রিসার্চ্চ প্রফেসরের সৃষ্টিও হইল না—স্যর আশুতোষও রিসার্চ্চ কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন না। আর আইন ব্যবসায় করিতে গেলেও যাঁহার ভিতরে প্রকৃত গবেষণার ঝোঁক আছে, তিনি তদ্বিষয়ে কার্য্য করিবেনই—দৃষ্টান্ত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়; মফঃস্বলে থাকিয়াও ইনি যাহা করিয়াছেন, তজ্জন্য বাঙ্গালী শিক্ষিত-সমাজ চিরকাল গৌরব বোধ করিবেন।

ফলকথা, স্যর আশুতোষ যাই বলুন না কেন, তিনি Minerva দেবীর অপেক্ষা Juno দেবীরই সমধিক ভক্ত। তিনিই তো নাকি এক সময় বলিয়াছিলেন "Had I not been a Judge of the High Court I would have been a Professor."—তিনি হাইকোর্টের জজ না হইলে অধ্যাপক হইতেন। তাঁহার পঠদ্দশা হইতে আমরা তাঁহার খবর কিছু কিছু রাখি—তাহাতে আমাদের এই ধারণা যে, তিনি একটা 'বড় লোক' হইবেন—এমন আর কেহ ন ভূতো ন ভবিষ্যতি—এই যেন তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য। তাই উপাধির মালা গাঁথিয়া নামটা যতদূর দীর্ঘ হইতে পারে, করিতে কসুর করেন নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের যতটা বোর্ড বা কাউন্সিল আছে, প্রধান প্রধান প্রায় সবটারই প্রেসিডেন্ট হইতে সম্মতিদান করিয়াছেন—এবং যতটা নাগাল পাওয়া যায়, প্রায় সব ব্যাপারেই সংসৃষ্ট হইতে পশ্চাৎপদ হন নাই। ফলতঃ এতটা কাজ যিনি করিতে সাহসী হন, তাঁহাকে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতে হয়—তবে এইরূপ ব্যক্তি শমগুণসম্পন্ন রিসার্চ্চকারী হইতে পাবেন না। এই ব্যাপারে ধ্যান ধারণা একাগ্রসাধনার প্রয়োজন—এই সব স্যর আশুতোষে ততটা দেখা যাইতেছে না।

আর এক কথা। স্যর আশুতোষ এই যে আজ সিনেটের অভিনন্দনের উত্তরে এই কথাটা বলিলেন—সেটা পূর্ব্বে স্যর গুরুদাস জীবিত থাকার সময়ে বলেন নাই কেন? তিনি সায়েন্স্ কলেজের ভিত্তি স্থাপন কালে শোভনতরভাবে ইহা বলিতে পারিতেন।

তার পর আছে, "I made a determination at the time that, Heaven willing, I would devote myself to the Service of the University so that in the next generation any aspiring scholars in my position might not drift into Law and they might have adequate opportnnities to devote themselves to the cause of science and learning. It has been given to me through the inspiring example of many distinguished countrymen of mine foremost amongst them men like Sir Rasbehari Ghose, Sir Taraknath Palit, the Maharaja of Cossimbazar, the Maharaja of Durbhanga and others, to lay the foundations of a teaching University in Calcutta. And I do

not now regret that I drifted into Law. If I had not taken to Law and attained the position and influence which carry weight in the world, it might never have been given to me to do for my University what I have been able to achieve." অর্থাৎ তিনি তদবধি মনে মনে সংকল্প করিয়াছিলেন যে, তাঁহার ন্যায় কোনও উচ্চাভিলাষী ছাত্র যাহাতে বাধ্য হইয়া আইনজীবী না হয়, ভগবদিচ্ছা থাকিলে সে উদ্দেশ্য সাধনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবায় আত্মনিয়োগ করিবেন। স্যর রাসবিহারী ঘোষ, তারকনাথ পালিত, কাশিমবাজারের অধিপতি, দ্বারভাঙ্গার মহারাজ প্রভৃতি স্বদেশের মুখ্য ব্যক্তিগণের অনুপ্রাণনাময় দৃষ্টান্তে প্রণোদিত হইয়া তিনি কলিকাতায় একটা "টীচিং ইউনিভার্সিটির" গোড়া পত্তন করিয়াছেন। তিনি আইন ব্যবসায়ে বাধ্য হইয়া যাওয়ার নিমিত্ত এখন আর অনুতাপ করেন না—কেন না, যদি আইনের ব্যবসায়ী না হইতেন—আর এই সংসারে যেরূপে পদ, প্রদার্থ প্রতিপত্তি জন্মায় তাদৃশ ক্ষমতাশালী না হইতেন, তবে তিনি তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহা করিতে পারিতেন না। এই উক্তিতে আত্মগরিমা প্রকটনের ভাব যে টুকু ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা নাই ধরিলাম। কিন্তু এই বাক্যগুলি ত বিনা বিচারে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। তাঁহার কথার মর্ম্ম এই নহে কি যে, তাঁহার দ্বারাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়টা "টীচিং ইউনিভার্সিটি" হইতে চলিয়াছে; বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন যে রীডার, প্রফেসর, লেক্‌চারার ইত্যাদি নিযুক্ত হইতেছে, এই সকল তাঁহারই কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত, এটাই যেন তিনি লোককে বুঝাইতে চাহিতেছেন। এখন এই বিষয়ে একটু বিচার করিব।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়, তখন ইহা একটী পরীক্ষাসমিতিরূপেই থাকিবে—এরূপ আইন করা হয়। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২ আইন (একট অব ইনকর্পোরেশন) দ্রষ্টব্য। তারপর ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়কে কতক সম্পত্তি উইল করিয়া দিয়া ঠাকুর আইন অধ্যাপক পদের সৃষ্টি করিয়া যান। এই 'টীচিং' আরম্ভ হইল; ১৮৭০ সন হইতে ঠাকুর ল প্রফেসর সন সন নিযুক্ত হইয়া আসিতেছেন। তারপর, বোধ হয়, শ্রীগোপাল বসুমল্লিক-প্রবর্ত্তিত 'বেদান্ত লেক্‌চার' ১৮৯৭ সন হইতে প্রবর্ত্তিত হয়। সরকার বাহাদুর অবশ্য এ সকল বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া আসিতেছিলেন। লর্ড কর্জ্জন যখন গবর্ণর জেনারেল, তখন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে নূতন ছাঁচে ঢালাই করিয়া গড়িবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন নিযুক্ত করেন এবং কমিশনের রিপোর্টের ফলে * ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান ইউনিভার্‌-

---

* ইণ্ডিয়ান্ ইউনিভার্সিটিজ কমিশনের "টীচিং ইউনিভার্সিটি বিষয়ক রিকমেণ্ডেশন ঐ কমিশনের রিপোর্টের ৬—৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। উহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল :—

"There is also a very general desire that the powers in question (i. e. of the Universities) should be enlarged and that all Universities should be recognized as teaching bodies. * * * 'We think it expedient that undergraduate students should be left in the main, to the Colleges, but we suggest that the Universities may justify their existence

সিটিজ একৃট নং ৮ পাস করেন। সেই আইনের তৃতীয় ধারায় এই আছে :—

"—Incorporation and power of the University—The University shall be and shall be deemed to have been, incorporated for the purpose (among others) of making provisions for the instruction of students with powers to appoint University Professors and Lecturers to hold and manage educational endowments, to erect, equip, and maintain University Libraries, laboratories and Museums, to make regulations relating to the residence and conduct of students, and to do all acts consistent with the Act of incorporation and this Act which tend to the promotion of study and research."

এই আইন পাস হইবার পরে আইনের ২৬(২) ধারা মতে সেনেট্ সভার উপরে রেগুলেশন্‌স্ রচনার ভারার্পণ হয়। তখন স্যর আলেক্‌জাণ্ডার পেড্‌লার ভাইস-চান্‌সেলার ছিলেন। সিনেট সভা প্রথমতঃ এক বৎসর সময় পান, তৎপর আরও ছয় মাস সময় পাইলেও নূতনকল্পে নিয়মাবলী গঠনের গুরুতর কাজ শেষ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তখন স্বয়ং গবর্ণমেণ্ট রেগুলেশন্ গঠনের কাজ আইন অনুসারে নিজ হাতে নিতে বাধ্য হন—তথাপি সিনেট সভাকে তাঁহাদের আরব্ধ কার্য্য শেষ করিতে দিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট কাজটী সম্পন্ন করিবার ভার একটী কমিটির হাতে সমর্পণ করেন—সেই কমিটিতে স্যর আশুতোষ প্রেসিডেণ্ট হন—কেন না, তখন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনিযুক্ত ভাইস-চান্‌সেলার ছিলেন। সিনেটের কৃত কার্য্যটী স্যর আশুতোষ ও তদীয় সহযোগিরা মাজিয়া ঘষিয়া সংস্কৃত করিয়া নেন এবং তখন রেগুলেশন্ সরকার বাহাদুর কর্ত্তৃক পাস হয়।

অতএব দেখুন, এই 'টীচিং ইউনিভার্সিটি' গঠনে অথবা যে রেগুলেশন্ দ্বারা ইহা চলিতেছে, তাহাতেও স্যর আশুতোষের হাত কতদূর—এই প্রফেসর ইত্যাদি নিয়োগ করিবার বিধান তাঁহার দ্বারা কতদূর উদ্ভাবিত! স্যর আশুতোষের পরিবর্ত্তে যদি তখন অপর কোনও ইংরেজ বা বাঙ্গালী ভাইস-চান্‌সেলার হইতেন, তথাপি ঐ সকল রেগুলেশন্ প্রায় এ ভাবেই হইত।

তবে স্যর আশুতোষের কর্ত্তৃত্ব কিছু কি ছিল না? অবশ্যই ছিল। এবং ঈপ্সিত বিষয়ে যোগ্যতা সহকারে যিনি কার্য্য করিবেন, গবর্ণমেণ্ট দেখিয়া শুনিয়া তাদৃশ লোকই নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং এবিষয়ে মহাকবি কালিদাস দুষ্মন্তের মুখে ঠিকই বলিয়াছেন—

> সিধ্যন্তি কর্ম্মসু মহৎস্বপি যন্নিয়োজ্যাঃ
> সম্ভাবনা গুণমবেহি তমীশ্বরাণাম্।
> কিংবা ভবিষ্য দরুণস্তমসাং বিভেত্তা
> তং চেৎ সহস্র কিরণো ধুরি না করিষ্যৎ॥

---

as teaching bodies by making further and better provision for advanced courses of Study. The University may appoint its own lecturers and provide libraries and laboratories; it would also be proper that the University should see that residential quarters are provided for students from a distance." * * * * *

বলা আবশ্যক যে, এই কমিশনে স্যর আশুতোষ ছিলেন না; তবে ইহার কলিকাতায় বৈঠকে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে একজন লোকেল মেম্বরের মত ছিলেন; কিন্তু রিপোর্টের সঙ্গে তাঁহার কোনও সংশ্রব ছিল না।

কিন্তু হায়, চয়ন্তের বিনয়ৌদার্য্য স্যর আশুতোষে কোথায়? সে যাহা হউক, সেই সময়ের কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ স্থাপিত হয়—স্যর রাসবিহারী ইহার প্রেসিডেণ্ট এবং স্যর আশুতোষ চৌধুরী-প্রমুখ অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি তাহার পরিচালক হন। স্যর তারকনাথ পালিত তাঁহার সম্পত্তির অধিকাংশ শিক্ষা-পরিষদের হস্তে দিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। তখন স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহোদয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সেই বিত্তটা বিশ্ব বিদ্যালয়ের খাতে আকৃষ্ট করিয়া আনেন। * অপিচ স্যর রাসবিহারীও তাঁহার বদান্যতার স্রোত শিক্ষা পরিষদের প্রত্যাশিত খাতে না বহাইয়া বিশ্ব বিদ্যালয়ের হিতার্থেই প্রবাহিত করিলেন—ইহাতেও স্যর আশুতোষের কিছুটা হাত থাকিবারই কথা। এদিকে পরীক্ষকদের পারিশ্রমিক কমিয়া পরীক্ষার্থীদের ফিস্ বাড়িল, তখন বাঙ্গালী ভাইস চান্‌সেলার বলিয়াই হয়তো কোনও আন্দোলনই হয় নাই—বিশেষতঃ ছাত্রদের পাসের খুব সুবিধা হওয়াতে লোক সাধারণে ঐ ফিস্ বৃদ্ধি গ্রাহ্য করিল না। সরকার বাহাদুরও তখন স্যর আশুতোষের অধিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠ-পোষণ যথাসম্ভব করিতে ত্রুটী করেন নাই—এমন কি, পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গবর্ণমেণ্টের কোনও কোনও ব্যাপারেও ভারত সরকার বিশ্ববিদ্যালয়েরই পক্ষ সমর্থন করেন। অবশ্য ঐ সকল স্যর আশুতোষের খুব শ্লাঘার কথা, সন্দেহ নাই, এবং কর্ম্মকরী শক্তি যে তাঁহার অতুলনীয়, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। গবর্ণমেণ্টও তাঁহাকে একাদিক্রমে ৮বৎসর ভাইস্-চান্‌সেলার পদে নিযুক্ত রাখিয়া তাঁহার মনোনীত ও পৃষ্ঠপোষিত সদস্য দ্বারা সিনেট্ ও সিণ্ডিকেট্ প্রভৃতভাবে পরিপূরিত হইবার সুবিধা দিয়া তাঁহাকে অসাধারণ ক্ষমতাবান্ করিয়া দিয়াছেন। * কিন্তু আসল কথা এই যে, 'টিচিং ইউনিভার্সিটি' করাটা তিনিই যোগাড় যন্ত্র করিয়া ঘটাইয়াছেন, ইহা বলা শোভন হয় নাই—ঐটা সরকারেরই উদ্দিষ্ট বিষয়—তবে তিনি সরকারি কার্য্য বেশ দক্ষভাবেই করিয়াছেন—সেজন্য সরকারও যথেষ্ট পুরস্কার দিয়াছেন।

তবে প্রফেসার ইত্যাদি নিয়োগ ব্যাপারে তিনিই কর্ত্তৃত্ব করিয়াছেন, এবং তাহাতে সব সময়েই যে যোগ্যতমের নিয়োগ হইয়াছে, সেই কথা বলিতে পারি না। ইতঃপূর্ব্বে অবান্তরভাবে তাহার দৃষ্টান্তও দেওয়া হইয়াছে। অনেকে বলেন, প্রফেসর প্রভৃতি পদে অধিকাংশ স্থলেই যে বাঙ্গালীর নিয়োগ হইতেছে—† এটা স্যর আশুতোষেরই কর্ত্তৃত্বের ফল। সে কথাও আমি সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতে পারি না। বরং তাহার

* এই ব্যাপারে স্যর নীলরতনেরও কিঞ্চিৎ কৃতিত্ব ছিল বলিয়া শুনিয়াছি।

* কিন্তু স্যর আশুতোষ ভারত সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতার ভাব বজায় রাখিতে পারেন নাই। নিজের মাহাত্ম্য প্রকটিত করিয়া "In spite of Government of India" বলিয়া খুব সম্ভব সরকারের কিঞ্চিৎ বিরক্তি উৎপাদন করিয়াছেন, তাই ইদানীং কোন কোন বিষয়ে সরকারের সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরোধ দেখা যাইতেছে।

† ঘোষ ও পালিত প্রফেসরগণ যে ভারতবর্ষের লোক হইবেন, ইহা এণ্ডাউমেণ্ট এর সর্ত্তেই আছে। তবে কেবল 'বাঙ্গালী' নহে—'ভারতবর্ষের যে কোনও প্রদেশের অধিবাসীই হইতে পারেন। এইরূপ সর্ত্তে স্যর আশুতোষের হাত থাকিতে পারে। কিন্তু তাহাতে "বাঙ্গালী" অজ্ঞাত প্রদেশবাসীর সঙ্গেই গণনীয় হইতেছেন।

ভাইস চ্যান্সেলারির সময়ে শ্রীগোপাল বসু মল্লিক ফেলোশিপ কোনও বাঙ্গালী পণ্ডিত বা এম-এর ভাগ্যে পড়ে নাই, বেহারী পাণ্ডেয় রামাবতার সাহিত্যাচার্য্যকে আমদানি করা হয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বা জগদীশ চট্টোপাধ্যায়কে না দিয়া কারমাইকেল প্রফেসরশিপ মারাঠী পণ্ডিত ভাণ্ডারকরকে প্রদান করা হইয়াছে। এবং সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপালগিরিও মাদ্রাজের কোনও এক ব্যক্তিকে দিবার প্রস্তাব স্যর আশুতোষের নামে প্রচারিত হইয়াছে। *

এ দিকে, যাহাতে তাঁহার হাত ছিল না, সেই ঠাকুর-আইন-অধ্যাপক-গিরিতে কয়জন সাহেব নিযুক্ত হইয়াছিলেন? ফলকথা, যে কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তি তাহার স্থলাভিষিক্ত থাকিলে যোগ্যতম ব্যক্তিরই নির্ব্বাচন হইত।

স্যর আশুতোষ সিনেটের অভিনন্দনের উত্তরে উপসংহারে বলিয়াছেন—"To me it is a source of intense satisfaction that I enjoy the confidence of you all as my colleagues and all my educated countrymen out-side the walls of this house." অর্থাৎ তিনি যে সিনেটে সহযোগিবর্গের ও সিনেটের বাহিরেও শিক্ষিত দেশবাসিগণের বিশ্বাসভাজন আছেন, ইহা তাঁহার পক্ষে পরম সন্তোষের কথা।

এ বিষয়েও তিনি বোধ হয় ঠিক বলেন নাই। তিনি এখন আর তেমন জনপ্রিয় থাকেন নাই। অবশ্য সিনেট হলের মধ্যে তাঁহার উপরে লোকের ভক্তি বিশ্বাস অব্যাহত থাকিতে পারে—কিন্তু বাহিরে তাঁহার প্রতি সকলেরই যে শ্রদ্ধাভাব আছে, এটা বোধ হয় না। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ইলেক্‌শনে রেজিষ্টার্ড গ্রেজুয়েটরা যেরূপ আগ্রহ সহকারে তাঁহাকে ভোট দিয়াছিলেন, এবার সেরূপ উৎসাহ দেখা যায় নাই—ভোটসংখ্যা অনেক কম দেখা গিয়াছে। মেট্রিকুলেশন্ ও আই-এ ইত্যাদির ফিস্ বৃদ্ধি ব্যাপারে একদিকে যেমন জনসাধারণ আপত্তি করিয়াছে, অপর দিকে গবর্ণমেণ্টও সম্মতি প্রদান করেন নাই, কিন্তু অনেকেরই আবার তাঁহার স্কাউটদের জন্য কিঞ্চিৎ ভীতির ভাবও আছে, এ কথাটা দুঃখের সহিতই বলিতে হইল।

স্যর আশুতোষ চীফ-জাষ্টিসের একৃটিনি পাওয়ায় যে অভিনন্দিত হইতেছেন, তাহার কারণ প্রারম্ভেই বলিয়াছি; ইহাতেই যদি তিনি মনে করেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারেও সমস্ত লোকেরই তিনি শ্রদ্ধাবিশ্বাসের পাত্র, তবে, আমার বোধ হয়, তিনি কিঞ্চিৎ ভ্রান্তির ভাবই পোষণ করিতেছেন।

উপসংহারে পুনশ্চ বলিতেছি, মাননীয় স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের অশেষ কার্য্যদক্ষতা ও সুবিমল প্রতিভায় আমরা মুগ্ধ; বিচারক হিসাবে তাঁহার সুখ্যাতি অনবদ্য। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়সংক্রান্ত কোন কোন বিষয়ে তাঁহার সম্পর্কে অপ্রীতিকর কথা এই নব্যভারতেই ইতঃপূর্ব্বে একাধিক বার বলিয়াছি, এবারও বলিতে হইল। ইহা দুঃখের বিষয়, সন্দেহ নাই। পরন্তু আমাদের 'আল্‌মা মাতর্' বিশ্ববিদ্যালয় মালিন্য লেশশূন্য এবং তাঁহার এক জন প্রকৃষ্ট সন্তান ও সেবক স্যর আশুতোষ অবর্ণসম্পর্করহিত হন, ইহাই আমাদের আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দেশ্য, তাই এতাদৃশ অপ্রিয় সত্য কথনে অধ্যবসায়ী হইয়াছি।

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা।

* এ সকলে অনুমান হয়, স্যর আশুতোষ ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে এক এক ভক্ত সৃষ্টি করিয়া যাইতে চান। ভাণ্ডারকর মহাশয় ত জন্মতিথি উৎসব প্রবর্ত্তিত করিলেন—মাদ্রাজের মহোদয় যদি আসেন, তিনি কি করিবেন, কে জানে?

মহাত্মা শিবনাথ শাস্ত্রী।

ভাঙিল ধর্ম্মের স্তম্ভ, কাল বজ্র হানি'
"শিবনাথ বিসর্জ্জন" স্তব্ধ ব্রহ্মবাণী.
হায়! বঙ্গ রঙ্গ সাঙ্গ হোল এত দিনে আজ।
শোকাচ্ছন্ন হোল দেশ সমগ্র সমাজ।
নিদারুণ বার্ত্তা, মাগো, পাঠালে ভুবনে,
হারায়ে দুর্ল ভ রত্ন পুত্র-প্রাণ-ধনে,
বল মা ভারতী দেবি, জন্মিবে তোমার
হেন রত্ন শিরোমণি সন্তান কি আর? ১

নিখিল, যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম সনাতন,
দূর ভবিষ্যতে শিরে করিবে বরণ
সেই বিশালতা ব্যাকুলতা এক ধর্ম্ম প্রেমে
উজ্জ্বল করিল দেখ, চরিত্রের হেমে।
ধর্ম্মের বেদীতে করি আত্ম-বলিদান,
বিশ্বহিত সেবাব্রতে কর্ম্মে ঢালি প্রাণ,
মানবে মানবে প্রীতি জাতির কল্যাণে
দেখাল আদর্শ কীর্ত্তি ভারত সন্তানে। ২

বিচ্ছিন্ন দেশের দশা ভাবি অনুক্ষণ
বাঙ্গালীর ভেদাভেদ যত অকারণ
হেরি, স্বজাতি, রমণী দুঃখ করি হায় হায়!
কাঁদিল সতত প্রাণ জননীর ন্যায়।
কত না দুর্জ্জয় বিঘ্ন দুঃখ আজীবন
"কর্ত্তব্য সাধন কিম্বা" শরীর পাতন,
এই দীক্ষা ভিক্ষা মাগি' দশের ভিতরে
উড়াল ধর্ম্মের ধ্বজা দেশ দেশান্তরে। ৩

সুললিত বঙ্গভাষা স্বভাবের কবি,
নীতি বিদ্যা জ্ঞান শাস্ত্র সাহিত্যের রবি,
আহা! বিনয়ে মণ্ডিতচিত ভাষার নির্ঝ র—
কোমল করিল যত পাষাণ অন্তর।
"উদ্যোগী পুরুষসিংহ তেজস্বী সরল,
উদার চরিত্রবান্ গভীর অটল
সর্ব্বগুণে অলঙ্কৃত শক্তি ভক্তি লয়ে—
জন্মেছিল, তব অঙ্কে সুন্দর সময়ে। ৪

হের আজ তাঁর শোকে কাঁদে সর্ব্বদেশ,
শুধু একা হিন্দু নহে জাতি নির্ব্বিশেষ।
রিপু জয়ে আত্মত্যাগে সত্যের প্রচার
পতিত মর্ত্ত্যের আর কে লইবে ভার?

এ উদ্যান শূন্য হায়! ফুরাল সকলি,
সৌরভ গৌরব স্মৃতি, রাখি গুণাবলী
মাহাত্ম্য গরিমা প্রভা, হোল অবসান—
দিগঙ্গনা গাহে শোন হাহাকার গান। ৫

"আর কে দিবে গো অন্যে করিয়া আপন
হৃদয়ে হৃদয় বাঁধি প্রেম আলিঙ্গন"—
এক তোমার দেবতা মাগো, বিশ্ব বিধাতার
আর কে পূজিবে বল? অশ্রু অনিদ্রায়।
অমর সে নরলোকে চির বিদ্যমান,
মরণে অমৃত-সুত মহা ভাগ্যবান,
সার্থক মানব জন্ম ধন্য সেই জন—
জননী, দেশের দুঃখ যে ক'রে মোচন। ৬

কাঙাল দুঃখীর ব্যথা বাজিল স্মরণে,
বিগলিত হয় অশ্রু যাদের নয়নে,
ধন্য দুর্ল ভ সন্তান হেন রত্ন গুণধরে,
ধর মাগো বসুমতি, তোমার জঠরে।
চিরস্থায়ী চিরদিন নহে কিছু ভবে,
জন্মিলে মরিবে ধ্রুব এক দিন সবে,
পূর্ণ হোক ইচ্ছা মাগো কর পুনঃ তুমি
নিখিলের তীর্থ শ্রেষ্ঠ, এ ভারত ভূমি। ৭

হে রুদ্র শ্মশান তুমি ওমা ভাগীরথি—
বিধিদত্ত প্রিয় নিধি যুগ-ধর্ম্ম-রথী,
ওগো, বহু পুণ্য ভাগ্য বলে আজ যা' লভিলে,
অনলে অনিলে জলে, রেখো তারে তুলে।
হে আপন দেশবাসী তোমাদের বলি,
এইরূপে নেতৃবৃন্দ সবে গেল চলি,
এ মিনতি করি শুধু এই স্মৃতি লয়ে-
হও মানুষের মত, তাঁদের অরিয়ে।" ৮

যাও তবে 'শিবনাথ' যাও ধর্ম্মগুরু,
রোপিলে বঙ্গের ভূমে তুমি যেই তরু,
ইতিহাস তব গাথা গাবে নিশি দিন,
মরেও অমর তুমি রবে চিরদিন.
আমি, সেই তরুতলে করি অশ্রু বিসর্জ্জন
লও দীন স্নেহাধীন কবির তর্পণ।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

৺ রায় নবীনচন্দ্র দত্ত বাহাদুর।

১৮৫২ খ্রীঃ ৮ই মে তারিখে আমাদের পূজনীয় পিতৃদেব চট্টগ্রামের একটী সম্ভ্রান্ত পরিবারে স্বীয় পৈত্রিক পল্লীভবনে আনোয়ারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এই দত্ত-পরিবার আন্দাজ ১৬০০ খ্রীঃ হুগলী জেলা হইতে মুসলমান সেনাবাহিনীর সহিত এতদ্দেশে আগমন করেন এবং আরাকানরাজের সহিত যুদ্ধে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করায় এই জেলার ভূর্ষি গ্রামে জায়গির প্রাপ্ত হন এবং তদবধি এই দত্ত পরিবার এতদঞ্চলেই থাকিয়া যান। পিতৃদেবের শৈশবশিক্ষার ভার আমাদের কুলপুরোহিত শ্রীযুক্ত জুড়ামণি ভট্টাচার্য্যের উপর অর্পিত হয়। এই ক্ষুদ্র বিষয়টী পিতৃদেব বিস্মৃত হন নাই। পরবর্ত্তী কালে জুড়ামণি ঠাকুরের পুত্র ৺ গোবিন্দ ভট্টাচার্য্যকে তিনি কাশীতে পাঠাইয়া সংস্কৃতে সমুচ্চ উপাধি পরীক্ষা পর্য্যন্ত গুরুপুত্রের কাশীর সমগ্র ব্যয়ভার আনন্দে বহন করেন। চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পিতৃদেব কলিকাতায় পাঠার্থে প্রেরিত হন। পিতৃদেব সচ্ছল পরিবারের সন্তান ছিলেন এবং নিজ পিতার নিকট হইতে যথেষ্ট মাসিক বৃত্তি পাওয়া সত্বেও ছাত্রনিবাসস্থ অপরাপর ছাত্রবন্ধুদের ন্যায় কঠোর ছাত্রজীবন যাপন করিতেন এবং নিজের অন্যান্য ব্যয় ভার নিজেই বহন করিতে যত্নশীল হইতেন। মেডিক্যাল কলেজের দারুণ পরিশ্রমের পর দিনান্তে পটলডাঙ্গা হইতে পদব্রজে যোড়াসাঁকো যাইয়া কোন ভদ্র পরিবারে শিক্ষকতা কার্য্য করিতেন। দুর্ব্বলতাবশতঃ একদিন পথে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যান। তৎপর রাত্রে বাসায় আসিয়া আবার পাঠে মন দিতেন। একটী প্যাকিং বাক্স তাঁহার টেবিলের কার্য্য করিত। কয়েকটী মোটা পাঠ্য পুস্তক বালিস, ও একটী মাদুর বিছানারূপে ব্যবহৃত হইত। নিদ্রা জয় করিবার জন্য কখন কখন চক্ষে নস্য দিতেন। দিবসে কোন কোন দিন শব-ব্যবচ্ছেদ করিবার সুবিধা না পাইলে গভীর রাত্রিতে একাকী একটী ক্ষুদ্র কুপি লইয়া সেই সর্ব্বসাধারণের ভীতিপ্রদ শব-ব্যবচ্ছেদাগারে যাইতেন এবং জমাটবাঁধা অন্ধকার ঘরটীতে প্রবেশ করতঃ কুপিখানি জ্বালাইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত একাধিক শবের মধ্যে বসিয়া এই ক্ষীণকায় অথচ দৃঢ়চিত্ত বাঙ্গালী বালক নির্ভয়ে নিজের কার্য্য সম্পাদন করিতেন। তাঁহার এই দৃঢ় ও নির্ভীকচিত্ততার কথা ভাবিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। এই নির্ভীক দৃঢ়চিত্ততা তাঁহার সারা জীবনের সাথী ছিল। পাঁচ বৎসর বয়সের সময়েই তিনি অশ্বারোহণে পটু হইয়াছিলেন এবং যদিও কতবার কতস্থানে বিপন্ন এবং আহত হইয়াছেন, তবুও প্রৌঢ় বয়স পর্য্যন্ত তিনি তেজস্বী অশ্বপৃষ্ঠে অবাধে আরোহণ করিয়াছেন। তাঁহার এই ঘটনাবহুল জীবনে কত বিপদ আপদ, কত পাপ প্রলোভন আসিয়াছে, কিন্তু তাঁহার এই নির্ভয় গৌরবমণ্ডিত দৃঢ়চিত্ততা ও আত্মনিষ্ঠা তাঁহাকে সমস্ত পরীক্ষা হইতে রক্ষা করিয়াছে। এই ছাত্রজীবনেই পিতৃদেব আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের সহিত

পরিচিত হন। আচার্য্য কেশবচন্দ্র স্বীয় পুণ্য-প্রতিভায় তখনকার যুবকবৃন্দের চিত্ত জয় করিয়াছিলেন। পিতৃদেবও আচার্য্যের প্রতিভামুগ্ধ হন। আচার্য্যের বক্তৃতাবলী শুনিয়া যুবক বন্ধুদের ভিতর এই সব ভাব প্রচার করিবার মানসে "মোহন-মেলা" নামক সম্মিলনীতে নিজেই ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করিতেন। আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ এই খবর পাইয়া স্বয়ং দুই তিন দিন উপস্থিত হইয়া বিশেষ প্রীত হন এবং এই বালকটীকে ডাকাইয়া পরিচয় গ্রহণ করেন এবং তাহাকে "young missionary of Chittagong" বলিয়া অভিহিত করেন। এই উপাধিটী নিতান্ত অসমীচীন হয় নাই, কারণ পিতৃদেব ছুটীতে বাড়ী আসিলে খুল্লতাত মহাশয়দের ও অন্যান্য বন্ধুদের লইয়া জামালখাঁয় একটী কুটীরে স্বয়ং বেদীতে বসিয়া উপাসনা করিতেন ও স্বীয় পিতৃদেবের পরিত্যক্ত একটী চোগাচাপ-কান্ পরিয়া অনর্গল বক্তৃতা করিতেন।

ক্রমে ছাত্রজীবনের অন্তে অস্ত্রচিকিৎসায় সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়া তিনি মেডিক্যাল কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিন্তু চিত্ত দৃঢ় হইলে কি হইবে, এই দৃঢ়চিত্তের তাড়নায় শরীর একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তিনি যখন সরকারী কার্য্য পাইবার জন্য আবেদন করেন, তখন Medical Board তাঁহার দেহ পরীক্ষা করিয়া, তিনি সরকারী কার্য্যের অনুপযুক্ত, এই মত প্রকাশ করেন; শুধু তাহাই নহে, তাঁহার পরমায়ুকাল যে ছয় মাসের ঊর্দ্ধ নহে, তাহাও বলিয়া দেন। জানিনা কয়টী যুবক এইরূপ মৃত্যু আসন্ন ও অনিবার্য্য জানিয়াও অটলচিত্ত থাকিতে পারে। পিতৃদেব কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া, একটী কুলিযাত্রী জাহাজে কার্য্য গ্রহণ করিয়া Mauritius দ্বীপে যান এবং এই সমুদ্র-যাত্রার ফলে লুপ্ত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করতঃ ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় সরকারী কার্য্য প্রার্থী হন এবং এইবার কৃতকার্য্য হন। কিছুদিন চট্টগ্রাম জেল হাঁসপাতালে কার্য্য করিয়া উড়িষ্যার ঢেন্‌কানাল প্রদেশে বদলী হন। উড়িষ্যা প্রদেশ তখন ঘন জঙ্গল পরিপূর্ণ ছিল। পথে এক রাত্রিতে একটী ব্যাঘ্র তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল। পাল্কী-বাহকেরা তাঁহাকে ফেলিয়া পলায়ন করে, তিনি পাল্কীর ভিতরে বসিয়া দরজা দুটী কাপড় দিয়া বাঁধিয়া ফেলেন এবং সেই ব্যাঘ্রটীর তর্জ্জন গর্জ্জন ও নানাবিধ আস্ফা-লনের মধ্যেও অপরিসীম স্থৈর্য্যের সহিত সারা-রাত্রি কাটাইয়া দেন। সূর্য্যোদয় হইলে ব্যাঘ্রটী চলিয়া যায়।

১৮৭৯ খ্রীঃ দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধের সময়ে তিনি আলমোড়া প্রদেশে বদলী হন এবং তথায় নিজগুণে তৃতীয় গুর্খা পলটনের প্রধান Medical Officer নিযুক্ত হন। আলমোড়া যাইবার কিছু পূর্ব্বে পিতৃদেবের বিবাহ হয়। এবার মাতৃদেবী তাঁহার অনুগমন করেন। তখন মাতৃদেবীর বয়স ১৩ বৎসর। এই সময় হইতে মাতৃদেবী দেশে বিদেশে, রোগে শোকে, অপূর্ব্ব নিষ্ঠার সহিত আজীবন পিতৃদেবের সাহচর্য্য করিয়া-ছেন। জীবনান্তেও এই সাহচর্য্য ক্ষুণ্ণ হয় নাই, কারণ দেখিতে পাই যে, জীবন ও মরণের মধ্যে অবস্থিত সীমাহীন সীমার পরপারে চলিয়া যাইবার প্রাক্কালে মাতৃদেবী তাঁহার আসন্ন মৃত্যু ও মৃত্যুদিন নির্দ্দেশ করিয়া কয়েকটী কথা বলেন। তখন বলিয়া-ছিলেন, "তোমাদের বাবাকে যত্ন করিও, তিনিও কিছুদিন পরে চলিয়া যাইবেন,

তাঁহাকে ছাড়িয়া আমি বেশীদিন থাকিতে পারিব না। আমি তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিব এবং তোমাদের নিত্য রক্ষা করিব।"

আলমোড়া হইতে নৈনীতাল ও তৎপর অযোধ্যা জেলার সীতাপুরে পিতৃদেব বদলী হইয়া যান। এইস্থানে তাঁহার জ্যেষ্ঠ সন্তান ভূমিষ্ঠ হন। তৎপর লাহোর, কানপুর, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, মোরাদাবাদ, রায়বেরিলী, শাহাবাদ ইত্যাদি বহু স্থানে কার্য্য করতঃ ত্রিহুত প্রদেশে দ্বারভাঙ্গা জেলায় মহারাজা বাহাদুরের প্রধান চিকিৎসক নিযুক্ত হন। বস্তুতঃ এইখানেই তাঁহার কর্ম্মজীবনের পূর্ণ প্রসার ঘটে। সর্ব্বসাধারণের নিকট চিকিৎসায় ধন্বন্তরী বলিয়া পরিচিত হন, এবং অস্ত্র চিকিৎসায় অসামান্য খ্যাতিলাভ করেন। যদিও দ্বারভাঙ্গা জেলার হেড কোয়া-টারস লাহীরিয়া সরাইতে একজন সাহেব সিবিল সার্জ্জন থাকিতেন, তত্রাচ planter সাহেব ও মেমমহল পিতৃদেবের প্রায় একচাটিয়া ছিল। মহারাজা বাহাদুর তাঁহার চিকিৎসায় ও ব্যবহারে এতদূর প্রীত ছিলেন যে, মহারাণীদের—যাঁহাদের স্বয়ং সূর্য্যদেবও চক্ষে দেখিতে পাইতেন না—তাঁহাদের চিকিৎসার ভার তাঁহার উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি দরিদ্রদের বিনা পারিশ্রমিকে চিকিৎসা করিতেন, মধ্যবিত্ত পরিবারে অনাটন দেখিলে টাকা লইতেন না, এবং এমন করুণামাখা ভাষা ও নম্র মধুর ভাবে ঐ টাকা ফিরাইয়া দিতেন যে, গৃহকর্ত্তা কৃতজ্ঞ-তায় আপ্লুত হইয়া যাইতেন। অন্যদিকে তাঁহার নিম্নতন চিকিৎসক মহাশয়েরা যাহাতে যথেষ্ট উপার্জ্জন করিতে পারেন, তাঁহার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। অনেক সময় রোগ শক্ত না হইলে নিজে না যাইয়া তাঁহাদের কাহাকেও লইয়া যাইতে বলিতেন। আবার ভগবৎ কৃপায় তাঁহার এত প্রচুর উপার্জ্জন হইত যে, নিজে যথেষ্ট ভোগ করিয়াও যথেষ্ট দান ও অতিথি সেবা করিতেন। গৃহ দাসদাসী ও গাড়ী ঘোড়ায় পূর্ণ ছিল, এবং অভ্যাগত প্রবাসী বাঙ্গালী মাত্রই নবীন ডাক্তারের বাড়ীতে সাগ্রহে স্থান পাইতেন এবং এক এক সময় অতিথির ভিড় লাগিয়া যাইত।

পিতৃদেবের প্রৌঢ় ও শেষ বয়সে আমরা তাঁহার অতি গম্ভীর মুর্ত্তিটী দেখিয়াছি। কিন্তু তখন তিনি মহা সদানন্দ পুরুষ ছিলেন। মহারাজা বাহাদুরের প্রধান ওস্তাদদ্বয় আজ-গার আলী খাঁ ও মোরাদ আলী খাঁ তাঁহাকে সেতার শোনাইতেন ও শিখাইতেন। প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় পিতৃদেবের বৈঠকখানায় বন্ধু-বান্ধবেরা সম্মিলিত হইতেন এবং অনেক সময়েই গীতবাদ্য ও নির্দ্দোষ আমোদ আহ্লাদে গৃহটী মুখরিত হইত। আমাদের বাগানে একটী ব্যায়ামের আখড়া ছিল। তাহাতে পাড়ার বালক ও যুবকেরা ব্যায়াম শিক্ষা করিত। সেই সুদূর বিহার প্রদেশে একটা বাঙ্গালা স্কুল ছিল। পিতৃদেব তাঁহার সম্পা-দক ছিলেন। অপর দিকে বাঙ্গালী যুবকবৃন্দ-দের লইয়া এমেচিয়ার থিয়েটার পার্টি করিয়া-ছিলেন, এবং থিয়েটার, সার্কাস, যাত্রা-পার্টি যাহাই দারভাঙ্গায় আসিত, পিতৃদেব তাহাদের সকল বন্দোবস্ত করিবার প্রধান ভার গ্রহণ করিতেন। তাঁহার বক্তৃতাশক্তি এখানে কাহারও নিকট অবিদিত নাই, কিন্তু চট্ট-গ্রামবাসী অস্তগামী সূর্য্যের প্রতিভাটুকু দেখিয়াছেন মাত্র। দ্বারভাঙ্গায় প্রতি বৎসর রাজ-স্কুলের পুরস্কার বিতরণ হইত। মহারাজা বাহাদুর স্বয়ং ও বিস্তর রাজকর্ম্মচারী এবং

অপরাপর সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক উপস্থিত হইতেন। পিতৃদেবের ছাত্রদিগের প্রতি অভিভাষণ প্রধান অঙ্গ স্বরূপ ছিল, বহুদুর হইতে এই বক্তৃতা শুনিবার জন্য লোক উপস্থিত হইত। মহারাজ লক্ষীশ্বর সিংহের তিরোধানের পর বর্ত্তমান মহারাজা সিংহাসন অধিরোহণ করেন! মহারাজা পিতৃদেবকে অধিরোহণ দরবারে একটী সময়োচিত বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করিয়া পাঠান। পিতৃদেব স্বীকৃত হন এবং বক্তৃতান্তে তদানীন্তন লাট সাহেব বেদিকা হইতে অবতরণ করতঃ পিতার করমর্দ্দন করিয়া বলেন যে, তিনি অনেক ডাক্তার দেখিয়াছেন, কিন্তু এমন সুবক্তা ডাক্তার আর দেখেন নাই। পিতৃদেব দ্বারভাঙ্গায় প্রায় ১৬ বৎসর ছিলেন। এই খানেই তাঁহার তৃতীয় চতুর্থ পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পিতৃদেব সুচিকিৎসক বলিয়া অসামান্য খ্যাতিলাভ করেন। তিনি অতি যত্নের সহিত চিকিৎসা করিতেন। কত রাত্রে তিনি কোন মুমূর্ষু রোগীর কথা ভাবিয়া নিদ্রা যান নাই। বার বার উঠিয়া হাঁসপাতালে লোক পাঠাইয়া ঠিক সময়ে ঠিক ভাবে ঔষধপত্রাদি দেওয়া হইতেছে কিনা, খবর লইতেন। তাঁহার চিকিৎসা সম্বন্ধে দুইটী ঘটনা বিবৃত করিব। একবার একটী লোককে বনা শূকর এমন ভাবে আহত করিয়াছিল যে,তাহার উদর ফাটিয়া Spleen বাহির হইয়া পড়ে। বহু দূর হইতে তাহার আত্মীয় স্বজনেরা তাহাকে হাঁসপাতালে লইয়া আসে। তখন তাহার প্রায় অন্তিম অবস্থা। পিতৃদেব উপায়ান্তর না দেখিয়া অতি দক্ষতার সহিত তাহার Spleenটী একেবারে কাটিয়া ফেলিয়া দেন, এবং এমন যত্নের সহিত চিকিৎসা করেন যে, লোকটী বাঁচিয়া উঠে।

আর একবার কোন বড় জমিদারের পীড়ার সংবাদ পাইয়া তিনি সেই জমিদারের পল্লীভবনে যান। গিয়া দেখেন যে, জমিদারটীর মৃত্যু হইয়াছে এবং তিনি শ্মশানে নীত হইয়াছেন। পিতৃদেব বলিলেন যে, আমি যখন আসিয়াছি, একবার দেখিয়া যাইব। কারণ হয় ত ঐ জমিদারটীর মৃত্যু সম্বন্ধে মহারাজা বাহাদুর ও Government রিপোর্ট চাহিতে পারেন। কিন্তু ইহাতে অত্যন্ত আপত্তি উঠে, কারণ তাহারা ব্রাহ্মণের মৃতদেহ স্পর্শ করিতে দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। এই বিষয় লইয়া অনেক বাক্‌বিতণ্ডা হয় এবং কোন কোন সভাপণ্ডিত পিতৃদেবকে ম্লেচ্ছ বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। পিতৃদেব বিরক্ত হইয়া তাঁহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে শ্মশানে চলিয়া যান এবং একটু দূরে বসিয়া গভীরভাবে শবটীকে দর্শন করিয়া বলিলেন যে, দেহে প্রাণ এখনও বর্ত্তমান এবং তিনি চিকিৎসা করিবেন। এই প্রস্তাবে পুনরায় অনেক গণ্ডগোল উঠে, কিন্তু পিতৃদেব নিরস্ত না হইয়া নিজে ও সঙ্গীয় চাকরটীর সাহায্যে দেহটীকে শ্মশানের কালী মন্দিরের বারাণ্ডায় তুলিলেন। কালীবাড়ীর ঘরটীতে তালাবদ্ধ ছিল। চাবিটী কিছুতেই পাওয়া গেল না। গণ্ডগোল ও জনতা বাড়িয়া চলিয়াছে দেখিয়া পিতৃদেব বলিলেন যে, তাহারা যদি কোনরূপ বাধা জন্মায়,তবে তিনি সরকার বাহাদুরকে জানাইবেন যে, জমিদারটীকে খুন করিয়া ফেলা হইয়াছে। ইহা শুনিয়া সকলেই চলিয়া যায়। ঐ শ্মশানে বসিয়া পিতৃদেব ইতিকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ করিয়া লইলেন। অনেক ভয় প্রদর্শন করিয়া একটী তাঁবু ও কয়েকটী বাঁশের চাটাই সংগ্রহ করিলেন। তাঁবুটী নিজের জন্য খাড়া করিয়া লইলেন এবং

মন্দিরের বারাণ্ডার এক অংশ চাটাই দিয়া ঘিরিয়া জমিদারের মৃতপ্রায় দেহটীকে সযত্নে রক্ষা করিলেন। এইভাবে তিনি শুধু কর্ত্তব্যের প্রেরণায় সব বাধা বিঘ্ন সবলে চূর্ণ করিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া দিলেন। জমিদার বাড়ীর একটী বৃদ্ধ ভৃত্য গোপনে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইল। কারণ মৃত দেহ ঘরে লওয়া যায় না। সেই শ্মশানেই চিকিৎসা চলিল, কিন্তু তৎপরদিন ভয়ানক মেঘ করিয়া ঝড় উঠিবার উপক্রম করিলে পিতৃদেব মন্দিরের দরজা ভাঙ্গিয়া রোগীকে ভিতরে নিবার চেষ্টা করিলেন। ইহাতে বহুতর লোক ও গ্রাম্য মাতব্বর বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইল এবং ম্লেচ্ছ-ভাবাপন্ন ডাক্তারের দ্বারা ধর্ম্মের ও লোকাচারের অবমাননা করা হইতেছে মনে করিয়া ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল। এই বিপদের মধ্যেও পিতার হৃদয় তাঁহার এই অসহায় রোগীর মঙ্গলের জন্য সাহসে উচ্ছ্বসিত হইল এবং একটী কুঠার হস্তে সকলের সম্মুখীন হইলেন এবং পুনঃ পুনঃ মন্দির দুয়ারে কুঠারাঘাত করিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। তাঁহার দৃপ্ত রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া কাহারও বাধা দিতে সাহস হইল না। অতি সাবধানে রোগীকে মন্দিরের ভিতরে লইলেন এবং যত্নের সহিত চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। দ্বিতীয় বা চতুর্থ দিবসে ধীরে ধীরে রোগীর চেতনা সঞ্চার হইতে লাগিল, কিন্তু ইহাতে আর এক নূতন বিপদের সূত্রপাত হইতে লাগিল। গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া গেল যে, জমিদারের দেহে প্রেতাত্মার আবির্ভাব হইয়াছে। ক্রোধে অন্ধ হইয়া বহুতর লোক প্রেতাত্মা ও ডাক্তারকে বধ করিবার নিমিত্ত লাঠি ও বর্শা সহ শ্মশানের দিকে ধাবমান হইবার উপক্রম করিলে পিতৃদেব মধুবাণীর সব্‌ডিভিসনাল অফিসারের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। সবডিভিসনাল অফিসার অবিলম্বে পুলিশ সহ আসিয়া পৌছিলেন। তাঁহার আগমনে আক্রমণকারীরা পলায়ন করিল। এই ভাবে আরও দুই তিন দিন গত হইলে জমিদার মহাশয় তাঁহার লুপ্তচেতনা ও পূর্ব্বস্মৃতি ফিরিয়া পাইলেন। এবং তাঁহার নয়ন যুগল হইতে অবিশ্রান্ত জলধারা বহিতে লাগিল। পিতৃদেব তাঁহাকে নানা প্রকারে শান্ত করিলেন এবং সুচিকিৎসায় তাঁহার রুগ্ন দেহে বল সঞ্চার করিতে লাগিলেন। পরে শুভদিনে জমিদার মহাশয় বৃহৎ শোভাযাত্রা করিয়া শ্মশান হইতে নিজালয়ে ফিরিয়া গেলেন।

দ্বারভাঙ্গা হইতে পিতৃদেব শিবপুরে বদ্‌লি হইয়া যান। এখানে তিনি কঠিন রোগে আক্রান্ত হন এবং ভগবদ্ কৃপায় যদিও তিনি রোগমুক্ত হন, কিন্তু সেই হইতে তিনি তাঁহার স্বাভাবিক সদানন্দভাব আর সম্পূর্ণরূপে ফিরিয়া পান নাই।

শিবপুরের পর বঙ্গদেশের দু একটী জেলায় কার্য্য করিয়া অবশেষে ছোটনাগপুরের পলামো জিলায় বদ্‌লি হন। তখন বঙ্গ ও বিহার প্রদেশের জেল সমূহের jail stomatites রোগের অত্যন্ত প্রাবল্য ছিল। এই রোগের কোন সুচিকিৎসা-প্রণালী উদ্ভাবিত হইতে ছিল না, বহুদিন হইতে এই রোগটী scurvy জাতীয় রোগ বিশেষ বলিয়া সেই ভাবে চিকিৎসিত হইতেছিল। পরে Major Buchanan ইহাকে ম্যালেরিয়া-সম্ভূত বলিয়া মত প্রকাশ করেন। পিতৃদেব যে সময়ে প্যালামো জেলার ভার গ্রহণ করেন, তখন বঙ্গদেশের মধ্যে এই জেল সর্ব্বাপেক্ষা অস্বাস্থ্যকর বলিয়া পরিচিত ছিল

এবং এই জেলে jail stomatitis রোগের বিশেষ প্রাবল্য ছিল। পিতৃদেব অনুসন্ধান ও গবেষণা করিয়া এই রোগের একটী নূতন চিকিৎসা-প্রণালী উদ্ভাবন করেন ও আশাতীত ফললাভ করায় পুরাতন মতগুলি খণ্ডন করিয়া ক্ষুদ্র একটী পুস্তিকা প্রণয়ন করেন এবং জেলের খাদ্যাদির আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া দেন। এই পুস্তিকা সম্বন্ধে Major Buchanan এর মত উদ্ধৃত করিতেছি—

"I am very pleased with your paper on Stomatitis and shall be glad to publish it in the Gazette. I am inclined to your view and am not one of those who think that every case of spongy gum is scurvy and I agree that no amount of anti-scorbutic treatment will cure it. I went into the question in my little manual of jail hygiene but now am not inclined to believe in a malarial element. I congratulate you in the health of the jail and you will find yourself mentioned specially in the administration report just going into Government."

এই রোগ ১৯০২ সালে ৬৬ জনের হইয়াছিল। পিতৃদেবের চিকিৎসার ফলে ১৯০৩ সালে মাত্র ১ জনের হইয়াছিল। এই সম্বন্ধে জেলের ইনস্পেক্টর জেনারেলের মন্তব্য উদ্ধৃত করিতেছি। গবর্ণমেন্ট হইতে বহু প্রশংসা লাভ করেন।

"I have asked Dr. Dutt to publish his experiments and conclusions in the Indian Medical Gazette for the benefit of medical officers of other jails. Dr. Dutt has made a special study of the dicting of the prisoners and the admirable care and attention he has given to both the prevention and the treatment of the disease has its natural reward. I have to thank Dr. Dutt again for the great improvements in this jail which is one of the best managed in the province." Major Macnamara লিখিয়াছিলেন—

"The health of the jail is excellent there being nobody in hospital and no death for the last two years. This is a great change from what it once was a notoriously unhealthy jail. The present medical officer Dr. Dutt must be credited with having found out the cause of the sickness and mortality. The department is under a deep debt of gratitude to Dr. Dutt for what he has done. I have already mentioned the great improvements in health and the measures taken for economy in expenditure that have been introduced by the Superintendent Dr. N. C. Dutt. In these respects this jail is a model."

পালামো হইতে পুনরায় বঙ্গদেশে বদ্‌লি হন। এবং ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯০৭ খ্রীঃ তিনি রায়বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। অবসর গ্রহণের পর পিতৃদেব অধিকাংশ সময় বাড়ীতেই থাকিতেন এবং ভগ্নস্বাস্থ্য ও রুগ্নদেহ সত্ত্বেও সকল কার্য্যে উৎসাহের সহিত যোগ দিতেন। স্থানীয় Medical Association, ছাত্র সমিতি ও সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ছিলেন। নববিধান-বিশ্বাসী সমি-

তির চট্টগ্রাম অধিবেশনে, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন, এবং একবার চট্টল ধর্ম্মমণ্ডলীর সভাপতি হইয়াছিলেন। সমগ্র দেশে যখন সৈন্য সংগ্রহের সাড়া পড়িয়া যায়, পিতৃদেব চট্টগ্রামে সৈন্য সংগ্রহের কার্য্যে বিশেষ ভাবে যোগদান করেন। চট্টগ্রামে বহুতর সভাসমিতিতে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া সকলের উৎসাহ ও আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। যাত্রামোহন-টাউনহলের দ্বার উদ্‌ঘাটন তাঁহার জীবনের শেষ কার্য্য। এই ঘটনায় তাঁহার জীবনের একটী বিশেষ গুণ আমরা লক্ষ্য করিয়াছিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আত্মনিষ্ঠা তাঁহাতে এত প্রবল ছিল যে,কোনরূপ নীচতা তাঁহাকে আশ্রয় করিতে পারিত না। লিপ্সা বা পরশ্রীকাতরতার লেশ মাত্রও তাঁহাতে ছিল না। কয়েকটী স্থানীয় ভদ্রলোক পিতৃদেবকে যাত্রামোহন-টাউনহলের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিতে অনুরোধ করিলে রোগক্লিষ্ট দেহ লইয়াও তিনি ঐ কার্য্য করিতে স্বীকৃত হন। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই অপর কয়েকজন ভদ্রলোক তাঁহাকে ঐ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহারা বলেন যে, যাত্রামোহন বাবু আপনার সম্বন্ধে ভাল ভাব পোষণ করিতেন না। এমন কি, অনেকের নিকট আপনার নিন্দা করিয়াছেন। পিতৃদেব অত্যন্ত দুঃখিতান্তঃকরণে তাঁহাদের বলেন যে, যদি আমায় নিন্দা করিয়া থাকেন, তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। কিন্তু স্বর্গীয় যাত্রামোহন বাবু যে দেশের একজন পূজ্য ও মহৎ ব্যক্তি ছিলেন, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। আমি তাঁহার নামে এই দ্বারোদ্‌ঘাটন ব্যাপারে আহুত হওয়ায় সুখী হইয়াছি। আপনারা সকলেই জানেন যে, ঐ সভাতে স্বর্গীয় যাত্রামোহন বাবুর কথা বলিতে গিয়া পিতৃদেব অশ্রুবর্ষণ করিয়াছিলেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরে পিতৃদেব শয্যা গ্রহণ করেন এবং ১৯২০ খ্রীঃ ২৭এ এপ্রিল সূর্য্যাস্তের সময় দেহমুক্ত হইয়া অমরধামে গমন করেন। দেহ-মুক্তির প্রায় মাসাধিক পূর্ব্বে জনৈক পরমহংস মহারাজ পিতৃদেবকে দেখিতে আসিয়া বলেন যে, যে কারণ বশতঃ আপনি এতদিন কষ্টভোগ করিতেছিলেন,তাহা এখন অপসৃত হইয়াছে। এখন আপনার পরম শান্তির সময় এবং পরম শান্তির সহিত আপনি চলিয়া যাইবেন। বস্তুতঃ তাহাই হইয়াছিল। তাঁহার শরীরে আর কোনই রোগ-যন্ত্রণা ছিল না। দেখিয়াই মনে হইত যেন বহুদিন রোগ ভোগ করিয়া ধীরে ধীরে সারিয়া উঠিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন,ভাল আছি এবং দিবসের অধিকাংশ সময় গভীর ভাবের ঘোরে থাকিতেন। বন্ধুবান্ধব দেখা করিতে আসিলে হাত তুলিয়া অসম্মতি জানাইতেন। মনে হইত যেন তাঁহার এই ভাবাবস্থা এতটুকু ভঙ্গ হয়, তাহা তিনি পছন্দ করিতেন না। এই ভাবেই তিনি ধীরে ধীরে পরম শান্তির সহিত পরমপদ লাভ করেন। শ্রীশ্রীভগবান নিজ অপার কৃপাগুণে তাঁহার মুক্ত আত্মাকে শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় দান করুন।

পিতৃদেবের জীবনে সাধু মহাত্মাদের প্রভাব বিশেষ রূপে লক্ষ্য করিয়াছি। এবং মনে হয়, ইহাই তাঁহার জীবনের প্রধান বিশেষত্ব।

জীবনের পূর্ব্বাহ্নে পিতৃদেব যখন আলমোরায় বাস করিতেছিলেন, তখন একটী মহাপুরুষের সাক্ষাৎলাভ করেন। পিতৃদেব একটী অত্যন্ত তেজস্বী অশ্ব ক্রয় করিয়াছিলেন কিন্তু কিছুতেই তাহার প্রকৃতি সংশোধন

করিতে পারিতেছিলেন না। একদিন সন্ধ্যার সময় বারাণ্ডায় বসিয়া ঐ অশ্বটীর কথা ভাবিতেছিলেন, এমন সময় ধীরে ধীরে ঐ মহাত্মাটী পর্ব্বতারোহণ করিয়া উপরে আসিলেন এবং বলিলেন, তুমি অশ্বের কথা ভাবিতেছ, আমি উহার প্রকৃতি ঠিক করিয়া দিতেছি, ইহা বলিয়া তিনি অশ্বটীর মস্তক হইতে লাঙ্গুল পর্য্যন্ত তাঁহার মঙ্গল হস্তখানি বুলাইয়া দেন। সেই হইতে অশ্বটী সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতিস্থ হইয়া যায়। বহুদিন পরে আলমোরা ত্যাগের সময় পিতৃদেব ঐ অশ্বটীর পৃষ্ঠে পর্ব্বতাবরোহণ করিতেছিলেন। হঠাৎ অশ্বটীর গতি রোধ হয় এবং কষাঘাত সত্বেও তাঁহাকে গন্তব্য পথে অগ্রসর করিতে সক্ষম হইলেন না। এমনি সময় পার্শ্বস্থিত পর্ব্বতচূড়া হইতে ঐ মহাত্মাটী উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, অশ্বটাকে মারিও না। আমি উহার গতিরোধ করিয়াছি। কারণ তোমার সঙ্গে আমার প্রয়োজন আছে। ঐ স্থানে উঁহাদের অনেক কথাবার্ত্তা হয়।

দ্বারভাঙ্গায় আর একটী মহাত্মার দর্শন লাভ করেন। তিনিও দু'এক দিন রাত্রিকালে আমাদের বাড়ীতে পদধূলি দিয়াছিলেন। ঘরে ঢুকিলেন না। বাগানে বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিলেন। কিছুদিন পরে পিতৃদেব বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য দেওঘরে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে কোন একটী ষ্টেশনের একটী নিভৃত কক্ষে বসিয়াছিলেন। পিতৃদেব তাঁহাকে দেখিয়া বিস্মিত হন এবং জিজ্ঞাসা করিলে মহাত্মাটী হাসিয়া বলিলেন, আমি জানিতে পারিলাম তুমি এই স্থান দিয়া যাইবে। তাই তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলাম।

বিশুদ্ধানন্দ স্বামী, ভাস্করানন্দ স্বামী, ত্রৈলঙ্গ স্বামী, সাধু অঘোরনাথ, মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও কর্ণেল্ অল্‌কট্ এবং অন্যান্য মহাত্মা যাঁহাদের বিষয় আমরা বিশেষ কিছু জানি না, তাঁহাদের সাহচর্য্য লাভ করিয়াছিলেন।

রাঙ্গামাটীতে একদিন সন্ধ্যার সময় একটী পূর্ব্বপরিচিত মহাত্মা হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হন। পিতৃদেব অত্যন্ত আনন্দ সহকারে তাঁহাকে ঘরে আসিতে আহ্বান করিলে তিনি অস্বীকৃত হন এবং মুক্ত অম্বরতলে বসিয়া উভয়ে অনেক আলাপাদি হয়। আমি নিকটেই একটী ঘরে ছিলাম। শুনিতে পাইলাম, তাঁহারা যোগের নিগূঢ়তত্ব সম্বন্ধে আলাপ করিতেছেন, এবং মহাত্মাটী নানারূপ আসন-প্রণালী দেখাইয়া দিতেছেন।

পিতৃদেবের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। আমার পিতামহ নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। হিন্দু পরিবারে পিতৃদেবের জন্ম হয়। কিন্তু ছাত্রজীবনে পিতৃদেব আচার্য্য কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মপ্রতিভায় মুগ্ধ হন এবং প্রচলিত ব্রহ্মোপাসনা গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি স্বভাবতঃই জ্ঞানপ্রধান ছিল, তাই আচার্য্য-প্রচলিত ব্রহ্মোপাসনা গ্রহণ করিয়াই তিনি তৃপ্ত হইতে পারিলেন না। বিশ্বপ্রকৃতির যবনিকার অন্তরালে লুক্কায়িত তত্বরাশি জানিবার জন্য উৎসুক হইলেন। তত্বান্বেষী হইয়া নবপ্রতিষ্ঠিত তত্ববিদ্যা সমিতিতে (Theosophical Society) যোগদান করিলেন এবং তাঁহার কয়েকজন সমভাবাপন্ন বন্ধু জানেন যে, তিনি তত্ববিদ্যাবিষয়ে কত প্রগাঢ় জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার একটী স্বতন্ত্র উপাসনার ঘর ছিল। তিনি সেখানে পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া নিষ্ঠার সহিত উপাসনায় বসিতেন। শেষ জীবনে অক্ষম হইলে একখানি আরাম-

কেদারায় বসিয়া যুক্ত হস্ত দুখানি বক্ষের উপর রাখিয়া গভীর উপাসনা ও ধ্যানে ডুবিয়া যাইতেন। উপাসনা শব্দের যথার্থ অর্থ নিকটে বসা। পিতৃদেব উপাসনাকে ঐ অর্থেই বুঝিতেন, তাই তিনি সজন উপাসনা, এমন কি,কীর্ত্তনাদিরও তত পক্ষপাতী ছিলেন না। তাহাদের প্রয়োজনীয়তা তিনি বেশ বুঝিতেন, তবুও আমাদের বলিতেন, "অত কথা বলিও না, স্থিরভাবে নির্জ্জনে বসিয়া ধ্যান কর।" পিতৃদেব প্রতিমা পূজারও প্রয়োজনীয়তা বুঝিতেন। একবার কোন বারোয়ারী কালীপূজায় তিনি চাঁদা দেওয়ায় মাতৃদেবী বলেন, "আপনি ত ওসব মানেন না, তবে চাঁদা দেন কেন?" পিতৃদেব উত্তর করিলেন, "আমি নিজে প্রতিমা উপাসনা করি না, কিন্তু ঐরূপ উপাসনার প্রয়োজনীয়তা বুঝি এবং যাঁহারা ঐরূপ পূজাপ্রণালীর সহায়ে ধর্ম্ম-জীবন গঠন করিতে প্রয়াসী হইতেছেন,তাঁহা-দের সাহায্য করা উচিত বিবেচনা করি-তেছি।" ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি যেমন নির্জ্জন সাধনার পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁহার জীবনে ধর্ম্মকার্য্যও তেমনি নীরবে সম্পন্ন হইত। দুঃখী দরিদ্রদিগকে দান করা তাঁহার জীবনে আর একটী বিশেষ ব্যাপার ছিল। কিন্তু তাহাও নীরবে অনুষ্ঠিত হইত। শীতের সময়ে গোপনে র‍্যাপারের নীচে কম্বল লইয়া সন্ধ্যার সময়ে পথে বাহির হইতেন এবং অন্ধ আতুর দেখিলে পশ্চাৎ হইতে তাহাদের দেহে ঐ কম্বলটী জড়াইয়া দিতেন। একবার জনৈক প্রতি-বেশীকে ডাকিয়া বলেন যে, "দেখ, বড় শীত পড়িয়াছে; অমুকের শীতবস্ত্র নাই, তুমি দুই-খানি কম্বল উঁহাকে দিয়া আইস।" তৎপর দিন প্রাতে ঐ প্রতিবেশীকে ডাকাইয়া বলিলেন, "দেখ, কাল আমার বড় শীত করিয়াছে, আমি পাকা বাড়ীতে থাকি, তবু এত শীত; ঐ কম্বল দু'খানিতে উহার শীত নিশ্চয় ভাঙ্গে নাই। এই টাকা নাও; একটী লেপ করাইয়া তাহাকে আজই দিয়া আইস।" এইরূপ প্রাণভরা নীরব দান তাঁহার যে কত ছিল, তাহা বলা যায় না।

একদিকে এত নীরবতার পক্ষপাতী,কিন্তু অপর দিকে কর্ম্মজীবনে অত্যন্ত স্বাধীন প্রকৃ-তির ছিলেন। বহু পূর্ব্বে কোন একটী non-regulation প্রদেশে কমিশনার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। গিয়া দেখেন, জনৈক রাজাও সাহেবের দর্শনাভিলাষী হইয়া প্রায় দুই ঘণ্টা বসিয়া আছেন। পিতৃদেব কার্ডখানি পাঠাইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু বিলম্ব হইতে থাকায় অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন এবং সাহেবকে শুনাইয়া চাপ-রাশীকে বলিলেন যে, তিনি আর অপেক্ষা করিতে পারেন না। সাহেব ইহা শুনিয়া পিতৃদেবকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন এবং অত্যন্ত উগ্রভাবে তর্জ্জনীসঞ্চালন করিয়া বলিলেন, "তুমি জান ঐ লোকটী একজন রাজা; সে দুই ঘণ্টার উপর অপেক্ষা করিতেছে, তুমি এমন কে যে অল্পক্ষণ অপেক্ষা করিয়াই গণ্ড-গোল লাগাইয়া দিয়াছ?" পিতৃদেব গম্ভীর ও দৃঢ়ভাবে বলিলেন, 'আমি রাজা নহি, আমি চিকিৎসক; আমার সময়ের মূল্য অনেক, আমার এক একটী মুহূর্ত্তের উপর এক একটী রোগীর জীবন নির্ভর করিতেছে।" সাহেব এই নির্ভীক উত্তরের সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া চুপ করিয়া গেলেন এবং কিছুক্ষণ সদালাপ করিয়া পিতৃদেবকে বিদায় দিলেন।

একবার তিনি অসুস্থ হইয়া বিদায়ের আবেদন করেন। নিকটবর্ত্তী অপর একজন সাহেব সিভিল সার্জ্জন বিরুদ্ধভাবে রিপোর্ট

করায় গভর্ণমেণ্ট ছুটি দিতে অস্বীকার করেন এবং পিতৃদেবকে Medical Boardএ উপস্থিত হইতে হুকুম দেন। পিতৃদেব ইহাতে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিয়াও Medical Boardএ হাজির হন এবং পরে বিদায় লাভ করিয়া দার্জ্জিলিং চলিয়া যান। ঐ স্থানে থাকিয়া একটু সুস্থ বোধ করিলে তিনি চাকুরী ইস্তফা দেন। তদানীন্তন ছোটলাট বাহাদুর তখন দার্জ্জিলিঙ্গে ছিলেন। তিনি চাকুরী-ত্যাগ পত্রখানি পাইয়া ডাকাইয়া পাঠান এবং ফিরাইয়া লইবার জন্ত অনুরোধ করেন। পিতৃদেব বলিলেন যে, গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে অবিশ্বাস করিয়া যথেষ্ট অপমান করিয়াছেন, তজ্জন্ত তিনি পুনরায় চাকুরী গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক। পরে লাটবাহাদুরের অনুরোধে ও উন্নত পদ প্রাপ্ত হওয়ায় তিনি ইস্তফা পত্রখানি ফিরাইয়া লইলেন।

তিনি কখনও মস্তক ও পৃষ্ঠদেশ অবনত করিয়া কাহাকেও সেলাম করেন নাই। আমাদেরও তিনি বার বার বলিতেন যে, গাম্ভীর্য্য ও নম্র মধুরতার সহিত হস্তোত্তোলন করিয়া অভিবাদন করিবে, মস্তক অবনত করিবে না। সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে তাঁহার আজীবন উৎসাহ ছিল। বিধবা বিবাহ দেওয়া, বাল্যবিবাহ বন্ধ করা, স্ত্রীশিক্ষা প্রচলন করা প্রভৃতি বিষয়ে তিনি সর্ব্বদা আলোচনা ও সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। শেষ জীবনে জীর্ণ শরীর লইয়া ডাক্তারের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়াও তিনি শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র গুপ্তের কন্যার দ্বিতীয় বার বিবাহের কথা শুনিয়া মহোল্লাসে সহানুভূতি প্রকাশ করিবার জন্য বিপিন বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

পিতৃদেবের জীবন এতই ঘটনাবহুল যে, তাহা বিবৃত করা সম্ভব নহে। সমস্ত বিষয় আমরা ভাল করিয়া জ্ঞাতও নহি। আজ তাঁহার এই শ্রাদ্ধবাসরে তাঁহার জীবন-উদ্যানের দুই চারিটী পুষ্প সংগ্রহ করিয়া অর্ঘ্যস্বরূপ তাঁহারই শ্রীচরণে নিবেদন করি।

আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব আজ সকলেই আমাদের কণ্ঠের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া প্রার্থনা করুন যেন তিনি সকল অসত্য হইতে সত্যেতে অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে, মৃত্যু হইতে অমৃতেতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিশ্বপিতার চির শান্তিময় শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করুন।

ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি হরি ওঁ। *

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ দত্ত।

* আমার পরম পূজ্যপাদ স্বর্গগত জ্যেষ্ঠতাত মহোদয়ের আদ্যশ্রাদ্ধ বাসরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ সন্তান কর্ত্তৃক পঠিত।—জীবেন্দ্রকুমার।

স্বর্গীয় কবিবর নবীনচন্দ্র সেন।

[১৩২১ বঙ্গাব্দের ১০ই মাঘ চট্টগ্রাম শাখা-সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে কবিবরের সাম্বৎসরিক স্মৃতিসভায় পঠিত।]

অমরা-প্রবাসী ওহে কবীন্দ্র নবীন,
হইল বছর ছয়
গিয়েছ অমরালয়
প্রদীপ্ত গৌরব-দীপ্ত পতাকা উড্ডীন
করিয়া পশ্চাতে তব ; যাহার প্রভায়
আসমুদ্র হিমালয়,
বিশেষতঃ বঙ্গালয়
কবিকুঞ্জ রঙ্গালয় গৌরবে খেলায়।

কহিব গৌরবে আজি তোমারি ভাষায়—
'ধন্য আশা কুহকিনী'
ধন্য বঙ্গ গৌরবিনী,
"আলোকিত" চিরতরে পূর্ণেন্দু আভায়।

যেহেতু তোমারি আশা, তব প্রতিভায়
'বঙ্গ ইতিহাস খনি'
ছিল অমা নিশীথিনী—
'আলোকিত' চিরতরে পূর্ণেন্দু আভায়।

যে পথে কদাপি কোন কবি বিচরণ
করেনি,' সাহস ভরে
স্বেচ্ছায় সে পথ ধ'রে
অভিনব কাব্যরাজ্য করেছ স্থাপন।

পেতেছ বাণীর নব্য রম্য সিংহাসন,
তোমারি প্রতিভা জ্যোতিঃ
স্থির সৌদামিনী ভাতি
সে রাজ্য প্রবেশ দ্বারে 'আলোকভবন'।

স্বীয় পুণ্যবলে ভেদি তিমিরাবরণ
'অবিষ্করতন' যত
করিয়াছ সমবেত,
স্বসূত্রে গেঁথেছ মালা ভুবনমোহন—

পারিজাত পরাজিত সৌরভ-সম্ভারে—
সকল কবির আগে
ভক্তি শ্রদ্ধা অনুরাগে
'দোলায়েছ মাতৃভাষা কম কলেবরে'।

'সুকবি সুকরে গাঁথা মহাকাব্য ধনে'—
'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র'
'প্রভাস' 'পলাশিক্ষেত্র'
'অমিতাভ', 'অমৃতাভ' সুধা বিতরণে।

'ভানুমতী', 'রঙ্গমতী', 'খ্রীষ্ট' অলঙ্কারে,
গীতার, চণ্ডীর স্রোতে
কাব্যকুন্দ শতে শতে
'বরবপুঃ সাজাইতে' ষোড়শোপচারে।

তুষিতে ভাষার তৃষা, কবিত্ব সুধায়
ঢালিয়াছ রসনায়,
অমর করেছ তায়,
'লভিয়াছ অমরতা এ মর ধরায়'।

বঙ্গকাব্যারণ্যে তুমি যে রম্য উদ্যান
বাণীর বিশিষ্ট বরে
গিয়েছ সৃজন ক'রে,
কাব্যের সাগরে ইথে ডাকিয়াছে বান।

বাণীর বিচিত্র রাজ্যে ছুটেছে তুফান ;
যাবচ্চন্দ্র দিবাকর
বঙ্গভাষা কলেবর
সাহিত্য সরিৎ স্রোত বহিবে উজান।

ধর্ম্মের জগতে তুমি নও কনীয়ান্—
শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা,
মধ্যলীলা, অন্ত্যলীলা
নখ দর্পণের মত তব অনুধ্যান।

বুদ্ধের নির্ব্বাণে তুমি ছিলে আস্থাবান ;
মহাভারতের নীতি,
শ্রীরামের যশোগীতি
আদর্শ তোমার ছিল যীশু পুণ্যবান।

ধর্ম্মরাজ্যে, কাব্যরাজ্যে তোমার সমান
তুলনা নাহিক আর
তব প্রেম প্রতিভার,
অনন্ত প্রেমের রাজ্যে তোমার সম্মান।

র‍্যাফেল্, রবির চিত্র তুচ্ছ অকিঞ্চন ;
শব্দশিল্পী কবিবর,
তব সম চিত্রকর
কাব্যের মন্দির শোভা করেছে কজন?

'যাহার যেমন দান তথা প্রতিদান'
'বীজ অনুরূপ ফল
কর্ম্মক্ষেত্রে' অবিরল
তোমারি লেখনী বলে,—তুমিই প্রমাণ

প্রস্তর প্রতিমা তব নাহি চট্টলায়,
তাহে খেদ নাহি কোন,
কীর্ত্তি তব নহে উন ;
প্রস্তর মুরতি মূক,—কহিতে না পারে।

অদ্বিতীয় কাব্য তব। প্রতিভা তাহার
মধ্যাহ্ন ভাস্কর সম
ভুভারত যুড়ে দীপ্ত।
কীর্ত্তিস্তম্ভ এর বেশী কি আছে আবার?

অনন্ত অমৃত স্রাবী কাব্যের ভাণ্ডার
রাখিয়ে গিয়েছ যাহা
কস্মিন কালেও তাহা
ফুরাবে না,—স্থায়ী রত্ন বাণী অর্চ্চনার।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার লোধ।

অত্যাচারীর প্রতি।

কে আছ পাষণ্ড কোথা
দুর্ব্বলে করিতে দলন?
জেনো আমি আছি সেথা
তোমারে করিতে দমন॥ ১

কামান বন্দুক অসি
দাগিবে বুকেতে আমার?
দাগো তুমি—ফিরে যাবে—
আঘাত লাগিবে তোমার॥ ২

আমার মানস-পুত্র
উঠিবে সৈন্য লক্ষ লক্ষ—
অমর সাহসী পটু
সেনানী বীর যুদ্ধে দক্ষ॥ ৩

হুহুঙ্কারে ছুটে গিয়ে
করিবে ছিন্ন তব পক্ষ।
সবেগে ঘেরিবে তোমা'
বধিবে চিরি' তব বক্ষ॥ ৪

বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের
ধর্ম্মাধর্ম্ম-সংগ্রাম কথা
শুনেছ নিশ্চয়—তাহা
সত্য—ধ্রুবতারা ঐ যথা॥ ৫

আমারো এ সত্য কথা—
দেখে নিও—হবে না মিথ্যা—
অত্যাচার-যজ্ঞে উঠে
অত্যাচারী বধিতে কৃত্যা॥ ৬

এখনো বলিছি—ছাড়
আঘাত দুর্ব্বলের পরে।
পশু মন্ত্র ছেড়ে দাও
মনুষ্যত্ব বরণ ক'রে॥ ৭

উঠে পড়—খাড়া হও—
নিজ শুভ কর্ম্মের বলে;
ভগবানে চিত্ত রেখে,
অমঙ্গল চরণে দ'লে॥ ৮

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সঙ্গণিকা।

(৮)

কল্পনা এক জিনিষ, প্রত্যক্ষানুভূতি অন্য জিনিষ। আমরা এই ভারতবর্ষীয় ব্যক্তিরা কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করিতেই অধিক ভালবাসি। প্রচারক এদেশে অনেক, কিন্তু প্রচারিত এদেশে কই দেখা যায়? ইহা কর, তাহা কর, সকলেই বলেন, কিন্তু নিজেরা কেহ কিছু করে না। আমাদের মনে হয়,

বক্তৃতা কিছু দিন বন্ধ রাখিয়া জীবন-গঠনের চেষ্টা করা উচিত। এক্ষেত্রে অন্যে কি করে, না করে, সে সম্বন্ধে উদাসীন থাকিয়া আপন আপন কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাওয়া উচিত। তুমি বা সে, সত্য আচরণ করে কি না, তাহার বিচার না করিয়া আমি কেন সত্য আচরণ করি না? আত্মোৎকর্ষ সাধনায় যদি সকলে বদ্ধপরিকর হন, তবে কল্পনার রাজ্য সংকীর্ণ হইয়া যায়। বন্ধু, এস, তুমি ও আমি তাহাই করি।

(৯)

অন্ন-সমস্যা এদেশের বিষম সমস্যা। যে দিন কাল পড়িয়াছে, তাহাতে বাঁচিয়া থাকাই যেন কঠিন ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। কি দিয়া কি করিব, কোন্ উপায় ধরিয়া সকলকে প্রতিপালন করিবে, সকলের মুখেই এই এক কথা। সকলের মুখই মলিন ও বিষন্ন। ঘোরতর দিন যেন নিকটবর্ত্তী হইতেছে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, অন্নচিন্তাপেক্ষাও ধর্ম্মচিন্তা অত্যাবশ্যক। আমরা যদি মানুষ হইতাম, তবে এদেশের অভাব অনেক কমিয়া যাইত। আমরা যদি মানুষ হইতাম, অপব্যয় অনেক কমিয়া যাইত। পরন্তু আমরা যদি মানুষ হইতাম, চা চুরুটে যে ব্যয় হয়, তার উপর মদ্যপান বা বিলাসিতায় যে ব্যয় হয়, সে সব কমিয়া যাইত। এদেশের প্রতি ব্যক্তির বার্ষিক আয় ৩০৲, তার উপর এই অপব্যয়; কাজেই দেশ দৈন্যে ক্রমেই ডুবিয়া যাইতেছে। হিতৈষিগণের এই অপব্যয় নিবারণ-কল্পে কোন চেষ্টা নাই, কোন প্রতিজ্ঞা নাই। একদিন এদেশে মদ্যপান নিবারণের জন্য কত চেষ্টা হইয়াছিল, ৺প্যারীচরণ সরকার, ৺কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি ব্যক্তিগণ কত চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু আজ কাল এদিকে আর কাহারও দৃষ্টি নাই। হায়, সেদিন কাঁসারিপাড়ার মোড়ে দাঁড়াইয়া দেখিলাম, কত ভদ্রলোক গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া মদের দোকানে প্রবেশ করিতেছেন! দেখিয়া প্রাণটা অস্থির হইল, চক্ষে জল পড়িল। দেশে হাহাকার, কিন্তু এদেশের অপব্যয় ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে! দেশের আশা কোথায়?

(১০)

চতুর্দ্দিক হইতে অনাহারের সংবাদ নিত্য পৌছিতেছে, লক্ষ লক্ষ লোক অনশন-ক্লিষ্ট, কিন্তু সেদিকে কেহই দৃষ্টিপাত করেন না, অপিচ বিবাহ ইত্যাদিতে নাচ গান, বাদ্য বাজনায় কত টাকা উড়িয়া যাইতেছে। সকলের যদি প্রাণে মমতা থাকিত, এ দুর্দ্দিন এদেশে উপস্থিত হইত না। আশে পাশের লোকের কষ্ট যদি আশে পাশের লোকেরা দুর করিতে চেষ্টা করিতেন, এরূপ হাহাকার অনেক কমিয়া যাইত। দেশের জনসাধারণ এ সম্বন্ধে উদাসীন, মধ্যবর্ত্তী লোক উদাসীন, শিক্ষিত শ্রেণী উদাসীন, নেতৃবর্গ উদাসীন। দেশের আশা বল ত কোথায়?

(১১)

রাজনীতির আলোচনা একটা জুয়া খেলার ন্যায়—ইহার নেশায় একবার যিনি পড়েন, তিনি আর ফিরিতে পারেন না; পদ ও গৌরব লালসা তাঁহাদের শনৈঃ শনৈঃ বাড়িয়া যায়। রাজনীতির চর্চ্চা ছাড়িয়া দেশের উন্নতির জন্য সকলে বদ্ধপরিকর হইলে, বুঝি বা দেশটা এত হতশ্রী হইত না। পরস্পরের উন্নতির জন্য আমরা সকলে চেষ্টা করি না কেন? কে তাহাতে বাধা

দেয়? আমাদের কাজ যদি আমরা করি, তবে দেশের গতি ফিরে নাকি? এদেশের রাজনীতির সভাগুলি দেশোন্নতির সভায় পরিণত হউক না কেন?

(১২)

তাহা হওয়ার প্রধান অন্তরায়—তাহাতে সম্মান ও গৌরব নাই। কিন্তু বিদ্যাসাগর, প্যারীচরণ, কেশবচন্দ্র কি কম গৌরবের পাত্র? ভারত-সংস্কারক সভার ন্যায় এদেশে অসংখ্য সভা প্রতিষ্ঠিত হয় না কেন? শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ইউ, এন, মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সহৃদয় ব্যক্তিগণের নিকট আমাদের এই প্রার্থনা, সমাজ-সংস্কারক সভা দ্বারা এদেশকে ছাইয়া ফেলুন। নিম্নশ্রেণীর উন্নয়ন ভিন্ন এদেশ কিছুতেই জাগিতে পারে না। গান্ধী এ সম্বন্ধে অগ্রসর হউন না কেন?

(১৩)

আমাদের বড় দুঃখ, এদেশে বক্তা আছে, শ্রোতা নাই, কেহ কাজ করিতে চাহে না; নেতা আছে, নীত হইতে কেহ চাহে না; বাক্‌চাতুর্য্য আছে, কর্ম্মপটু লোক নাই। যত কিছু অকল্যাণ, এই জন্যই এদেশে হইতেছে। আবেদন নিবেদন করিয়াই আমরা ঘুমাইয়া পড়ি, এদেশের অসংখ্য লোক না খাইয়া মরিয়া যায়, চিকিৎসাভাবে প্রাণ হারায়, শিক্ষার অভাবে আঁধারে ডুবিয়া যায়! হায় হায়, এদেশের উদ্ধারের উপায় কি?

(১৪)

ভাল কথা মনে পড়িয়াছে.—উদাসীনতা এদেশে এত ব্যাড়তেছে কেন, পরনিন্দাই বা এত চলিতেছে কেন? একজন চরমপন্থী লোকের সহিত একদিন সাক্ষাৎ হইলে তিনি মডারেট দলের কয়েকজন লোকের খুব প্রশংসা ও মহত্ত্বের কথা বলিয়াছিলেন। শুনিয়া আমরা যারপর নাই আনন্দিত হইয়াছিলাম। বাস্তবিক অন্যের মহত্ত্ব ঘোষণাতেই আনন্দ। পরস্পরের মহত্ত্ব দেখিতে শিখিলেই ভারতের মঙ্গল হইবে। কিন্তু তাহা হয় কই? অনেকেই পরনিন্দাব্রত গ্রহণ করিয়া উদাসীনতায় ঘুমাইয়া পড়েন। সকল দলের লোকে যদি কর্ম্মপন্থী হইতেন, তবে এরূপ কখনও হইত না। যাঁহারা কর্ম্ম লইয়া ব্যস্ত, অন্যের নিন্দা করিতে তাঁহারা অবসর পান না। কবে আমরা শুধু কর্ম্ম লইয়া ব্যস্ত হইব!!

(১৫)

ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট ওডায়ার লিখিয়াছেন যে, ষ্টেট্ সেক্রেটারী মণ্টেগু সাহেব পঞ্জাব ব্যাপারের সকলই জানিতেন, কারণ সকলই তাঁহাকে জ্ঞাপন করা হইয়াছিল। এদিকে জেনেরেল ডায়ার আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করিতেছেন। দুই পক্ষেই অসংখ্য লোক আছেন। মহাত্মা মণ্টেগু এবং ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের সদস্যগণ বড়ই অপ্রতিভ হইয়াছেন। যদিও কঠিন সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু আমাদের মনে হয়, তাহার মীমাংসা অল্পেই হইয়া যাইবে। দুই চারিটী কথা এদিক ওদিক করিয়া বলিলেই সব গোল চুকিয়া যাইবে। আমাদের মনে হয়, মণ্টেগু সাহেবটী বড় সোজা ব্যক্তি নন্। তাঁহার ভারত-সংস্কার আইনেই তাহার নিদর্শন। লোলাকাটি হাতে দিয়া তিনি লোক ভুলাইতে পারিতেছেন, ইহা কি কর্ম্ম-ক্ষমতার পরিচয়?

(১৬)

এই বাঙ্গালা দেশের বর্ত্তমান শতাব্দীর নেতা কে? অনেকেই বলিয়া থাকেন, উকীল ব্যারিষ্টারগণই এদেশের নেতৃস্থানীয়—সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্ত তাঁহারাই অধিক চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু আমাদের তাহা মনে হয় না। এদেশের সমাজ-সংস্কারের নেতা বিদ্যাসাগর উকীল ব্যারিষ্টার নহেন, রাজনীতির নেতা কৃষ্ণদাস পাল উকীল বা ব্যারিষ্টার নহেন, ধর্ম্মসংস্কারক কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ বা বিবেকানন্দ কোন উকীল বা ব্যারিষ্টার ছিলেন না, আর সাহিত্য-সম্রাট ঈশ্বরচন্দ্র, অক্ষয়কুমার, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, দীনবন্ধু প্রভৃতিও উকীল বা ব্যারিষ্টার ছিলেন না। মাইকেল এবং হেমচন্দ্র ব্যারিষ্টার এবং উকীল ছিলেন বটে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি উকীল বা ব্যারিষ্টার নহেন। গিরিশচন্দ্র, চন্দ্রনাথ, বিহারীলাল, অক্ষয়কুমার, গোবিন্দদাস, যোগীন্দ্রনাথ উকীল বা ব্যারিষ্টার নহেন। ধরিতে গেলে উকীল ব্যারিষ্টারগণ অপেক্ষা অন্যান্য ব্যক্তিরাই এদেশের প্রকৃত উপকার বেশী করিয়াছেন। তবে জাতীয় সভা সমিতিতে উকীল ব্যারিষ্টারগণই অধিক কৃতিত্ব দেখাইতেছেন। তাহার কারণ, অন্যান্য লোকদিগের অপেক্ষা বর্ত্তমান সময়ে তাঁহাদের স্বাধীনতা কিছু বেশী। নূতন রিফরমড্ কাউন্সিলে তাঁহারা নেতৃত্ব করিবেন, নানা কারণে আমাদের ইহা মনে হয়। এখানে উকীল ব্যারিষ্টারগণেরই প্রাধান্য হইবে।

(১৭)

আবার বাবু ওডায়ারের মন্তব্যের জন্য মণ্টেগু সাহেব কিছু অসুবিধায় পড়িয়াছেন বটে, কিন্তু এ অসুবিধা কিছুই নয়। অল্পেই কুজ্ঝটিকা কাটিয়া যাইবে। বর্ত্তমান যুগে কিছুতেই কিছু হইবে না—যত অন্যায় কার্য্য করুক না, পরিপোষকতার গুণে সকলেই নিষ্কৃতি পাইবে। এখন আর ইংলণ্ডের পূর্ব্বের মহত্ত্ব নাই—ইংলণ্ডের এই পতনের অবস্থায় যিনি কিছু আশা করেন, তিনিই ভ্রান্ত। আর তাহাতে মঙ্গল বা কি হইবে? তাহাতে ভিক্ষা বৃত্তিই অধিক পরিস্ফুট হইবে। আমরা বলি, এখনও, সময় থাকিতে থাকিতে ভারত নিজ পায়ের উপর দাঁড়াইতে চেষ্টা করুন। আবেদন নিবেদনে কেহই বড় হয় নাই, কেহই হইবে না। তাঁহারা ত স্বার্থপ্রণোদিত হইয়াই আসিয়াছেন। স্বার্থের কুহকেই আছেন, স্বার্থের মায়াতেই থাকিবেন। স্বার্থ গেলে আর থাকিবেন কেন? সেই স্বার্থ যাহাতে যায়, নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইয়া তাহা সাধন কর। সাধনায় যখন সিদ্ধি পাইবে, তখন তোমাদের সকল মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।

(১৮)

মানুষ খুন করায় সাহসের পরিচয় নাই, মানুষের প্রকৃত সাহসের পরিচয় আত্ম-জয়ে। আত্মজয়ে যে সিদ্ধ, এই জগৎ তাহার পদানত। নৈতিক বল ভিন্ন একালে আর কোন বলের জয়লাভের সম্ভাবনা নাই। এই ভারতে নৈতিক বলের জাগরণের জন্য সকলে বদ্ধপরিকর হউন, নচেৎ কিছুতেই কিছু হইবে না। নেপোলিয়ন, কাইজার, জার প্রভৃতির পতন দেখিয়াও মানুষ সতর্ক হয় না, ইহাই দুঃখ। সেকালের রাম-রাবণের যুদ্ধ, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ এই নৈতিক বলেরই জয় ঘোষণা করিয়াছে, কিন্তু তাহা মানুষ অনুসরণ করে না, এই যা কষ্ট।

রিপু বলি দিলাই খ্রীষ্ট, বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য জগতের রাজা। এই কথাটী নিত্য-স্মরণ্য।

(১৯)

কাল আদমি খুন করিয়া কয়জন শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তি শাস্তি পাইয়াছেন, তাহার তালিকা সংগ্রহ করা একান্ত উচিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিতেন, তাহাদিগকে তাঁহারা কি মানুষ মনে করে? যাঁহারা শ্বেতাঙ্গ রমণীদিগকে বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহাদের দৃষ্টান্তই দেখ। মেয়েরা বাঙ্গালীর বধূ হইয়াও, কিছু দিন পর এই দেশ ছাড়িয়া বিলাতে যাইয়া সন্তানদিগকে শিক্ষা দেওয়ার অছিলায় বাস করিতেছেন! এ দেশের বায়ু কুবায়ু, এদেশের সমাজ কুসমাজ, এ দেশের লোক কুলোক; —এ দেশের সকল কাজ কুকাজ। ইহার মধ্যে তাঁহারা থাকিতে পারেন না, থাকিতে চাহেন না। এদেশের লোকদিগকে তাঁহারা পশুর ন্যায় মনে করেন। পশুবলিতে কাহারও শাস্তি হইবে, আশা করা বৃথা। জালিনওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের অভিনয় সর্ব্বদা সর্ব্ব দেশে হইতেছে, চোখ মেলিয়া দেখ, উৎকর্ণ হইয়া শুন।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

৭। প্রদোষ-সংবাদ। একটী শিশুর ক্ষুদ্র জীবন-কাহিনী। সুন্দর কাহিনী। পাঠে মর্ম্মস্পর্শ করিল, নয়নে অশ্রু ঝরিল।

৮। উত্তরবেদ ও পরমাপদ। শ্রীকুমুদিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়-বিবৃত, মূল্য ১৲। গ্রন্থকার বলেন, "বেদের মন্ত্র আকর্ষণ, বেদান্তের মন্ত্র বিকর্ষণ। বৈদিক ও পৌরাণিক যুগে মানুষের স্থান দেবতারও উপরে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, বেদান্তের যুগ হইতে সে ক্রমশঃ পশুর স্তরে নামিয়া আসিতেছে—আপনার ইচ্ছা-শক্তির পূর্ণতা সাধনের চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া ও মায়ার হাত এড়াইতে যাইয়া সে 'মায়ার' হাতের পুতুলই হইয়া বসিতেছে। উত্তর বেদ আবার বৈদিক মন্ত্র আকর্ষণের দিকে তাহারা ফিরাইয়া লইবার চেষ্টা। যাহাতে আবার মানুষ বিশ্ব-শক্তির কেন্দ্র-স্বরূপ হইয়া বসিতে পারে—অমোঘ ইচ্ছা-শক্তির বিকাশ সাধন করিয়া আপনার অঙ্গুলি সঙ্কেতে বিশ্ব চালিত করিতে পারে,—তাহার কথাই উত্তর বেদ।"

সুচিন্তিত ধর্ম্মভাব-মূলক নিবন্ধ। কিন্তু মূল্য বড় বেশী। ৭২ পৃষ্ঠা পুস্তকের মূল্য ১৲, বড় অধিক বলিয়া মনে হইল।

৯। সচ্চিদানন্দ নিয়মামৃত। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়, উকীল কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ।॰। সাধনার পথে অগ্রসর হইতে হইলে কি কি প্রণালী অবলম্বন করিতে হয়, তাহার সুন্দর বিবৃতি। ইহারও মূল্য বেশী বলিয়া বোধ হইল। কিন্তু পুস্তকখানি অমৃতের খনি,—পুণ্যপ্রবাহ। পড়িয়া সুখী হইলাম।

১০। পুণ্যপুঁথি। অমিয় ধারা—প্রথম পঞ্চদশ দিবসের ভাববাণী। মূল্য ৩৲ কাপড়ে বাঁধাই ৩।॰।

ভাবাবিষ্ট অবস্থায় সাধক যে সকল উপদেশ ও আদেশ দিয়াছেন, তাহার ব্যাখ্যা। এক একটী কথা অমূল্য—তাহার ব্যাখ্যাও সুন্দর। মানব জীবন এই সকল উপদেশ অনুসারে গঠিত হইলে মানুষ দেবতা হইতে পারে। কিন্তু কে কাহার কথা শুনে? শুনিলেই বা জীবনে তাহা কে প্রতিফলিত করে? প্রতিফলিত যদি হইত, তবে ধরা স্বর্গ হইয়া যাইত। তাহা হয় না বলিয়াই যা দুঃখ। ধর্ম্মের উপদেশ যত শুনা যায়, ততই ভাল। এই পুস্তক প্রচার দ্বারা শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র অধিকারী মহাশয় দেশের প্রকৃত উপকার করিয়াছেন। এই গ্রন্থ সর্ব্বত্র আদৃত হইলে আমরা সুখী হইব।

আত্মোৎসর্গ।

এই জীবন মঙ্গলময় বিধাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। এই জীবনই সমুদয় মঙ্গলের আকর, আনন্দ ও শান্তির অনন্ত প্রস্রবন। এই জীবনযোগেই বিশ্বের সকল শোভা-সৌন্দর্য্য, সঙ্গীতমাধুর্য্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, তত্ত্ব-রহস্যে প্রবেশ লাভ করা যায়। এই জীবনেই ভগবানের চির আবির্ভাব। তাঁকে সেজন্য ঋষিগণ প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় সকলের সারথি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

এই জীবন এক মহা তপস্যা। কঠোর কর্ত্তব্যদ্বারাই জীবন গঠিত। জীবনের প্রতি মুহূর্ত্ত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কর্ত্তব্য লইয়া আসে। সকল প্রকার সুখ-স্পৃহা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক এই জীবনের কঠোর কর্ত্তব্যসাধনদ্বারা জীবন-ব্রত উদযাপন করিতে হয়। এই জীবন শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ের চির সংগ্রাম-ক্ষেত্র। শ্রেয়ের পথ অমৃতত্বের পথ; প্রেয়ের পথ মৃত্যুর প্রশস্ত-দ্বারে লইয়া যায়। আপাত-সুখকর মৃত্যুর হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়া চির আনন্দপ্রদ মঙ্গলকে বরণ করিতে পারিলে জীবন ধন্য হয়। এই পরীক্ষাক্ষেত্রে মঙ্গলকে বরণ করিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হওয়া কঠিন সাধনা-সাপেক্ষ। সদা সচেতন বিবেক, সতত সতর্ক দৃষ্টি, শক্তিসাধনা, বুদ্ধির বিকাশসাধন, উদার-হৃদয় সাধুসঙ্গ, সৎপ্রসঙ্গ, ভগবদার্চ্চনা, দুর্ব্বলতা-জ্ঞানের মধ্যদিয়া ভগবজ্জীবনের আত্মহারা মহাভাব—এই সকলই তপস্যার অঙ্গ।

জীবনের তপস্যাদ্বারাই জীবন লাভ হয়। জীবন চিরবর্দ্ধনশীল, চিরবিকাশময়। ইহা প্রতি মুহূর্ত্তে নূতন নূতন সৌন্দর্য্যে ফুটিয়া উঠে। অনেক শক্তির আধাররূপে ভগবান এই জীবন আমাদের হস্তে প্রদান করিয়াছেন। এই শক্তির পরিচালনাদ্বারা তাহাদিগকে বিকশিত করিবার কঠোর কর্ত্তব্যও সেই সঙ্গে তিনি আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। এই জীবনকে ফুটাইবার জন্য প্রকৃতির নিয়ম, রাজবিধি, পিতামাতা, ভাই বন্ধু, আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশীর প্রেম ভালবাসার পরিবেষ্টনের মধ্যে জীবন-বিধাতা উহাকে স্থাপিত করিয়াছেন। এই সকল সম্পর্ক-জনিত কর্ত্তব্য জীবনের শক্তিবিকাশ রূপ মহাকর্ত্তব্যের সাধন। এই সকল কর্ত্তব্য পালন দ্বারা জীবনের শক্তি বিকশিত হয়, আর জীবন নব নব সৌন্দর্য্যে ফুটিয়া উঠে।

সমুদয় শক্তিই পরিচালনদ্বারা বিকশিত হয়। বাহিরের অবস্থা এই বিকাশের অনুকূল হইতে পারে—কিন্তু আভ্যন্তরীন শক্তি আপনার স্বতঃ পরিচালনাদ্বারাই বিকশিত হয়। বাগানের মালী পারিপার্শ্বিক অবস্থা-সমূহকে বৃক্ষের বৃদ্ধির অনুকূল করিয়া রাখিতে পারে; কিন্তু অন্তর্নিহিত শক্তির ক্রিয়াদ্বারাই বীজ গাছে পরিণত, বৃক্ষ ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া ফল ফুলে, পূর্ণতার সৌন্দর্য্যে ভরিয়া উঠে।

আমাদের হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় ও চক্ষু কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও শরীর রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় হৃদয়, ফুস্ফুস, ও স্নায়ু-মণ্ডলী—এই সকল লইয়া এই দেহ, মন, হৃদয়, ইচ্ছাশক্তি, প্রেম, ভালবাসা, ভক্তি; আদি কারণ, মহান্ পরমেশ্বরকে

জানিবার ও তাঁহার অর্চ্চনা প্রার্থনা করিবার শক্তি—এই সমস্ত লইয়া মানব জীবন। এই সকলকে যথাযথভাবে পরিচালনাদ্বারা বিকশিত করিলেই মানব-জীবন বিকশিত হয়। ইহাদের মধ্যে একটা গভীর সামঞ্জস্য আছে। প্রত্যেকই অন্যের সঙ্গে জড়িত। ইহাদের একটী ছাড়িয়া অন্যদের সম্যক্ বিকাশ সাধিত হয় না। এই জন্য অনুশীলনের অর্থ মানব-প্রকৃতির সমগ্রশীভূত বিকাশ।

দেহ ও মন।

দেহ ও মনের মধ্যে এক গভীর সম্বন্ধ আছে। দেহের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মনের উন্নতি সাধিত হয়। দেহের স্বাস্থ্যের উপর মানসিক স্বাস্থ্য নির্ভর করে। মস্তিষ্কের ক্রিয়া ও পরিণতি ভিন্ন আমাদের এই জীবনে মানসিক ক্রিয়া ও পরিণতি সম্ভব নয়। এজন্য দেহকে মানসিক জীবনের ভিত্তিস্বরূপ মনে করা যাইতে পারে। মানসিক ক্রিয়া, চিন্তা, আনন্দ ও প্রফুল্লতা, হৃদয়ের উদারতা, স্নেহ, ভালবাসা, ভক্তি ও ইচ্ছার প্রবল শক্তি ও নৈতিক জীবন বদন মণ্ডলে ও নয়নদ্বয়ে একটা লাবণ্য, শ্রীসৌন্দর্য্য, উজ্জ্বলতা, একটা বিস্ফুরণ, বিভূতি, ও গঠন-সৌষ্ঠব আনয়ন করে।

সংযম।

সর্ব্বপ্রকার উৎকর্ষ সাধন জন্য সংযমের বিশেষ প্রয়োজন। সংযমের অর্থ শক্তি-সঞ্চয়,—অপচয়-নিবারণ; সংযমের অর্থ উন্নত আধ্যাত্মিক জীবনের স্বতঃস্ফুরণ; সংযমের অর্থ জীবনের পূর্ণতা ও পূর্ণতার সৌন্দর্য্যময়, সৌরভময়, সঙ্গীতময়, আত্ম-প্রকাশ। প্রবৃত্তির অভ্যন্তরেই নিবৃত্তির বা উচ্চ জীবনের সংযম-বিধি নিহিত আছে। এই বিধির পশ্চাতে অনন্ত ক্রিয়াশীলতা ও জীবনের আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিবার শক্তি রহিয়াছে। এই শক্তিপ্রভাবে সংযম-বিধি প্রবৃত্তিসমূহকে সুসংযত, সুসবদ্ধ করিয়া রাখে। সুসংযত ও সুশৃঙ্খলাবদ্ধ প্রবৃত্তি অমর জীবন দ্বারা পরিচালিত হইয়া অমরত্ব লাভ করে। এই সংযম-বিধি-বিকশিত না হইলে প্রবৃত্তি আপনার উচ্ছৃঙ্খল ক্রিয়ায় মৃত্যুর পথে ধাবিত হয়। প্রবৃত্তির দ্বৈতগতির অর্থ আত্ম-হত্যা। এই জন্য প্রবৃত্তিসমূহকে সর্ব্বপ্রযত্নে সুসংযতভাবে পরিচালিত করা প্রয়োজন।

ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি শারীরিক বৃত্তি শরীর রক্ষা ও শরীর পোষণের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। দেহের স্বাভাবিক ক্রিয়ার জন্য প্রতিমুহূর্ত্ত দেহের অভ্যন্তরে রাসায়নিক সংযোগে যে উত্তাপের সৃষ্টি হয়, সে উত্তাপ দেহের পেশীসমূহের ক্ষয় সাধন করে। এই ক্ষয় পূরণ করিবার জন্য অন্নের প্রয়োজন। ক্ষয়জনিত যে বেদনা, তাহারই নাম ক্ষুধা ও তৃষ্ণা। ক্ষুধা তৃষ্ণার তৃপ্তিসাধনদ্বারা শরীরের পুষ্টি সাধন করা হয়। শরীরের যে পদার্থের ক্ষয় সাধিত হইয়াছে, অন্ন দ্বারা তাহাই পূরণ করিতে হয়। লোভের বশবর্ত্তী হইয়া অন্য দ্রব্য আহার করিলে শরীর আপন ধর্ম্মে তাহা গ্রহণ করিবে না এবং দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিবে। ইহাতে শরীরের অনেক শক্তির অপচয় হইয়া যায়। এইজন্য শরীরের প্রয়োজনানুসারে আহার নিদ্রা করিতে হইবে; অথবা শরীরের বিশেষ অনিষ্ট সাধিত হইবে।

নিদ্রা প্রভৃতি শারীরিক ধর্ম্ম। উহারাও শরীর রক্ষার জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। শরীরের প্রয়োজন সাধন কিম্বা অন্য প্রকারের

নিত্য নৈমিত্তিক বা শরীরের ক্ষয় সাধন করিলে শরীরের পক্ষে বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। নিদ্রাযোগে শরীর বিশ্রাম-সুখ সম্ভোগ করে। শরীরের প্রয়োজনাতিরিক্ত নিদ্রা জড়ত্ব-বিধায়ক। উহা দ্বারা শরীর ও মন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এইজন্য শাস্ত্রকারগণ দিবা-নিদ্রাকে ব্যসনের মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন; কারণ দিবা-নিদ্রাকে শরীরের শ্রান্তি বা অবসাদ-জনিত বলিয়া মনে করা যায় না। সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর রাত্রি কালে শরীরের অবসাদ উৎপন্ন হয়। এই জন্য রাত্রিকালই নিদ্রার সময়। রাত্রি-কালেও অতি নিদ্রা পরিত্যাগ করা প্রয়োজন। বালকদিগের পক্ষে আট ঘণ্টা নিদ্রাই যথেষ্ট। অধিক বয়স্কদের পক্ষে ৬ ঘণ্টা কি ৭ ঘণ্টার অধিক নিদ্রায় অতিবাহিত করা উচিত নয়। অতি নিদ্রা যেমন জড়ত্ব-বিধায়ক বলিয়া দূষণীয়;—অনিদ্রা বা অল্প নিদ্রাও শরীর ও মন উভয়ের অনিষ্টের কারণ। তাহাতে শরীর ও মনের অবসন্নতা দূর হয় না, এজন্য স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। আর জাগিয়া থাকিলেই দুর্ব্বল শরীরে কোন না কোন কাজ করিতে হয়, তাহাতে আরও শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়ে; আর দুর্ব্বল মন অবসন্নভাবে চিন্তা করিয়া আরও দুর্ব্বল হয়, এবং এই অনবচ্ছ চিন্তার অর্থই দুশ্চিন্তা; এবং দুশ্চিন্তা কুভাব ও কুপ্রবৃত্তির জননীস্বরূপ। তাহা দ্বারা ইন্দ্রিয় সকল অত্যধিক উত্তেজিত হইয়া উঠে ও বিনাশের পথে নীত হয়। এই জন্য নিদ্রা প্রভৃতিকে শারীর ধর্ম্মদ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে।

যৌবনকে বিষমকাল বলা হইয়াছে। যৌবনের ভরানদীপূর্ণ জীবনের প্রবাহে দুকূল ছাপিয়া চলিয়াছে! উহা আপনার মধ্যে আপনাকে নিবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না; উহার তরঙ্গায়িত পূর্ণতা আপনাকে বিতরণ করিবার জন্য তরঙ্গ-ভঙ্গিতে ছুটিয়াছে; সম্মুখে সকল বাধা বিঘ্ন স্রোতোবেগে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে। তাহাকে সংযম-বিধির বন্ধন দ্বারা নিয়মিত করিতে না পারিলে, গৃহ জনপদ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সর্ব্বত্র ধ্বংস-মূর্ত্তিতে মৃত্যুর বিভীষিকা বিস্তৃত করিবে। আর যদি তাহাকে সুসংযত রাখা যায়, তবে তাহার আনন্দ-সঙ্গীতে আকাশ পূর্ণ হবে, তাহার পূর্ণ জীবনের আনন্দময় প্রবাহ নূতন সৃষ্টি, নূতন সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিবে, এবং চারিদিকে ফল, ফুল, অন্ন বিতরণ করিবে, কত গ্রাম নগরকে শস্যশালী ও পণ্য সম্ভার পূর্ণ করিয়া সর্ব্বত্র মঙ্গলের আকররূপে সুখ সমৃদ্ধি বর্দ্ধিত করিবে। জীবনের পথে বাধা বিঘ্ন দূর করিবার উদ্দাম প্রয়াসকে ক্রোধ বলা যায়, এবং সকলকে আলিঙ্গন করিয়া সর্ব্বত্র আপনাকে প্রসারিত করিয়া যে আনন্দ, তাহাকে কাম বলা যায়। এই কাম ক্রোধ জীবন-রক্ষা ও জীবনের সম্প্রসারণ জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। জীবনের এই সম্প্রসারণ-প্রবৃত্তি হইতে পরিবারের সৃষ্টি, সমাজের গঠন, রাজনীতি রাষ্ট্রতন্ত্রের উদ্ভব, সকল প্রকার মানব-হিতৈষণা ও আত্মত্যাগের মহিমাময় আবির্ভাব। জীবনের সম্প্রসারণ ধর্ম্মদ্বারা যদি এই কাম ক্রোধকে সুসংযত রাখা হয়, জীবন-গতির স্থির প্রবাহে বিশ্ব-সৃষ্টির রহস্যময় সঙ্গীতে পূর্ণ হইয়া সর্ব্বত্র আনন্দ-রস বিতরণ করিবে ও আনন্দময় বিশ্বপ্রাণে আপনাকে বিসর্জ্জন করিয়া ধন্য হইবে।

জ্ঞান-লিপ্সা, দয়া, স্নেহ, প্রেম ভক্তি

প্রভৃতি প্রবৃত্তি সমূহ মানবকে উচ্চ ও মহৎ করে। জ্ঞান-লিপ্সা কাপুরুষকে সকল মহত্ত্বে প্রবেশ করিবার অধিকার দেয়। উহা হইতে জ্ঞান, বিজ্ঞান, শাস্ত্র, দর্শনের সৃষ্টি। দয়া দীন দুঃখীর সঙ্গে সমবেদনায় হৃদয়কে পূর্ণ করে; দয়াপ্রভাবে যেখানে দুঃখ দারিদ্র্য, শোক তাপ, সে সকলই হৃদয় আপনার করিয়া লয়। স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা জীবনকে সুখময় করিয়া তোলে; গৃহ পরিবার সমাজকে স্বর্গে পরিণত করে। তাহাদের অভাবে সংসার মরুভূমি ও জীবন শ্মশান তুল্য। স্নেহ হৃদয়কে কনিষ্ঠের মধ্যে ঢালিয়া দেয়; প্রেম সকলকে আলিঙ্গন করে, ভক্তি হৃদয়কে পুণ্যের পদে মহত্ত্বের পদে নত করিয়া রাখে। সৌন্দর্য্যানুরাগ কত স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্র, সঙ্গীত, কবিতা প্রভৃতি সুকুমার কলা-শিল্প সৃষ্টি করিয়া জীবনে আনন্দের অনন্ত প্রস্রবণ খুলিয়া দিয়াছে। রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি কাব্য অমর আদর্শ চরিত্র সৃষ্টি করিয়া স্বর্গীয় আনন্দে হৃদয় পূর্ণ করে। বুদ্ধমূর্ত্তি সংযম-শান্তির অমর মূর্ত্তি; উহা প্রাণে শান্তির অমৃতধারা প্রবাহিত করে। প্রস্তর-লিখিত প্রেমের অমর কাব্য সেই সৌন্দর্য্যের অমর মূর্ত্তি তাজমহল প্রাণে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দের সঞ্চার করে। সন্তানবক্ষে মাতৃ-মূর্ত্তি মাতৃত্বের আত্ম-হারা ভাবের মধ্য দিয়া অতীত-বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎব্যাপী মানব জীবনের রহস্য প্রকাশিত করিয়া প্রাণে কি এক অপূর্ব্ব আত্মহারা ভাব ফুটাইয়া তোলে। ভক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বৃত্তি। উহা প্রেম ভালবাসাকে অনন্ত রহস্যে পূর্ণ করে, ও স্বর্গের সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করে; এবং তাহাদের মধ্যে অনন্তের দৃষ্টি খুলিয়া দেয়। উহা সকল কলা-শিল্পের প্রাণ। উহা ভিন্ন প্রকৃত সৌন্দর্য্যানুভূতির স্ফুরণ হয় না, এবং অমর-জীবনের আভাসে শিল্প অমর সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হয় না। ভক্তি সকল প্রবৃত্তির নিয়ামক। উহা সকল প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করিয়া তাহাদিগকে বিশ্ব-দেবতার পূজার উপকরণ-রূপে পরিণত করে। ভক্তির জীবনই শ্রেষ্ঠ জীবন, উহাই ভগবৎ-জীবন।

এই সকল প্রবৃত্তিসমূহ আপন আপন স্রোতে মানবকে ভাসাইয়া নিতে চায়। এজন্য তাহাদের মধ্যে সংগ্রাম উপস্থিত হয়। এ সময় মানব মনে বিবেক জাগ্রত হয়। বিবেক এখানে সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, উহা হিতাহিত বা ন্যায়ান্যায় কিম্বা ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেক। বিবেক প্রতিদ্বন্দ্বী বৃত্তিসমূহের কোন্‌টী অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ বলিয়া দেয়; এইরূপে ক্রমে নৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতা-সমূহ নৈতিক সূত্রাকারে নিবদ্ধ হয়। এই সকল নৈতিকমন্ত্র অনুসরণ করিয়া জীবন চালাইলে নৈতিক জীবন লাভ করা যায়।

জীবনে নূতন সংগ্রাম আরম্ভ হয়— শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ের সংগ্রাম; উচ্চবৃত্তি ও নিম্নবৃত্তির সংগ্রাম। শ্রেয়ের পথ অমর জীবনের পথ; প্রেয়ের পথ মৃত্যুর পথ। শ্রেয়ের পথ অনুসরণ করিলে অমৃতত্ব লাভ করিয়া মানব ধন্য হয়। এই সংগ্রামই জীবন; উহা চিরন্তন; উহা ক্রমে মানবকে উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে লইয়া যায়। উচ্চতা হইতে আরও উচ্চতায়, মহত্ত্ব হইতে মহত্ত্বে, আদর্শ হইতে উচ্চতর আদর্শে মানব ক্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। এই উন্নতির পথে মানব চিরকালই অগ্রসর হইতে থাকে। এই অগ্রসর হওয়া বা ঊর্দ্ধ গতিই মানবের স্বভাব; এইখানেই স্বধর্ম্ম লাভ, স্বভাবে স্থিতি। এই গতির অর্থই

শান্তি ও স্থিতি। এইখানেই মানবের স্বাধীনতা। স্বাধীনতার অর্থ উচ্ছৃঙ্খলতা নয়; স্বাধীনতার অর্থ মানব প্রকৃতির স্বধর্ম্মে-স্থিতি—স্বনিয়মে আত্ম-প্রতিষ্ঠা।

অধীনতা এই প্রকৃত স্বাধীনতার প্রসূতি। যে নিয়ম বা ধর্ম্ম হৃদয়ে নিহিত রহিয়াছে এবং যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইলে মানব-প্রকৃতি আত্ম-প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া স্বাধীনতা-সুখসম্ভোগ করে, তাহা পিতামাতার চরিত্র, পরিবার ও সমাজের শৃঙ্খলা, নিয়ম পদ্ধতি, বহুপ্রচলিত বহুকালের অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত ভাব ধারণা ও অনুষ্ঠান, রাজবিধি ও রাজ্য শৃঙ্খলায় আপনাকে নিবদ্ধ করিয়াছে। এই সকল বাহিরের নিয়মের পশ্চাতে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার শক্তি রহিয়াছে। এই শক্তির অধীনতার অর্থ হৃদয়ের ধর্ম্ম বা নিয়মের বহিবে ষ্টনে স্থিতি ও বিকাশ লাভ। এই শক্তির অধীনতা হৃদয়ের ধর্ম্মনীতি বিবেক ফুটাইয়া তুলিয়া সকলকে প্রকৃত স্বাধীনতারূপ দেবত্বের গৌরব প্রদান করে। এই অধীনতার ভিতর দিয়া বিবেককে জাগ্রত করিয়া হৃদয়ের নীতিধর্ম্ম দ্বারা পরিচালিত হইলে মানব চরিত্র লাভ করে। চরিত্রের অর্থ মানবপ্রকৃতির প্রবৃত্তি-সমূহের সুসংযত সুশৃঙ্খল অবস্থা। ইহা মানবের শ্রেষ্ঠ জীবন; ইহাই দেবত্ব। এইখানেই ভক্তি সকল প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া ভগবানের সেবা-আরাধনা-বন্দনারূপ পূজায় নিয়োজিত করে। মানবসেবা, সকল নিত্য নৈমিত্তিক মঙ্গল কর্ম্ম ও পূজায় পরিণত হয়।

ধর্ম্মের পরিচয় কিরূপে পাওয়া যায়? মানব আত্মা অমর। যাহা কিছু চিরন্তন জীবনের সহায় তাহাই ধর্ম্ম; আর, যাহা কিছু ক্ষণস্থায়ী, সাময়িক, চিরন্তন জীবনের অন্তরায়, তাহাই অধর্ম্ম ও অমঙ্গলের হেতু। এই পৃথিবীতেও অমর জীবনের প্রতিকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। এক মুহূর্ত্তের সুখ অপেক্ষা অধিক দিনস্থায়ী ও জীবনব্যাপী সুখ স্পৃহনীয়। ব্যক্তিগত জীবন পারিবারিক জীবনে, পারিবারিক জীবন সামাজিক জীবনে, সামাজিক জীবন রাষ্ট্রীয় জীবনে; রাষ্ট্রীয় জীবন আন্তর্জাতিক সার্ব্বভৌমিক জীবনে পরিণত হইয়া বিশালতা, বিস্তৃতি ও গভীরতা লাভ করে। এই মানবের মঙ্গলের জন্য ব্যক্তি জীবনের সুখ বিসর্জ্জন—ইহা নীতির পথ। এই বিসর্জ্জনের মধ্যদিয়া চরিত্র বা উচ্চ জীবন লাভ হয়।

চরিত্র জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ও শোভা। এই চরিত্র যেমন সমুদয় প্রবৃত্তি সমূহের সংযমের ফলস্বরূপ, উহা সেইরূপ, প্রবৃত্তি সমূহকে যথাযথভাবে পরিচালিত করিয়া তাহাদের বিকাশ সাধন করে।

এই বিকাশ সাধনের জন্য যেমন সংযমের প্রয়োজন, তেমন পরিচালনারও প্রয়োজন; সংযত পরিচালনাই বিকাশের মূলমন্ত্র। উচ্ছৃঙ্খলতা যেমন বিনাশের হেতু, পরিচালনার অভাবও মৃত্যুর লক্ষণ। বীজ তাহার অন্তর্নিহিত শক্তি পরিচালিত করিয়া বৃক্ষে পরিণত হয়, বৃক্ষ তাহার সকল ক্রিয়া যথাযথ নিষ্পন্ন করিয়া বর্দ্ধিত হয় ও ফলে ফুলে শোভিত হয়।

পরিচালনা।

প্রবৃত্তির সহজ তাড়নায় দেহের ও মনের শক্তি চঞ্চল ও ক্রিয়াশীল হয় সত্য, কিন্তু বিকাশের ব্যায়াম ও অধ্যয়নেরও প্রয়োজন। প্রকৃতি সকল সময় যথাযথভাবে সকল শক্তির সমঞ্জসীভূত বিকাশ সাধনের সুযোগ প্রদান করে না। ব্যায়াম দেহের সকল অঙ্গের

নিয়মিত পরিচালনার সুবিধা প্রদান করে। বিদ্যালয় প্রভৃতি মানসিক শক্তি সমূহের যথাযথ পরিচালনার সুযোগ প্রদান করে। বিদ্যালয়ে মনের সমুদয় শক্তি যাহাতে ঠিকভাবে পরিচালিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। আনন্দের সহিত দেহের শক্তি পরিচালনা করিবার জন্য যেরূপ ব্যায়াম ও ক্রীড়ার ব্যবস্থা আছে, সেরূপ আনন্দের সহিত মানসিক শক্তিসমূহের যাহাতে যথাযথ পরিচালনা হয়, সেরূপ শিক্ষাপ্রণালীও উদ্ভাবন করা প্রয়োজন। পর্য্যবেক্ষণ-জাত অভিজ্ঞতা বুদ্ধিবৃত্তির ভিত্তিভূমি। বিদ্যালয়ে পর্য্যবেক্ষণের কোন সুবিধা না থাকাতে বুদ্ধি বৃত্তির সম্যক্ পরিচালনা হয় না। পুস্তকের সাহায্যে বুদ্ধি বৃত্তির সামান্যই পরিচালনা হইতে পারে। ভাষা অন্যের ভাব ও চিন্তার রাজ্যে প্রবেশ লাভ করিবার উপায় মাত্র; কিন্তু নিজের অনুরূপ ভাব ও চিন্তার আলোকে অন্যের ভাব ও চিন্তায় অধিগমন করা যাইতে পারে। নিজের মধ্যে সামান্য পরিমাণ স্নেহ, ভালবাসা, ভক্তি না থাকিলে ভালবাসার জন্য আত্মত্যাগের মহিমা, সন্তানের জীবন রক্ষা করিবার জন্য জননীর জীবন বিসর্জ্জনের মহত্ব, ভক্তি-বিগলিত নয়ন ধারার সৌন্দর্য্য কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। এজন্য দূরবীক্ষণ যেমন চক্ষুবিহীন লোকের নিকট কিছুমাত্র ফলোপধায়ক নহে, সেরূপ পুস্তকও চিন্তাবিহীন লোকের নিকট দুরবগাহ ও অর্থশূন্য। চক্ষুর সম্যক্ ব্যবহারের উপর যেমন দূরবীক্ষণের ব্যবহার নির্ভর করে, সেরূপ মানসিক চিন্তা শক্তির পরিচালনার উপর পুস্তকের অধ্যয়ন নির্ভর করে। মানসিক বৃত্তি সমূহের পরিচালনার জন্য প্রথমে পর্য্যবেক্ষণ-জনিত অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। এই সকল অভিজ্ঞতা রূপ রস শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি জ্ঞানের বিচিত্রতার মধ্যে একত্ব দৃষ্টি, এবং এই একত্বের সংযোগে সমুদয় বিচিত্রতার মধ্যে শৃঙ্খলা বিধান বুদ্ধিবৃত্তির কার্য্য। স্মৃতিশক্তি অতীত অভিজ্ঞতাকে ধারণ করে ও পুনরুদ্বোধিত করে। বুদ্ধি অতীতের সঙ্গে বর্ত্তমানকে সম্মিলিত করিয়া দর্শন করে। কল্পনা অতীতের আলোকে ভবিষ্যতের চিত্র অঙ্কিত করে; বুদ্ধিবৃত্তি, জীবন রক্ষা ও জীবন-বৃদ্ধি ও পরিণতি বিষয়ে ভবিষ্যতের উপযোগিতা অনুপযোগিতা ধারণ করিয়া কর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়া দেয়। বুদ্ধিবৃত্তি, কল্পনা, পর্য্যবেক্ষণ শক্তি, ইন্দ্রিয়াদির যথাযথ পরিচালনার ব্যবস্থা থাকা উচিত। ইন্দ্রিয়গণ তাহাদের শব্দ স্পর্শ রস গন্ধ বর্ণ প্রভৃতি। বিষয় সমূহের মধ্যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পার্থক্য ও সাদৃশ্য উপলব্ধি করিবার শক্তি যাহাতে লাভ করে, তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বুদ্ধি বৃত্তি নিজ শক্তির পরিচালনা দ্বারা সকল বিচিত্রতার মধ্যে একত্বের অন্বেষণে ধাবিত হইবে, একত্বের পশ্চাতে আরও গূঢ়তর একত্ব. তাহার পশ্চাতে আরও শৃঙ্খলতর একত্বে— এইরূপে একত্বের অন্বেষণ করিতে করিতে বিজ্ঞান দর্শন সৃষ্টি করিবে। কল্পনা সকল অভিজ্ঞতাকে নানাভাবে সজ্জিত করিয়া সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিবে। এইরূপে মানসিক বৃত্তি সমূহের পরিচালনাদ্বারা বিকাশ-সাধন করিতে হয়। পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী, আত্মীয় বন্ধু প্রতিবেশী স্বদেশবাসী, দীনদুঃখী আর্ত্তদের ভালবাসিয়া সেবা করিয়া হৃদয়ের প্রেম ভালবাসার বিকাশ সাধন করিতে হয়। কল্পনাতীত ৬০০ শৈলমালা, বিশাল জলধি, অনন্ত নক্ষত্রমণ্ডিত আকাশে পৃথিবীর জন্মবৃত্তান্ত, ফুলের বিকাশ ও বৃক্ষের কথা ভাবিতে ভাবিতে কল্পনাকে বিস্ফারিত করিয়া একটা

বিশালতার ভাবে, রহস্যের ভাবে, সৌন্দর্য্যানুভূতি সাধন করিতে হয়। কর্ত্তব্যের পথে মনকে স্থির দৃঢ় রাখিয়া ও সর্ব্বপ্রকার প্রলোভনের উপর আধিপত্য লাভ করিয়া ইচ্ছা-শক্তির সাধন করিতে হয়। এই নীতির অনুবর্ত্তী প্রবল ইচ্ছা-শক্তির নামই মনুষ্যত্ব।

সাধনাই জীবন; সাধনাতেই জীবনের বিকাশ ও পরিণতি। সাধনাহীন জীবনই মৃত্যু। এই সাধনা দ্বারাই বহির্জ্জগৎ হইতে জীবনের উপাদান সংগ্রহ করা হয়; এই সাধনা দ্বারাই প্রতিকূল শক্তিসমূহকে জীবনের অনুকূল করা হয়। পৃথিবীর বক্ষে কত যুগ হইতে জীবন রক্ষার জন্য অন্ন জল আলোক সঞ্চিত আছে। জীবন আপনার শক্তির পরিচালনাদ্বারা সে সকল সংগ্রহ করিয়া আপনাকে পরিপুষ্ট করে। কত যুগের কত চিন্তা মানব-প্রাণে, মানব-সাহিত্যে সঞ্চিত আছে; এই বিশ্বের মহান গ্রন্থ ভগবানের অত্যাশ্চার্য্য জ্ঞানভাণ্ডার। মানব চিন্তা-শক্তির পরিচালনাদ্বারা সকল চিন্তা, জ্ঞান ও ভাবসম্পদ আয়ত্ব করিয়া সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। হৃদয়ের স্নেহ ভালবাসার পরিচালনাদ্বারা জীবন ক্রমে সম্প্রসারিত হইয়া বিশ্বকে আলিঙ্গন করে। ভক্তির পরিচালনা দ্বারা উচ্চ মহৎ জীবনের মহত্ব লাভ করিয়া জীবন ধন্য হয়।

প্রার্থনা।

সাধনা গভীর হইতে গভীরতর হউক, বিনয়ও সাধনার সঙ্গে সঙ্গে বর্দ্ধিত হউক। বিনয় সকল চেষ্টা, সকল সাধনা ও সকল সিদ্ধি ও অর্জ্জনের শোভা সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত করে। বিনয় আবার সাধনা ও চেষ্টার গভীরতা সূচিত করে। যিনি যত জ্ঞান অর্জ্জন করেন, ততই তিনি তাঁহার অজানিত রাজ্যের বিশালতা বিশেষ রূপে উপলব্ধি করিতে পারেন। যিনি যতই নিজের শক্তি সামর্থ্যপরিচালিত করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হন, ততই তিনি নিজের দুর্ব্বলতা অধিক পরিমাণে উপলব্ধি করেন। এইজন্য মানুষ তাহার সকল সাধনার ভিতর দিয়া নিজের অজ্ঞানতা ও দুর্ব্বলতার জ্ঞান লাভ করে, এবং এই দুর্ব্বলতা জ্ঞানের মধ্যে অনন্ত-শক্তির প্রস্রবণের সন্ধান পাইয়া তাহার উপর নির্ভর করিতে শেখে। প্রার্থনা মানব হৃদয়ের সঙ্গে জ্ঞান ও শক্তির অনন্ত প্রস্রবণের সংযোগ সাধন করিয়া দেয়। নিজের সর্ব্বপ্রকার চেষ্টার মধ্যে নিজের দুর্ব্বলতার কথা স্মরণ করিয়া বিনীত হৃদয়ে ভগবানের শরণ গ্রহণ করার অর্থই প্রার্থনা। প্রার্থনায় আলস্যের কোন অবসর নাই; ইহা অলস ব্যক্তির বিজৃম্ভন নহে। অলস হৃদয়ে প্রার্থনার অবসর নাই। ভগবান আমাদিগকে অনেক শক্তি দিয়া পাঠাইয়াছেন। সেই শক্তি ব্যবহার করিতে করিতেই মাত্র ভগবানের করুণা ও আশীর্ব্বাদের প্রয়োজনীয়তা সম্যক্ উপলব্ধ হয়; এবং এই করুণার উপর আত্মসমর্পণ করিলে ভগবান যে শক্তি দিয়াছেন, তাহা অবলম্বন করিয়া ভগবান তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায়ানুযায়ী আমাদের প্রার্থনা পূরণ করেন।

প্রার্থনার কত অদ্ভুতশক্তি। আমরা আমাদের শক্তি ব্যবহার না করিলে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। আমাদের শত চেষ্টার মধ্যদিয়া নিজের দুর্ব্বল হৃদয়ের ক্রন্দন যখন ভগবচ্চরণে উপস্থিত হয়, তখনই প্রার্থনার উপর ভগবানের আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হয়। প্রার্থনা নিরাশ প্রাণে আশা সঞ্চারিত করে, ভগ্নহৃদয়ে সান্ত্বনা আনয়ন করে, পাপ প্রলোভনের সঙ্গে সংগ্রাম করিবার জন্য দুর্জ্জয় শক্তি আনয়ন করে, অন্ধকারে আলো ফুটাইয়া

তোলে। প্রার্থনা ভগবজ্জীবনের মহত্ত্ব ও গৌরবে মানবজীবনকে মণ্ডিত করে, ভগবৎ-তত্ত্ব প্রাণে পরিস্ফুট করে, প্রেম ভালবাসা ভক্তি বিকশিত করিয়া বিশ্বের ও স্বর্গের সুরের সঙ্গে জীবনকে মিলাইয়া দেয়। এখানেই মানব জীবনের পূর্ণ সার্থকতা; এখানেই মানব জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিণতি।

শ্রীবেণীমাধব দাস।

স্বর্গীয় মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা

জন্ম—বরিশাল, শ্রাবণ—১২৬৪।

মৃত্যু—গিরিধি, ১৭ই জ্যৈষ্ঠ—১৩২৬।

বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলনে যাঁহারা প্রধান কর্ম্মী ছিলেন, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা তন্মধ্যে অন্যতম। বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ বানরীপাড়া গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। শিক্ষা-জীবন সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই তিনি নানাকারণে বিবাহ করিতে বাধ্য হন। বিক্রমপুরের কুকুটিয়া গ্রাম-নিবাসী কালীকুমার দত্তের কন্যা মনোরমার সহিত তাঁহার পরিণয় হইয়াছিল। মনোরঞ্জন স্বাধীনতার উপাসক, সুলেখক ও সুবক্তা ছিলেন। তাঁহার চিত্তের একাগ্রতা, উদ্যম ও নির্ভীকতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভণ্ড স্বদেশপ্রেমিকদিগের ন্যায় তিনি মনে এক ও কার্য্যে অন্যপ্রকার ছিলেন না। তাঁহার ন্যায় স্বদেশভক্ত অতি বিরল। কি শত্রু কি মিত্র, কাহারও মুখ চাহিয়া কথা কহিতেন না। তিনি গরম দলের লোক ছিলেন।

স্বদেশী আন্দোলনের আরম্ভকাল হইতে তিনি স্বদেশ-সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। সেই সময়ে তাঁহার বাক্‌বিভূতি দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ১৯০৭ খ্রীঃ মে মাসে "নবশক্তি" নামে একখানি দৈনিক পত্রিকা প্রচার করেন। বাঙ্গালীর প্রাণে "নবশক্তি" তখন এক নূতনশক্তিসঞ্চার করিয়াছিল। অবশেষে যখন লর্ড কার্জ্জনের রাজবিধানরূপ ছুরিকাঘাতে বঙ্গমাতা দ্বিখণ্ডিত হন, এবং তাহার ফলে যখন ক্রমে ক্রমে জাতীয় জীবনের জয় পতাকা ভারতাকাশে উড্ডীন হয়, সেই সময় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতির সহিত মনোরঞ্জন গুহ যোগদানপূর্ব্বক মাতৃপূজায় জীবন উৎসর্গ করেন। স্বদেশী আন্দোলনের সর্ব্বব্যাপিকা ফলে ভারত-গবর্ণমেণ্ট বিচলিত হয়েন। লর্ড মিণ্টো তখন ভারতের রাজপ্রতিনিধি। তাঁহার আদেশে বরিশালের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত, বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঢাকার শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দাস, কলিকাতার শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র প্রসাদ বসু, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র চন্দ্র নাগ, শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মল্লিক এবং মনোরঞ্জন, এই নয়জন স্বদেশপ্রাণ ব্যক্তি নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ২২ই ডিসেম্বর মনোরঞ্জনকে গিরিধিতে গ্রেপ্তার করিয়া ১৮ই ডিসেম্বর ব্রহ্মদেশের ইনসেন সেন্ট্রাল জেলে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছিল। শ্যামসুন্দরের সহিত

এক জাহাজেই রেঙ্গুন পর্য্যন্ত তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হয়। তাঁহার পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণার্থ গবর্ণমেণ্ট মাসিক ১৭৫৲ টাকা নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন। ১৯১০অব্দেঃ ৮ই ফেব্রুয়ারি মুক্তি পাইয়া ১৭ই তারিখে "বাঙ্গালা" নামক ষ্টীমারে তিনি কলিকাতায় উপনীত হন। তাঁহার মুক্তির সংবাদ প্রকাশ হইবার পূর্ব্বেই দুই পুত্র—সত্যরঞ্জন ও চিত্তরঞ্জন—পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ব্রহ্মদেশ গিয়াছিলেন।

তিনি বরিশালের একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। শেষ বয়সে অধিকাংশ সময় গিরিধিতে অবস্থান করিতেন। নির্ব্বাসন হইতে আসিবার পর অনেকের মত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার হয় নাই। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য প্রভূত কষ্ট স্বীকার করেন এবং বহু বৎসর ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ছিলেন। অবশেষে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য হন। তিনি স্বদেশের আচার ব্যবহার ভালবাসিতেন।

তিনি শেষ জীবনে কেবল সাহিত্য-সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি "বিজয়া" নামে একখানি মাসিক পত্রিকার সম্পাদকের কার্য্যভার কিছুকাল গ্রহণ করেন। বিজয়া বন্ধ হইলে বিবিধ পত্রিকায় নানাবিধ প্রবন্ধাদি লিখিতেন। নির্ব্বাসন-স্থান হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি নির্ব্বাসন-কাহিনী" নামে একখানি পুস্তকপ্রচার করেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে তদীয়া স্বর্গগতা সহধর্ম্মিণীর জীবনকথা অবলম্বনে "মনোরমার জীবন-চিত্র" নামে একখানি পুস্তক (দুই ভাগে) লিখিয়া গিয়াছেন। এই পুস্তকে তাঁহার জীবনের অনেক প্রধান প্রধান ঘটনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত প্রয়াগধামে কুম্ভমেলা, ছাত্রেরা খাবে কি, প্রভৃতি কয়েকখানি সুন্দর গ্রন্থ আছে।

তিনি জীবনে সুখ দুঃখ অনেক ভোগ করিয়াছেন। শেষ জীবনে গিরিধির নির্জ্জন কুটীরে বসিয়া ধর্ম্মসাধনা ও সাহিত্যসেবা করিতেন। অতঃপর এই স্থানেই ধরার পান্থশালা পরিত্যাগ করিয়াছেন। ১৭ই জ্যৈষ্ঠ (১৩২৬) দারুণ বহুমূত্র রোগে আনুমানিক ৫২ বৎসর বয়সে লোকান্তরিত হইয়াছেন। তাঁহার চারি পুত্র, তন্মধ্যে দুটী পুত্র ও পত্নী পূর্ব্বেই গতাসু হন। বরিশালের পুলিশ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্স ভাঙ্গিয়া দিবার সময় তাঁহার একটী পুত্র আহত হইয়াছিলেন। মনোরঞ্জনের মৃত্যুতে বঙ্গজননী একজন স্বদেশপ্রাণ সন্তান হারাইয়াছেন। যাও মনোরঞ্জন, তুমি অনন্তধামে যাও—তোমার কীর্ত্তিই ধরাধামে চিরকাল থাকিবে।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বসু।

নারীর অধিকার—প্রাচীন ও নবীন

নারীর অধিকার—(স্থান স্বর্গ, স্বর্গপতির ইচ্ছা "স্বর্গীয়া" মহিলারা বঙ্গদেশের কল্যাণের জন্য একবার মর্ত্ত্যে গমন করেন)

বিশ্ববরা। ভাবিয়া দেখিলাম, আমার যাওয়া হয় না। প্রথম কথা এই যে, উহারা মেয়েদের উপনয়নের অধিকার হরণ করেছে। দ্বিতীয়, আমার কার্য্য মন্ত্র রচনা ও যাগযজ্ঞে পৌরোহিত্য করা। কিন্তু বৌদ্ধ-বিপ্লবে যাগযজ্ঞ সব লোপ পাইয়াছে, সুতরাং আমার যাওয়া নিরর্থক। মৈত্রেয়ী যদি যায়।

মৈত্রেয়ী। দেখ, আমি স্ত্রী-প্রজ্ঞা নই, আমার মতিগতি যে দিকে, সে পথ এখন রুদ্ধ। উহারা যে কেবল ব্রহ্মজ্ঞানের চর্চ্চা

ছাড়িয়া দিয়াছে, তাহা নহে, অধঃপতন এতদূর অগ্রসর হইয়াছে যে, বলে কি ব্রহ্মজ্ঞানে নারীর অধিকারই নাই। লজ্জাহীনতা এত যে, নিয়ম করিয়াছে, নারী বেদ আলোচনা করিতে পারিবে না। অথচ, "যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্" কথাটার কত ভাষ্য টীকা করিয়াছে। তবে ব্রাহ্মসমাজে যেতে পারি, তাঁহারা নারীর অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে এবং প্রাচীন সুপ্রথাগুলি যাহা লইয়া ভারতের গৌরব, তাহা পুনরুজ্জীবিত করিতেছে। গার্গি, তোমার তো অবাধ গতি, যাজ্ঞবল্ক্যকেও তিন নাড়া দিয়াছিলে, তুমি যাও না?

গার্গী। তা বেশ বলেছ, সে রাম আছে, না সে অযোধ্যা আছে? আমাকে কি আর সভা সমিতিতে যেতে দিবে? যাই তো কত কুৎসা রটনা কর্ব্বে। এক অনার্য্য অবরোধ-প্রথা কোথা থেকে এসে সে আর্য্য দেশ একেবারে শ্রীহীন ও অপদার্থ করে ফেলেছে। বলতো মারাঠা দেশে যেতে পারি হাঁ, ব্রাহ্মদের মধ্যে থাকা চলে। তাঁহাদের নারীরা জাতীয় মহাসমিতিতেও দাঁড়াইবার অধিকারিণী। আত্রেয়ী না হয় যাক্।

আত্রেয়ী। আর কি সে দিন আছে? যদু-পতে, ক গতা তে মথুরাপুরী? যে দেশে নারীর বিদ্যার দৌড় মহাকালী পাঠশালা, ৮ বছরের মেয়েকে বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে যে দেশে মদনমোহন সমাজচ্যুত হইলেন, সেখানে আমাকে পাঠাতে চাও, তোমাদের বিবেচনা বেশ! ব্রাহ্মখাতায় নাম লেখাতে বলতো পারি। বেথুন বিদ্যালয় তো আছেই, সিটি কলেজে প্রেসিডেন্সী কলেজের সুবিধাও পাব। বলতো মুম্বই যাই, সেই-খানে ছেলে মেয়েরা এক কলেজে পড়ে, যেমন দেখেছিলাম বাল্মীকির তপোবনে। মণ্ডন-মিশ্রের ঘরণীকে যাচাই করে দেখ।

উভয় ভারতী। খুব শিকার পেয়েছ। উহারা মাতৃজাতিকে এমন অবিশ্বাস করিতে শিখেছে যে, অপরিচিত পণ্ডিতের সঙ্গে আলোচনা তর্ক বিতর্ক তো দূরের কথা, পরিচিত লোকের সহিত আলাপ করিলেও নারীর সপিণ্ডকরণ করিবে। খাঁচায় বদ্ধ হইয়া থাকা আমার পোষাইবে না।

হটি বিদ্যালঙ্কার। আমাকে ডাকাই বৃথা। যাওয়া মাত্রই আমার নামের ব্যাকরণ ভুল ধরিবে, আর পশ্চাতে একটা আকার যোগ করিয়া দিবে, যেন উপাধিরও লিঙ্গ চাই। ঐ দেখ না, ব্রাহ্ম মেয়েরা নামের সঙ্গে উপাধি যোগ করে বলে তাদের কত লাঞ্ছনা।

খনা লীলাবতি। আমাদিগকে কি চির জীবন বাটনা বেটে কুটনা কুটে কাটিয়ে দিতে বল? ও কাজ করবার ঢের লোক পাওয়া যায়,বিষ্ণুপুর মেদিনীপুর কটক অঞ্চলে। বড় জোর বল্‌বে, অবসর সময়ে রামায়ণ মহাভারত পড়। শাশুড়ী ননদের কৃপায় সে অবসরও বড় পাওয়া যাবে না। তাঁরা নাকি বলে, সেলাই শেখ, রান্না শেখ, বোধোদয় পর্য্যন্ত না হয় পড়, নারীর আবার উচ্চশিখা কি? সেই স্বাধীনতার উন্নত যুগে যা কিছু পেয়েছিলাম, সব খোয়াব কি? ব্রাহ্মেরা ছাড়া আর কেউ আমাদের আদর কর্ব্বে না।

বিদ্যোৎবরা। জগতের শ্রেষ্ঠ কবি যেখানে, আমি কেবল সেখানেই অবতরণ করিতে পারি, আর কোথায়ও নয়। তিনিও তো ব্রাহ্মসমাজেরই লোক।

অনামা। আমার পক্ষে সেখানে যাওয়া তো একেবারেই ঘটে না। বিবাহের সময় সপ্তপদী গমনে ক'নে কটা বাধ্যতা অধীনতায় প্রবেশ করছে, তার একটা তালিকা আছে বটে, তার কোন অধিকারের প্রসঙ্গ আছে কি? আর আমাকে বিবাহান্তে কি বলে

স্বামীগৃহে বিদায় দিয়েছিল, মনে নাই বুঝি? "গৃহান্ গচ্ছ গৃহপত্নী যথা সো, বশিনী ত্বম্ বিদথম্ আ বদাসি।" (অথর্ব্ববেদ. ১৪।১।২০) গৃহপত্নী হয়ে গৃহে যাও! সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সভাসমিতিতে স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করিবার পেলে। এখন কিন্তু এঁরা বল্‌তে আরম্ভ করেছেন "স্ত্রীণাং নাস্তি স্বতন্ত্রতা"। হায়রে হায়. হাতে শিকল পায় শিকল। তবে ব্রাহ্মসমাজের কথা স্বতন্ত্র।

সকলে। তা ঠিকই বটে! এক ব্রাহ্মসমাজ ছাড়া আর কোথায়ও আমাদের স্থান নাই।

(দৃশ্য পরিবর্ত্তন)

সীতা। যেখানে স্বামীর সঙ্গে একটু খানির জন্য ঘরের বাহির হইলে নিন্দাভাজন হ'তে হবে, সেখানে আমার পোষাবে কি? এই সে দিনও ইংরাজ আমলের স্বরুকে স্বামীর কর্ম্মস্থলে স্ত্রীর যাওয়া লইয়া নাটক নভেল লিখিয়াছে ও ঠাট্টা তামাসা করিয়াছে। আমাকে যে স্বামীর সঙ্গে বনে জঙ্গলেও না থাকিলে চলিবে না। বাঙ্গালী কল্পনা রাজ্যে আমার উপকার করেছে বটে, কিন্তু বঙ্গসমাজে আমার আর স্থান নাই। লোকগুলি এমন বেয়াদব, মেয়ে মানুষ দেখলেই হাঁ করে তাকিয়ে থাকুবে! মেয়েমানুষ যেন একটা রাজ্য ছাড়া জিনিষ। মায়ের গর্ভে যে জন্মেছে, সে কথা একেবারে ভুলেই যায়।

সাবিত্রী। হাঁ, উহাঁরা সীতা সাবিত্রী করে বটে, সেটা কেবল মুখে, মনে মনে যে আমাদিগকে ঘৃণা করে, তার কি কোন সন্দেহ আছে? ওঁরা আমাদিগকে বহুদিন পরিত্যাগ করেছে। সাবিত্রী ব্রতের কথা। সেতো একটা স্বার্থানুশীলন। ঐ এত বয়স পর্য্যন্ত-যদি অনূঢ়া থাকি, তবেই তো কুৎসা রটনা করিয়া দেশ ছাড়া করিবে। যদিই বা পণের দায়ে একটু বেশী বয়স হয়, ভাব দেখিন্, আমি পিতার কাছে প্রস্তাব করিলাম, আমাকে লোকজন সঙ্গে দাও আমি পতি খুঁজিতে বাহির হইব, দেশ বিদেশে মনের মত বর চাহিয়া বেড়াইব,তাহা হইলে কি এখন ইহারা আমাকে পাগ্‌লা গারদে আটক করিবে না? দেশের মধ্যে একটা ঢিঢি পড়িয়া যাইবে না? যেন একটা কি কুৎসিত প্রস্তাব করিয়া ফেলিলাম। বিবাহটা যে পুরুষ রমণীর হৃদয়ের যোগ,তা ইহারা ভুলিয়াই গিয়াছে। তাই বিবাহের নামে পুতুল খেলা। আর তখন আমাকে বলিতেও হইল না, বাবা উপযাচক হইয়া বলিলেন "স্বয়মন্বিচ্ছ ভর্ত্তারং গুণৈঃ সদৃশমাত্মনঃ"। আমি তো মনের মত পতি বির্ব্বাচন করিয়া ফিরিলাম। নারদের কথা শুনিয়া বাবা তো অমতই করিলেন। এখন হ'লে, বাপের অবাধ্য হইয়া মেয়ে বিবাহ করিতে চায় বলিয়া কত না দুর্নাম রটিয়া যাইত। কেহ কেহ খ্রীষ্টিকৃনিয়ার ব্যবস্থা করিতে ছাড়িত না। স্ত্রী স্বাধীনতার মহিমা উহারা একেবারে বিস্মৃত হইয়াছে। মুখে যা বলে তার পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য জানে না, কাজে করে তার ঠিক বিপরীত। যার শতাংশের একাংশ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে না হইতে ব্রাহ্ম মেয়েদের উপর এমন অকথ্য অবিচার ও অত্যাচার হচ্ছে, যেখানে সে দেশ মুখো আর আমি হব না। বাঙ্গালীর ধৃষ্টতা দেখিয়া অবাক হইতে হয়। আমাকে সংশোধন করিবার প্রস্তাব করিয়াছে। মরণ আর কি! দময়ন্তী না হয় যাক্। ও বেশ জাঁহাবাজ মেয়ে। আমি লোকজন সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম, সে একাই সব দেশ ঘুরেছে।

দময়ন্তী। বাঃ বেশ তো, তোমাদের যা পরিত্যক্ত তাই বুঝি আমার? না ভাব দেখি, অত বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকিবার সুযোগ ও স্বাধীনতা দিবে কি? সেইটাই

তো আকাশ-কুসুম! তারপর, পত্রবাহকের দ্বারা প্রেমাস্পদের সঙ্গে ভাব-বিনিময় সেতো কল্পনারও অতীত। ভাগ্যে, সে সময় বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল, তাই পুনঃ স্বয়ম্বরের নিমন্ত্রণ প্রেরণ করিয়া নলকে বাহির করিয়াছিলাম, এখন সে পোড়াদেশে এ কিছুই সম্ভব নয়। আমি ঘরের কোণে ঘোমটা টেনে বসে থাকতে পার্ব্বো না।

সুভদ্রা। আমি জানি, বাঙ্গালী আমাকে অনেক উপরে তুলেছে, কিন্তু ভাব দেখি, এখন যদি বাপ ভাইএর নিমন্ত্রিত বরকে অগ্রাহ্য করিয়া অর্জ্জুনকে লইয়া বাপের ঘর হইতে পলায়ন (Elope) করি, তবে কি উহারা আমাকে আফিং দিয়া মারিবে না? ওরা এমন পদার্থহীন হয়েছে, যদি একটী মেয়েকে বগি হাঁকাতে দেখেইতো একেবারে হাঁ করে। এদিকে দেখ, আমি অর্জ্জুনের রথে সারথি হয়ে বসেছি, মনে থাকে যেন তখনও কিন্তু বিয়ে হয় নাই courtship চলিতেছে মাত্র—অর্জ্জুন জ্ঞাতিবর্গের উপর অস্ত্রবর্ষণ করিতেছেন, আমি রথ চালাইতেছি, সামাজিকভাবেই হোক আর যে ভাবেই হোক, বাঙ্গালী এ দৃশ্য কল্পনা করিয়াই মূর্চ্ছা যাবে, কাহারও ঘরে আমার স্থান হবে না। আর আমি যে সম্বন্ধে বিবাহ করেছি, সে কথা মনে করে উহারা আমাকে এক দম পর পারে হাঁকিয়ে দেবে। মিত্রবিন্দা বা ভদ্রা যাক্।

মিত্রবিন্দা। সাবাস যুক্তি! উনি পিসতুত ভাই বিয়ে করেছেন বলে জাত গেল, আর আমরা মামাতো ভাই বিয়ে করেছি সুতরাং কুলীনই রইলাম। আসল কথা, বাঙ্গালী আর এখন আমাদের স্বীকার করবে না। তারা একদম বদলে গেছে। আমরাও আর এই অধঃপতিতদের ছায়া মাড়াতে চাই না। ওরা আগেকার কথা সব ভুলে গিয়ে একেবারে অনার্য্য হয়ে গেছে।

অম্বা। আমায় কেন? আবার কুরুক্ষেত্রের সূচনা কর্ত্তে হবে নাকি? আমি দু দুবার কুরুক্ষেত্র দেখেছি, আর না। সে দেশের মানুষগুলো এমন কাণ্ডজ্ঞানহীন যে, নারীর অপমানের প্রতিশোধ নারীকে নিজ হাতে না লইলে আর তার প্রতিষ্ঠান নাই, কেরোসিন তেলে পুড়ে মরা ছাড়া নারীর প্রতি অবিচারের আর প্রতিকার নাই, পুরুষগুলো এমনই স্বার্থপর। নারী-হৃদয়ের জ্বালা নিবারণের একমাত্র উপায় জ্বলন্ত অনলে প্রবেশ। মানুষগুলো এমন নির্ব্বীর্য্য কাপুরুষ যে, সমাজের দাসত্ব কর্ত্তেই তারা এসেছে, পশুবল ছাড়া অন্য বলের ধার ধারে না। নৈতিক বলে লোকভয়, লোক-লজ্জাকে অতিক্রম করিবার সাধ্য উহাদের আছে কি? তাহারা এমনই পুরুষত্বহীন যে, হৃদয়ের চিরপোষিত অনুরাগের খাতিরেও লোকাচার বর্জ্জন করিয়া স্বাধীন পথে চলিতে চাহিবে না। পুরুষের শত খুন মাপ, কিন্তু অবলা নারীর অঙ্গ যদি কেহ জোর করিয়া স্পর্শমাত্র করে,অমনি তাহার উপর সমাজের সর্ব্ব কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা। ভীষ্ম যে আমায় ধরিয়া লইল সে দোষ কি আমার! যে দেশে নারী জন্ম বিধাতার অভিশাপ, সে দেশে অম্বা যাবে না।

অম্বালিকা। দিদি তুমি যে সেই থেকে চটে রয়েছ, তোমার মনের আগুন আর নিভলো না। আগুনে পুড়ে শরীরটাকেও তাতিয়ে ফেলেছ। কিন্তু ভেবে দেখ দেখি, এখনকার চাইতে সে কাল কি শতগুণে ভাল ছিল না? বাবা কত সাধ করে বীর্য্যশুল্কে শান্তনুকুলে বিয়ে দিলেন, সে সকল বিষয়ই তো এখন উঠে গেছে। তারপর যক্ষ্মারোগে বিচিত্রবীর্য্য যখন মারা গেল, তখন তো সব দিক্ অন্ধকার। তখন বলে হ'ল, এখন কি আর পাণ্ডুর মত পুত্র লাভ সম্ভব হয়? এখন

ইহারা তো পাণ্ডুচরিত, যুধিষ্ঠির কাহিনী পুণ্য কথা বলে শ্রবণ করে, কিন্তু বল দেখি, আজ যদি পাণ্ডু কি যুধিষ্ঠির তাদের বাড়ীতে জন্ম নিতে যায়, তবে কি তাঁদের ওরা খ্যাংড়া পেটা করে না? দেশটা কপটাচারে ভরে গিয়েছে, এমন পরিবর্ত্তন কোন্ দেশের হয়েছে? দেশটাকে দেখে চেনা যায় না।

মাদ্রী। ঠাক্‌রুণ, যা বল্লেন তা ঠিক্, কিন্তু পরিবর্ত্তন কি কেবল মন্দর দিকেই হয়। এই দেখুন না, এখন তো আর স্বামীর চিতায় পুড়ে মর্ত্তে হয় না, রাজা রামমোহন রায়ের কৃপায় মেয়েরা সে দায় হতে মুক্ত হয়েছেন।

প্রমীলা। আমাকে কিন্তু তার পরেও পুড়িয়েছে। মানুষের কুসংস্কার মরেও মরে না। আচ্ছা, মাদ্রীদেবীর একটু যাওয়ার লোভ হচ্ছে। কিন্তু ভেবে দেখুন দেখি, পাণ্ডুর সঙ্গে যেমন করে ঘুরে বেড়াতেন, তেমনটি আর পার্ব্বেন কি না, সে পথ বন্ধ। পথে বেরুলেই টিটকারী আর কাণাকাণি।

রেবতী। না, সে দেশে আবার মানুষ যায়। স্বামীর সঙ্গেও যদি মেয়েরা এখন উদ্যানাদি ভ্রমণে যায় বা সভাসমিতিতে যায়, অমনি কত কথা উঠে। লোকগুলির মনই বিকৃত হয়ে গেছে কি না? নইলে সেকালে আমরা কত কি করেছি। সেই প্রভাসাদি উৎসবে যে বলদেবের হাত ধরে কত নেচেছি, কই, কেউ তো তখন কিচ্ছুই বলে নি। এখন এ কি দৃশ্য! না, আমার যাওয়া হবে না। যেয়ে কি সেই ঘরের কোণে তাঁদের মত কেবল———। যাক্, শক্ত কথা বলে আর কি হবে। এঁরা এখন শত দুর্দ্দশায় নিপীড়িত, শত লাঞ্ছনায় লাঞ্ছিত হলেও তো আমাদেরই বোন্। কি অধঃপতন!

জনা। তাকি আর বল্‌তে। স্বামী যখন পুত্রহন্তার সঙ্গে মিত্রতা, কর্ত্তে গেলেনা, কাজটা এমন ঘৃণার্হ বলে মনে হ'ল যে মুখের উপর প্রতিবাদ না করে পার্‌লাম না। এরা বল্‌বেন, স্বামীর অনুগমনই পত্নীর ধর্ম্ম। তা ঠিক, স্বামী যতক্ষণ ধর্ম্ম পথে থাকেন। কিন্তু যে ধর্ম্মের অনুশাসনে স্ত্রী স্বামীর বশবর্ত্তিনী, স্বামী যখন সেই ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করেন, তখন তাঁহার দাবীর দাঁড়াইবার স্থান নাই। তখন স্বামীকে মানাই অধর্ম্ম। আমি প্রতিবাদ করিলাম, স্বামী শুনিলেন না, আমি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিলাম। অন্যায় করেছি কি? কখনই না। ভ্রমর আমার সমর্থন কর্‌বেন। "এরা কিন্তু স্ত্রীনাং নাস্তি স্বতন্ত্রতা" বলিয়া আমাকে নরকে পাঠাবে। তা বলুক, আমি ওদের কথা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আনি না।

লোপামুদ্রা। আমি ক্ষত্রিয় কন্যা, উগ্রতপা ব্রাহ্মণ অগস্ত্য যখন আমার প্রার্থী হইলেন, আমার সম্মতি না জানা পর্য্যন্ত পিতামাতা কোন উত্তর দেন নাই, ব্রাহ্মণ হলে কি হয়। এখনকার দিনে এ সব প্রথা আছে কি?

সত্যবতী। আমি তো তবে গেছি। পিতৃ গৃহেই ব্যাসকে ক্রোড়ে পাইয়াছিলাম। তাতে কি আমার বরের অভাব হল? যদিও আমি নিজে ধীবর কন্যা, আমারই বংশ কি ভারতে একছত্রাধিপত্য করিল না? মহারাজ শান্তনু নিজে উপযাচক হয়ে আমায় বিয়ে কল্লেন। তখন যে গুণের আদর ছিল। এখন সে সব কথা ইহারা অলীক মনে করে।

কাক্ষিবতী (বৈদিক। এখন সেখানে সবই বিপরীত। উপযুক্ত পাত্র পাই নাই, সুতরাং আমি পিতৃগৃহে বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিতা ছিলাম, কোন কথাই তো উঠে নাই। নিতান্ত অস্বাভাবিক নিয়মের দাস না হইলে কথা উঠিবেই বা কেন? পিতৃ গৃহে কন্যা থাকিবে, ইহাতে আবার কথা কি? উপযুক্ত পাত্র মিলুক আর না মিলুক, কোন বিশেষ

বয়সে কন্যাকে ঘরের বাহির করিয়া দিতেই হইবে, ইহা অপেক্ষা অস্বাভাবিক ব্যবস্থা আর কি হইতে পারে? যে আমাকে চায় না, পিতা মাতার ঘর বাড়ী বিক্রয় করা টাকা চায়, তাহারই ঘরে যাইয়া আমাকে থাকিতে হইবে। কি নির্ম্মম অনুষ্ঠান! নারীর কৌমার্য্যের অধিকার লোপ করিয়া সমাজের কি দুর্দ্দশাই না হইয়াছে? মনু যে বলিয়াছেন, যে সুপাত্র না পাইলে কন্যা আমরণ পিতৃগৃহেই থাকিবে! উহারা এখন এসব কল্যাণকর নিয়ম প্রতিপালন করে না, স্বার্থপরতার জন্য পুরুষ এখন কন্যার পিতৃধনের অধিকার হরণ করেছে, তাই সে বিবাহ ছাড়া মেয়ের আর গতি নাই। যদিও শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন, অনূঢ়াশ্চ দুহিতরঃ পুত্রভাগানুসারাঃ", যদিও বর্ত্তমানযুগের ঋষি রামমোহন নারীর এই অধিকারের জন্য অনেক সংগ্রাম করিয়াছেন, কিন্তু কেহ আর এখন তাহা মানে না; চোরা নাহি শুনে কভু ধর্ম্মের কাহিনী।

গোপা। কি শাস্ত্র কি দেশাচার, কেহই এখন আমার সঙ্গে সিদ্ধার্থের বিবাহ মঞ্জুর করিবে না। সুতরাং আমি যাব কোন্ আশায়?

অদ্বৈতাচার্য্যের পত্নী। আমার সাজ পোষাক দেখিয়া উহারা আমাকে নিশ্চয়ই অসভ্যা বলিয়া তাড়াইয়া দিবে। কি পরিবর্ত্তন (চৈতন্যের জন্মে অদ্বৈত্যপত্নী যেরূপ সাজ সজ্জা করিয়া জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে যাইতেছেন, চৈতন্য চরিত্রামৃত হইতে সেই অংশ দ্রষ্টব্য)

রুক্মিনী। ভাব দেখি আমার কথা? পিতা ভ্রাতা জ্ঞাতিবর্গ পরামর্শ করিয়া এক বর স্থির করেছেন। আমি কিন্তু আমার মনোনীত মানুষকে সেদিন সদলে এসে বাপ ভাইর হাত হতে আমাকে ছিনিয়ে নেবার জন্যে খবর পাঠালাম। আমার অবাধ্যতার জন্য বাপ ভাইএর যে অপমান, যে লাঞ্ছনা হল, তাহাতে বর্ত্তমান বাঙ্গালী কি আতুর ঘরেই গলায় নুন দিয়ে আমায় মেরে ফেল্‌বে না? প্রেমে স্বাধীনতার সে আদর কি আর আছে! ব্রাহ্ম সমাজও আমার হজম করতে পার্ব্বে কি না সন্দেহ। পারে তো সত্যভামা যাক্।

সত্যভামা। মরিরে কি সুখ! একেবারেই সতীনের জ্বালা বেশ পুহিয়েছি, আর না। বলতো ব্রাহ্মসমাজে যাই।

উমা। আর কেন জ্বালাতন কর। সেই উগ্র তপস্যাদ্বারা মনের মতন পতি লাভের আর স্বাধীনতা আছে কি? তারা আমাকে আট বছরে গৌরী দান কর্ব্বে। হায়, আমার নামটাকেই কলঙ্কিত করে ফেলেছে।

শকুন্তলা। আমাকে যেতে বলায় আমি নিতান্ত অপমানিত বোধ কচ্ছি। ভাব দেখি, আজ যদি সেই রাজ সভায় উপস্থিত হয়ে নারীর অধিকার ও সম্মান রক্ষার জন্য স্বামীকে তিরস্কার করি, তাহলে তোমাদের বঙ্গসমাজ কি আমাকে আস্ত রাখ্‌বে? স্বামী যা ইচ্ছা তাই বল্‌বে, আর তোমাদের হতচ্ছাড়া আচার অনুসারে পতি দেবতার মুখের উপর কথা বল্‌তে নাই বলিয়া চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক্‌বো, তা আমা দ্বারা হবে না। পতি, পতি সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি যদি বিপথে যান, তবে গুরু হয়ে তাঁকে উপদেশ দিব, শাসন কর্ব্বো। প্রত্যাখ্যানের অপমান আমি কি নীরবে সহ্য করিলাম। নারীর মর্য্যাদা রক্ষার জন্য আমি যখন চোখ রাঙ্গাইয়া সেই বিরাট রাজসভা কম্পিত করিয়া বলিলাম, অনার্য্য নিজের মতই সকলকে ভাব', তখনই কি দুষ্মন্তের স্মৃতির আবরণ টুটিতে আরম্ভ করিল না? বাঙ্গালী সে জন্য আমার নিন্দা প্রচার করিয়াছে। স্বার্থপর পুরুষ নিজের সুখ সুবিধা কড়ায় গণ্ডায় বজায় রাখিবার জন্য যে ব্যবস্থা করে, তাহা না

মানিলেই অমনি খড়্গহস্ত। আমার মান কিছু রক্ষা করিয়াছে পাশ্চাত্যেরা, তাঁহাদের যে সামাজিক আদর্শ এখনও উচ্চ আছে। যারা নারীর মর্য্যাদা রাখে না, মা বোনের জাতের অপমান কর্ত্তে, নিন্দা রটাতে কিছু মাত্র ভ্রুক্ষেপ করে না—তারা তো গোল্লায় যাবে, তা যাক্। আমি সে দেশে যেতে পার্ব্বো না। আমি যে বিবাহ করেছিলাম, তাহা তো ওঁরা এখন বিবাহ বলেই স্বীকার করে না। ভেবে দেখ দেখি, ওঁদের চোখে আমি এখন কি? ওঁরা আমায় শিকেয় তুলে রেখেছে কেবল সেক্সপিয়রের সঙ্গে ঝগড়া করিবার জন্য। কি ভীষণ কপটতা। আচ্ছা, আমাকে যদি খুকীটি গরদের পুঁটুলি করিয়া বিবাহ সভায় উপস্থিত করা হয়, তবে "অভিজ্ঞান শকুন্তলম্" লইয়া গৌরব করিবার কিছু থাকে কি? বলতো, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মেম্বর হতে পারি। আর পারি কেন, হতে তো হবেই। ভরতকে যদি পিতৃরাজ্য উত্তরাধিকার সূত্রে পেতে হয়, তবে তো ও বিবাহ ৩ আইন অনুসারে রেজেষ্ট্রী করিতেই হইবে। ব্রাহ্মণের মেয়ে বিয়ে কর্ল্লাম ক্ষত্রিয়—যত রাজ্যের আহাম্মক পণ্ডিত পাতি দিয়াছে, যে ও বিবাহ হিন্দু-বিবাহ নহে।

অরুন্ধতী। কথাটা ঠিকই। আজ যদি আমার মত কোন মেয়ে বলে যে সর্ব্বদা ঘরে বাইরে স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌বে, এক মুহূর্ত্তও তাঁর পার্শ্ব ত্যাগ কর্ব্বে না, তা হলে তার কি গঞ্জনা হয়, ভাব দেখি? প্রত্যেক নব বিবাহিতা কন্যাকেই ওরা আশীর্ব্বাদ কর্ব্বেন, "অরুন্ধতী বশিষ্ঠস্য দময়ন্তী যথা নলে"—কিন্তু কোথায় বা অরুন্ধতী,কোথায় বা বশিষ্ঠ! মনের মত পতি পাই নাই, সুতরাং বহুকাল অবিবাহিতা ছিলাম। তারপর বশিষ্ঠের সঙ্গে পরিচয়। ইহারা কিন্তু পাঁচ বছরের মেয়েকেই অরুন্ধতী দময়ন্তী বলে দাঁড় করাবেন। সবই ঠিক, আর বাঙ্গালী যে তোমার অপমান করেছে, তাতে তোমার রাগ হওয়াও ঠিক নয়। কিন্তু বল্‌ছি এই, শক্ত কথা বলে আর লাভ কি?

বভ্রুবনিতা। হ্যা, উচিত কথা বল্লেই শক্ত বলা হয়? এমন কি গালাগালি আছে যা ওদের খাটে না। যেমন কুকুর তেমনই মুগুর না হলে কখনও হয়? কথায় বলে মূর্খস্য লাঠ্যৌ-ষধি! ভাব দেখি, আমি যদি ওদের কেউ হতাম, আমার কি দুর্দ্দশাই না হতো!

দেবহুতী। যা বলছ তা মিথ্যা নয়। ওদের কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য নাই। আমাকেও কি ওরা এখন ঘরে স্থান দিবে? আমি ছিলাম ক্ষত্রিয়া,মনের মানুষ খুঁজিয়া পৃথিবী আসিয়াছি, শেষে ব্রাহ্মণ বিবাহ করিলাম। মনু এরূপ বিবাহের ব্যবস্থা দিয়াছেন বটে, এরা কিন্তু তা কি আর মানে। খৃষ্টান রাজার আইন ছাড়া এ বিবাহ আর এখন সিদ্ধ নয়!

জাম্ববতী। আমার তো কথাই নাই! এঁরা এখন বিদ্বান্ হয়েছেন, বল্‌বেন যে ওরূপ অন্ত-র্জ্জাতীয় বিবাহ (International) জীব-বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ। এঁরা কৃষ্ণের চাইতেও পণ্ডিত। যাক ওরা গোল্লায়, আমার কি!

উলুপী ও চিত্রাঙ্গদা। আমরাও তো ঐ পর্য্যায় ভুক্ত!

উত্তরা। দেখুন না কেন এই মৎস্যদেশেই একদিন মেয়েদের গীতবাদ্য শিক্ষার প্রথা কেমন সুপ্রচলিত ছিল। আমার পিতা আমার সঙ্গীত শিক্ষার জন্য কি না আয়ো-জন করিয়াছিলেন! সঙ্গীত শাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ মানুষ পাইলেই আমার শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করিতেন। মেয়েদের শিক্ষার জন্য এমন চেষ্টা ব্রাহ্মসমাজ ছাড়া এখন আর কেউ করে না। শিক্ষার ব্যবস্থা তো দূরের কথা, শুনা যায়, না খেতে দিয়ে শুকিয়ে

রাখে পাছে দেখ্‌তে শিগ্‌গির বড় হয়ে উঠে! বিয়ে দেওয়া কষ্টকর কি না? মেয়ে জন্মটা একটা মস্ত দুর্ভাগ্যের ব্যাপার করে তুলেছে এখন এমন অধঃপতন হয়েছে, মেয়েরা গান বাজনা শেখে বলে তাঁদের কত নিন্দা! আমি ঐ নাক শিট্‌কান সহ্য কর্ত্তে পারবো না। আমি কি যে সে এই সকল অশিক্ষিত অর্দ্ধশিক্ষিতদের অবহেলা সহ্য করবো? আমার বংশই কি এক দিন হস্তিনাপুরের সিংহাসন বজায় রাখে নাই? সম্মার্জ্জনী সহযোগে ও দেশটার একটা ব্যবস্থা না হলে আমি আর ওখানে যাচ্ছি না। এই লম্বকর্ণেরা অন্য কোন উপদেশ শুনিবে না। এমন নির্ব্বোধ যে আপনার জনকেই চিনে না। বোকা কি গাছে ফলে? সঙ্গীত কলাটাকেই সমাজ জীবনের বাইরে ফেলে দিয়েছিল।

দেবযানি। আমার কথা উঠ্‌তেই পারে না। আমি বঙ্গদেশে গেলে প্রজাপতির শিরঃপীড়া উপস্থিত হবে—আমার বিবাহ ঠিক কর্ত্তে তিনি হাঁপে পাণি পাবেন না। ধর, ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মালাম—কুমারী থাকিবার অধিকার যখন চলিয়া গিয়াছে বিবাহ তো করতেই হবে, পণের দায়ে বাপ মায়ের ভিটা মাটি উচ্ছন্ন যাক্‌, তাতে কি? এ দিকে কিন্তু আমার অসবর্ণ বিবাহটা মনুর মতেও অসিদ্ধ। বিবাহটা সিদ্ধ করিতে হইলে ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় লইতে হয়, কেন না, ওরা ভুপেন বোসের বিলটা পাশ করিতে দিলে না।

ইন্দুমতী। সে কথা কেমন করে ভুলি! ও দেশে কি আর এখন প্রেমের সে আদর আছে? আমি মরিলাম, অজ আমার সঙ্গে সঙ্গে মরিলেন। মানুষ এখন এমনই নির্ম্মম কঠিন-হৃদয় হইয়াছে, যে পত্নীর জলন্ত চিতার সম্মুখে বসিয়াই পুনরায় বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করে, নতুবা নাকি শিগ্‌গির শিগগির বিবাহ হয় না; এ কথা শুনিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে।

প্রেমোদ্বরা। এ কথা শুনিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে। অর্দ্ধেক আয়ু দিয়া স্ত্রীকে বাঁচাইয়া তুলিবে, এমন স্বামী সেখানে কজন আছে? আহাম্মকেরা বলবে লোকটা স্ত্রৈণ, ঘোর কলিকাল!

অন্ধমুনি-পত্নী। আমি শূদ্রা, আমার স্বামী বৈশ্য, কিন্তু আমার পুত্রকে হত্যা করিয়া দশরথের ব্রহ্মহত্যা হইল, আমি তো বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের কল্পনার মধ্যেই আসি না। প্রাচীন অসবর্ণ বিবাহের সুপ্রথা তো কেবল ব্রহ্মসমাজকে আশ্রয় করিয়া বাঁচিয়া আছে, তারপর সিন্ধুর ব্রাহ্মণত্বের দাবী, সে কথা উপস্থিত করলে কি আমার রক্ষা থাক্‌বে? প্রাণের মায়া, ইজ্জতের মায়া থাক্‌তে আমি বঙ্গদেশে যেতে পারি না।

(সিন্ধুর উক্তি দশরথের প্রতি -"শূদ্রায়ামস্মি বৈশ্যেন শৃণু জালপদাধিপ"—
রামায়ণ।

স্নেহলতা। আবার! একবারই পুড়ে ছাই হলাম, আর নয়। উঁহাদের সব ভণ্ডামি, এত চীৎকার, এত লম্ফ ঝম্ফ—পণ উঠ্‌ল কি? যে দু একটা বড় লোকের বিবাহে দর দস্তুরের প্রয়োজন নাই, দরদস্তুর না করলেই লাভ বেশী, সেই বিবাহের কথা নিয়ে ওরা ঢাকঢোল বাজায়। মরুক, আমারই মত সব পুড়ে খাক হোক। আসুর বিবাহ প্রবল হয়ে দেশটাকে অসুরের দেশ করে তুলেছে, যেন কন্যার বাপের বুকের রক্ত শুষে নেবার জন্যে ছো মেরে বসে আছে!

পঞ্চকন্যা। (অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা ও মন্দোদরী—নেপথ্যে) আমাদের কথা তো উঠ্‌তেই পারে না। সকালে উঠিয়া যে উহারা আমাদের নাম করে, তাহা বিদ্রূপ নহে কি? যাহাদের নাম লইয়া মহাপাতক হইতে উদ্ধার পাইতে চায়, তাহাদের একজন যদি কন্যা বা বধূরূপে কোন পরিবারে আশ্রয় লয়, তবে সে পতিত হইবে। এরূপ বিড়ম্বনায় মানুষ কখনও পড়ে নাই। সব কেবলই ভণ্ডামি।

সকলে। দেশটা এমনই বেথাপ্পা হয়ে গেছে, প্রাচীন কিছুরই সঙ্গে আর খাপ খায় না। উহারা আমাদেরই বংশধর, কিন্তু এমনই অজ্ঞ যে পূর্ব্বপুরুষকে চিনিতে পারে না, পরিচয় দিলে দূর করিয়া দেয়, অথচ আমাদের রক্ত উহাদের গায়ে আছে।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

সমাজ ও ধর্ম্ম।

একবার একটী খ্রীষ্টীয় মহিলা আমাদের বাড়ীতে আসেন। তিনি কেমন করিয়া খ্রীষ্টান্ হইলেন, সেই কথাটা বলিতে গিয়া দুই একটা এমন কথা বলিলেন, যাহা সমাজ-নেতৃগণ ও ধর্ম্মনেতৃগণ উভয়েরই একটু ভাবিয়া দেখা উচিত। ঐ মহিলাটী হিন্দুর মেয়ে—ব্রাহ্মণের মেয়ে—অবস্থাপন্ন গৃহে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। জেনানা মিশনের মিশনরী মহিলারা ঐ বাড়ীতে আসিতেন ও মেয়েদের শিক্ষা দিতেন। লেখাপড়া শিক্ষার সঙ্গে ধর্ম্মেরও তাঁরা শিক্ষা দিতেন। এই কার্য্যটা উচিত কি অনুচিত, এ স্থলে তাহা বিচার্য্য নহে। তাঁহাদের শিক্ষায় ঐ মেয়েটীর আর হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাস রহিল না—তিনি খ্রীষ্টে বিশ্বাসী হইলেন। এ সব কথা বেশী দিন ঢাকা থাকে না। বাড়ীর লোকেরা টের পাইলেন। ঘরের বৌ, দেবতার প্রসাদ খাবে না, শুনে শর্ম্মারা অগ্নিশর্ম্মা হইলেন। কিন্তু ঘরের বৌকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দেওয়াও সহজ নহে—চারিদিকে দুর্নাম রটিবার ভয়। কাজেই তাঁরা গৃহ মধ্যেই তাঁর প্রতি নানা প্রকার উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন। মেয়েটী চুপ করিয়া সব সহ্য করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার ধর্ম্ম গুর্ব্বী মিশনরী মহিলারা তাঁহাকে উপদেশ দিতে লাগিলেন, "তুমি এই গৃহে এত লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছ কেন? আমাদের সঙ্গে এস, আমরা তোমাকে আশ্রয় দিব।" তিনি বলিলেন "আমি আমার পতি পুত্র কন্যাদের ছেড়ে আপনাদের সঙ্গে যাব না। আপনারা বলেন, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ক্রুশে হত হইয়াছেন এবং প্রত্যেক বিশ্বাসীর ক্রুশ বহন করা কর্ত্তব্য। আমি এই গৃহে যে সকল বকুনী সহ্য করি, তাই আমার ক্রুশ। এই ক্রুশ বহনেই আমি আনন্দিতা।" অতএব তখন আর তাঁহার গৃহ পরিত্যাগ হইল না—প্রকাশ্যে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষাও হইল না। সেই হিন্দুগৃহে সে ললনা নীরবে আপনার ধর্ম্ম বিশ্বাস লইয়া দিনপাত করিতে লাগিলেন। সময়ে স্বামীও তাঁহার দেহত্যাগ করিলেন। তিনি হিন্দু বিধবা বেশেই নিজ বিশ্বাসানুসারে ধর্ম্ম-সাধন করিতে লাগিলেন। ছেলে মেয়েরা বড় হইতে লাগিল, কিন্তু মা হিন্দুগৃহেই তাহাদিগকে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে লাগিলেন। বড় মেয়েদের বিবাহ হইয়া গেল, কিন্তু তারা মায়ের বিশ্বাস লইয়া শ্বশুর বাড়ীতে গেল। এইরূপে অনেক বৎসর কাটিয়া গেল—আরও অনেক ঘটনা হইল। তারপর আর হিন্দু সমাজে তাহাদের টেকা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িল। তখন তাঁহারা বাপ্তিস্ম সংস্কার গ্রহণ পূর্ব্বক সকলেই খ্রীষ্টান হইলেন—সর্ব্বশেষে বিধবাও বাপ্তিস্ম গ্রহণ করিলেন। বিবাহিতা মেয়েদের মধ্যে এক মেয়ে বিধবা হইলেন, তিনিও বাপ্তাইজিত হইলেন। আর এক মেয়ে স্বামী সহ খ্রীষ্টান হইলেন। ইত্যাদি, ইত্যাদি। সব কথা লিখিবার আবশ্যকতা নাই।

এইরূপ খ্রীষ্টীয় সমাজ ও ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে অনেক ঘটনা পাওয়া যাইতে পারে। ধর্ম্ম যতই রক্ষণশীল হউক না কেন, কোন ধর্ম্মই মানুষের মনকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না। এক ধর্ম্ম অপর ধর্ম্মাপেক্ষা ভাল হউক মন্দ হউক, কতকগুলি লোক এক ধর্ম্ম ছাড়িয়া অপর ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেই—অথবা নিজ ধর্ম্মের

কতকটা ও অপর ধর্ম্মের কতকটা মিশাইয়া একটা মিশ্রধর্ম্ম বানাইয়া লইবেই। এই সকল লোকের প্রতি সর্ব্ব দেশে ও সর্ব্ব যুগে উৎপীড়ন হইয়াছে। পাশ্চাত্য জগতে আজ কাল যে ধর্ম্ম-নৈতিক স্বাধীনতা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা যে কত রক্তপাতের ফল, তাহা ইতিহাসের পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। মানুষ "স্বাধীনতা" "স্বাধীনতা" বলিয়া চীৎকার করে, কিন্তু সহজে এক মানুষ অপর মানুষকে বিবেকের স্বাধীনতা দেয় না। ইহাতে ক্ষতি কাহার হয়?

মানুষ সামাজিক জীব, তাহাকে কোন না কোন সমাজভুক্ত হইয়া থাকিতেই হইবে। যখন ভারতের লোক খ্রীষ্টান্ হইতে লাগিল, তখন মিশনরীরা তাহাদের লইয়া একটা ভারতীয় খ্রীষ্টীয় সমাজ গঠন করিলেন। হিন্দুরা খ্রীষ্টানদের সমাজচ্যুত করিলেন, আবার খ্রীষ্টানরাও আপনাদের নব বিশ্বাস ও নব রীতি নীতি লইয়া হিন্দু সমাজে থাকা সম্ভবপর দেখিলেন না। কাজেই সেকালে একটা পৃথক খ্রীষ্টীয় সমাজ গঠন একটা অবশ্য-ম্ভাবী বিষয় ছিল। সে যুগের মিশনরীরা, এদেশের ধর্ম্মতত্ত্ব ও সমাজনীতির মধ্যে যে কোন ভাল জিনিস্ থাকিতে পারে, তাহা জানিতেন না। কাজেই খ্রীষ্টীয় সমাজটাকে তাঁহারা আপনাদেরই ছাঁচে গড়িতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ভারতীয় মনটা ভারতীয় উপাদানেই গঠিত। তাই এখন আবার re-action বা প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। বিশেষতঃ এই nationalism বা জাতীয়ত্বের যুগে চিন্তাশীল খ্রীষ্টানদের মনে বিজাতীয়ত্বের প্রতি বড়ই বিতৃষ্ণা উপস্থিত হইতেছে। এমন সময় ছিল, যখন সাহেব পুরোহিত পাইলে আর সম্ভ্রান্ত দেশীয় খ্রীষ্টানেরা দেশীয় পুরোহিত দ্বারা বিবাহাদি সামাজিক অনুষ্ঠান করাইতেন না। কিন্তু এখন জোয়ার উলটা বহিতে আরম্ভ হইয়াছে। আমি এমন ঘটনা জানি, যাহাতে স্থানীয় সাহেব পুরোহিতকে ছাড়িয়া অন্য স্থান হইতে দেশীয় পুরোহিত ডাকিয়া বিবাহ ব্যাপার নিষ্পন্ন হইয়াছে। এইরূপে খ্রীষ্টীয় সমাজে যে সাহেবীত্বে অরুচি ধরিতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। খ্রীষ্টান হওয়ার অর্থ যে সাহেব হওয়া নহে, এ কথাটা এখন খ্রীষ্টানেরা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু কথাটা সম্যকরূপে বুঝিতে এখনও তাঁহাদের অনেক দিন লাগিবে।

আবার খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মটাও যে একটা প্রাচ্য ধর্ম্ম, তাহাও চিন্তাশীল খ্রীষ্টানেরা কতক কতক অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, পাশ্চাত্য জগৎ খ্রীষ্ট ও খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাই যে অক্ষরে অক্ষরে মানিয়া চলিতে হইবে, তদ্বিষয়েও দেশীয় খ্রীষ্টানদের মধ্যে অনেকের সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। ভারতীয় ভাবে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের একটা ব্যাখ্যা হইতে পারে কি না, অনেকে তাহাও ভাবিতেছেন। সে দিন বাঙ্গালোর নগরে এই বিষয় লইয়া একটা সভা হইয়া গিয়াছে। শুনিতে পাই কোন কোন বক্তা খ্রীষ্টানগণকে চিত্ত সমাধানার্থ প্রাণায়ামাদি যোগ সাধনেরও উপদেশ দিয়াছিলেন।

যখন মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ধর্ম্ম সংস্কারে প্রবৃত্ত হন, তখন ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্ম-সমাজ নামে একটা নূতন ধর্ম্ম ও নূতন সমাজ স্থাপন করা তাঁহার অভিপ্রায় ছিল বলিয়া বোধ হয় না। হিন্দুদের উৎপীড়নে বা অনুদারতায় ব্রাহ্মদের একটা পৃথক দল হইতে হইয়াছে। খৃষ্টানের ছেলেরা যেমন বংশগত

ভাবে খ্রীষ্টান, ব্রাহ্মের ছেলেরাও তেমনি বংশগত ভাবে ব্রাহ্ম হইয়া পড়িতেছেন। আর দুই তিন পুরুষ পরে ইহাঁদের নীতি ও ধর্ম্মজীবন কিরূপ থাকিবে, তাহা ভবিষ্যৎ জানে।

এখন দেখুন, হিন্দুরা উৎপীড়ন করিয়া বা অনুদারতা দেখাইয়া একটা প্রকাণ্ড খ্রীষ্টীয় সমাজ গঠন করিয়াছে—ঐ সমাজের প্রত্যেকেই যে ধর্ম্মতঃ খ্রীষ্টান তাহা নহে। ঐরূপ হিন্দুদেরই উৎপীড়ন বা অনুদারতায় ব্রাহ্মসমাজ নামে একটা ক্ষুদ্র সমাজ জন্মগ্রহণ করিয়াছে—ঐ সমাজের প্রত্যেকেই যে ধর্ম্মতঃ ব্রাহ্ম থাকিবেন, তাহা এখনও বলিবার সময় আসে নাই। এখন, এই খ্রীষ্টান ও ব্রাহ্ম উভয় সম্প্রদায়ের লোক যদি কোন রকমে হিন্দু সমাজেই থাকিয়া যাইতেন, তাহাতে কি হিন্দুসমাজের অকল্যাণ হইত ?

খ্রীষ্টান মিশনরীদের বিরুদ্ধে (ও ব্রাহ্ম প্রচারকদেরও বিরুদ্ধে) একটা অভিযোগ আছে যে, তাঁহারা পরের ঘর ভাঙ্গেন। পূর্ব্বোক্ত মেয়েটী যদিও গৃহে থাকিতে শত শত লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা ভোগ করিলেন, তবু তাঁহাকে স-সন্তান ঘর ভাঙ্গিয়া বাহির হইতেই হইল। মানুষ কি করে ? তাহাকে কোন না কোন সমাজের আশ্রয়ে তো থাকিতেই হইবে। সে আশ্রয় স্থলটা সর্ব্বাংশে মনের মত হউক আর না হউক, পূর্ব্ব স্থান অপেক্ষা অনেকটা নিরুপদ্রব, ইহাই যথেষ্ট। যদি হিন্দু সমাজ মানুষকে বিবেকের স্বাধীনতা দেয়, তাহা হইলে মিশনরী ও প্রচারকদের বিরুদ্ধে ঘর ভাঙ্গার অভিযোগ উত্থাপন করিবার আবশ্যকতাই হইবে না। হিন্দু সমাজ অটুট ও অক্ষুণ্ণ থাকিবে। ছেলেবেলায় হেমচন্দ্রের কবিতায় পড়িয়াছিলাম—

চীন, ব্রহ্মদেশ, অসভ্য জাপান,
তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান।

কিন্তু হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর নব সংস্করণে এখন—

চীন, ব্রহ্মদেশ, সুসভ্য জাপান,
তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান।

"অসভ্য" শব্দটাকে "সুসভ্য" করায় কবিতার ওজস্বিতা একেবারেই কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু কবির ওজস্বিতা কমুক বা বাড়ুক, জাপানকে এযুগে অসভ্য বলিবার অধিকার কাহারও নাই। এই "অসভ্য জাপান" কিরূপে "সুসভ্য" হইল, তাহার ইতিহাসটা অনেক দিনের নহে। এই ইতিহাসে আমাদের শিখিবার অনেক কথা আছে। কিন্তু তাহার মধ্য হইতে দুইটী কথার দিকে আপনাদের একটু মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই।

(১) জাপানীদের মধ্যে আমাদের দেশের ন্যায় জটিল জাতিভেদ না থাকিলেও যে এক প্রকার ভয়ঙ্কর শ্রেণী-বিভাগ ছিল, তাহা আপনারা জানেন। এই সকল শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর আদান প্রদান ও আহার বিহার নিষিদ্ধ ছিল। জাপানীরা যখন দেখিল, এই শ্রেণীবিভাগ লইয়া তাহাদের জাতীয় উন্নতি ও সভ্যজাতিদের সমকক্ষতা লাভ অসম্ভব, তখন তাহারা একপ্রাণ হইয়া এই শ্রেণী-বিভাগকে সমূলে উৎপাটন পূর্ব্বক চিরতরে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিল।

(২) অর্দ্ধ শতাব্দীর কিছু পূর্ব্বে জাপানে কেহ খ্রীষ্টান হইলে তাহার প্রাণ দণ্ডের আদেশ ছিল। আজ জাপানে ধর্ম্ম বিষয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদত্ত হইয়াছে। অন্য ধর্ম্ম অবলম্বনে মানুষ সমাজচ্যুত হয় না। একারণ জাপানে একই পরিবারে একজন বৌদ্ধ,

একজন সিণ্টো, একজন খ্রীষ্টান ও একজন অন্ত কোন ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও একত্র মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে পারে। চাই মন্দিরে যাও, চাই মসজিদে যাও, চাই গির্জ্জায় যাও, তোমার ইচ্ছাধীন। আহার বিহার, আদান প্রদানে কোন প্রকার বাধা নাই। সমগ্র জাপানী একই সমাজে আবদ্ধ থাকায় জাপানের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইয়াছে।

চীন দেশেও এখন এই ধর্ম্ম নৈতিক স্বাধীনতা প্রদত্ত হইয়াছে। অখ্রীষ্টান চীনী ও খ্রীষ্টান চীনী মিলে মিশে দেশটাকে আগে বাড়াবার চেষ্টায় আছে।

ভারতে এযুগে কি আমরাও এইরূপ একটা সামাজিক সংহতি স্থাপন করিতে পারি না? জাতিভেদটা তুলিয়া দিলে ও বিবাহের বৃত্তটাকে একটু প্রসারিত করিলে আমরাও এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারি। বিভাগ অকল্যাণকর। জাতিভেদ হিন্দুজাতিকে শত খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছে—হিন্দুজাতিকে পরের দাস ও পরের গোলাম বানাইয়াছে। যতদিন জাতিভেদ থাকিবে, ততদিন হোমরুলই বল, আর স্বরাজই বল, কিছুতেই কিছু হইবে না, আমরা পরের জুতা বহিব ও পর পদতলে বিদলিত হইব। যাহা পাপ, তাহা পাপ। আশীর্ব্বাদ পুণ্যময় ঈশ্বরের হাতে। এই পাপের কালি বুকে লইয়া কিরূপে আমরা স্বাধীনতা, সুখ ও সমৃদ্ধি পাইতে পারি?

একে জাতিভেদে সমাজ উচ্ছন্নে গিয়াছে, তার পর তোমরা ধর্ম্মের নামে মানুষকে সমাজচ্যুত কর। যে লোকটা মদ খায়, বেশ্যা গমন করে, পরস্বাপহরণ করে, তাকে তোমরা সমাজচ্যুত করিতে পার না—সমাজ সে ক্ষেত্রে paralized বা পক্ষ ঘোগাক্রান্ত। কিন্তু মানুষ পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে তাহাকে সমাজচ্যুত কর। বারবণিতারা পর্য্যন্ত "বৈষ্ণবী' নামে সমাজ বক্ষে বিচরণ করিতেছে! সেন্সাসের খাতায় এই "বৈষ্ণবীরা" হিন্দু বলিয়া উক্ত হয় কি না, তাহা আমি জানি না। কিন্তু অনেক খ্রীষ্টানকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও "অহিন্দু" নামে অভিহিত হইতে হয়। হিন্দুত্ব কি শুধু জাতিভেদ মানায় ও ঠাকুর পূজায় পর্য্যবসিত? হিন্দুত্বের কি আর কোন উদার ও দৃঢ় ভিত্তি নাই? এযুগে সেই উদার ও দৃঢ় ভিত্তিটা কেন খুঁজিয়া বাহির কর না? সকলকে ধর্ম্মনৈতিক স্বাধীনতা দাও। এ সময় পৃথক্ পৃথক্ থাকিবার সময় নয়? পার্থক্যে মৃত্যু, ঐক্যে জীবন। ঐক্যে বৈচিত্র্য থাকিবে। কিন্তু বৈচিত্র্যে একত্ব সাধনই দেশ ও সমাজের প্রাণ। খ্রীষ্টান্ ও ব্রাহ্মেরা সামাজিক ভাবে সাধারণ হিন্দুগণ অপেক্ষা অনেকটা সুখ ও স্বচ্ছন্দে আছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু এসময় সুখ ও স্বচ্ছন্দে থাকিবার সময় নয়। দেশের এ দুর্দ্দিনে স্বার্থনাশ ও সমবেত শক্তির দরকার। স্বার্থনাশের অর্থ অবশ্য বিবেক নাশ নহে। প্রত্যেকের বিবেক বজায় থাকিবে, অথচ আমরা সব মিলে মিশে একই সমাজ, একই জাতি হইব। তাহা কি অসম্ভব? তাহা যদি অসম্ভব হয়, তবে এই মিছা মিছি "ভারত সংস্কার" "ভারত সংস্কার" বলিয়া চেঁচামেচির প্রয়োজন কি? এস, এক অপরের গলা কাটি ও ভারত সাগরের জলে ডুবিয়া মরি! "বৈচিত্র্যে একত্ব সাধন" "unity in diversity" ইহাই এ যুগে ভারতের জীবন মন্ত্র। বিবেকের স্বাধীনতা দাও, যার ইচ্ছা মন্দিরে যাক, যার ইচ্ছা মসজিদে যাক, যার ইচ্ছা গির্জ্জায় যাক। সমাজ

টাকে এক রাখ—সমগ্র ভারতকে এক জাতি বানাও। ধর্ম্ম নানা হউক, কিন্তু সমাজ ও জাতি একই হউক। অনর্থক ধর্ম্মের নামে ভাল মানুষকে সমাজচ্যুত করিয়া তার, আপনার ও দেশটার কেন সর্ব্বনাশ করিতেছ?

শ্রীবিনোদবিহারী রায়।

প্রাচীন ভারতে জাতি বিভাগের উৎপত্তি ও উহার প্রসার।

(বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, মীরাট শাখায় পঠিত।)

পৃথিবীর যে কোনও দেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তদ্দেশবাসীদিগের মধ্যে জাতিবিভাগ প্রথা ওতঃপ্রোতভাবে বিরাজমান থাকিলেও তাঁহারা এক ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া, এক জাতি বলিয়া পরিচয় দেন। কিন্তু ভারতবর্ষ তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিপরীত ভাবাপন্ন। প্রাচীন ভারতের অধিবাসিগণ "আর্য্য" নামের বিষয়ীভূত হইলেও তাহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রধানতঃ এই চারিবর্ণে বিভক্ত ছিলেন—তাহা হইতে আবার অসংখ্য শাখা উপশাখা উৎপন্ন হইয়া ভারতবর্ষের বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ শরীর পুষ্ট করিয়াছে। বিভিন্ন ধর্ম্ম ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন অভিঘাতে ভারতীয় হিন্দু সমাজ শরীর এখন জীর্ণ শীর্ণ—কিন্তু জাতিভেদ প্রথা এমনি ভাবে বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের অস্থি মজ্জায়, শিরায় শিরায়, অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে যে, তাহা প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা সমাজের নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ফলে আপামর জনসাধারণের এমনই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, এই জাতিবিভাগ প্রথা প্রকৃতিগত। বাস্তবিক এই জাতিবিভাগ প্রথার উৎপত্তির নিদান কি, ও কি ভাবেই ইহা হিন্দুসমাজে প্রসারলাভ করিয়াছে, আজ আমরা তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। বায়ুপুরাণ বলিতেছেন :—

"নির্ব্বিশেষাঃ কৃতে সর্ব্বা রূপায়ুশীল
চেষ্টিতৈঃ।
অবুদ্ধি পূর্ব্বকং বৃত্তিঃ প্রজানাং জায়তে
স্বয়ম্‌। ৫৯
অপ্রবৃত্তিঃ কৃত যুগে কর্ম্মণোঃ
শুভ-পাপয়োঃ।
বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাশ্চ ন তদাসন্‌
ন সঙ্করঃ। ৬০। ৮অ

অর্থাৎ সত্যযুগে প্রজাগণের মধ্যে রূপ, আয়ু, শীল ও চেষ্টাতে কোন প্রভেদ ছিল না। কেহ বুদ্ধির সাহায্যে কার্য্য করিতে পারিত না। উক্ত যুগে পাপ পুণ্য বলিয়া কোন ভেদ ছিল না। বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাও ছিল না। সঙ্কর কাহাকে বলে তাহাও কেহ জানিত না। মহাভারত বলিতেছেন:—

"এক বর্ণমিদং বিশ্বমাসীৎ যুধিষ্ঠির।
কর্ম্মক্রিয়া বিশেষেণ চাতুর্ব্বর্ণ্যং প্রতিষ্ঠিতম্‌
ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং
ব্রহ্মমিদং জগৎ
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মণা বর্ণতাং গতম্‌।
ঋগ্বেদেও আমরা দেখিতে পাই—
"ব্রহ্ম জজ্ঞান প্রথমং"

"প্রথমে ব্রাহ্মণ। প্রাদুর্ভূত হয়েন"। ইহারই অনুবাদচ্ছলে বৃহদারণ্যক উপনিষৎ বলিতেছেন—

ব্রহ্ম বৈ ইদমগ্রে আসীৎ একমেব
তদেকং সৎ ন ব্যভবৎ। ২৩৩ পৃঃ।

পূর্ব্বে একমাত্র ব্রহ্ম বা ব্রাহ্মণ জাতি ছিল, তাহা সমাজের পক্ষে পর্য্যাপ্ত হইল না, তাই "তৎ শ্রেয়রূপ মত্যসৃজত ক্ষত্রং" তৎপর সামাজিকেরা সেই ব্রাহ্মণ হইতে সমাজের মঙ্গলকর ক্ষত্রিয় জাতির সৃষ্টি করিলেন, তাই উক্ত হইয়াছে—

"সৈষা ক্ষত্রস্য যোনির্য্যৎ ব্রহ্ম"—সেই ব্রহ্ম বা ব্রাহ্মণ জাতিই ক্ষত্রিয় জাতির উৎপত্তি স্থান। কিন্তু উক্ত জাতিদ্বয় দ্বারা সমাজের সকল কার্য্য সুচারুরূপে চলিল না, তাই পরেই উক্ত হইয়াছে, "স নৈব ব্যভবৎ স বিশ মসৃজত"। ২৩৮ পৃঃ।

তাহা হইতে বৈশ্য জাতির সৃষ্টি করা হইল। ইহাতেও সমাজনেতারা দেখিলেন যে, উক্ত জাতিত্রয়ও সমাজের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে।

স নৈব ব্যভবৎ, স শৌদ্রং বর্ণ
মসৃজত। ২০৮ পৃঃ।

যাহা হউক, উপরিউদ্ধৃত শাস্ত্র বচন হইতে ইহাই আমরা জানিতে পারি যে, প্রাচীন আর্য্যগণ সমাজের সুশৃঙ্খলতার জন্য একই বর্ণকে গুণ ও কর্ম্মভেদে শ্রেণী চতুষ্টয়ে বিভক্ত করেন।

"বর্ণানাং প্রবিভাগাশ্চ ত্রেতায়াং সংপ্রকীর্ত্তিতাঃ।" ৮০৫৭ অ; বায়ুপুরাণ।

এই জন্যই গীতাকার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উক্তিচ্ছলে বলিতেছেন—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং * গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ"

গুণই বর্ণ বা জাতির নিয়ামক,তাই আমরা মন্বাদি সংহিতায় ও অন্যান্য পুরাণাদিতে উচ্চ বর্ণকে হীনবর্ণে ও হীনবর্ণকে উচ্চবর্ণে উন্নীত হইতে দেখিতে পাই। আমাদের এই উক্তির সমর্থনের জন্য আমরা কতিপয় প্রমাণ অধ্যাহার করিব।

মহাত্মা মনু বলিতেছেন, "শূদ্রো ব্রাহ্মণতা মেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্।"

উক্তঞ্চ শ্রীমতা পরাশরেণ—

"শূদ্রোহপি শীল সম্পন্নো গুণবান
ব্রাহ্মণো ভবেৎ।
ব্রাহ্মণোপি ক্রিয়াহীনঃ শূদ্রাৎ প্রত্যবরো
ভবেৎ॥"

শূদ্র শীল সম্পন্ন হইলে গুণবান ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকেন। আর যদি ব্রাহ্মণও ক্রিয়াহীন হয়েন তবে তিনিও শূদ্র হইতে অপকর্ষ ভজনা করেন।

বায়ুপুরাণে বিবৃত রহিয়াছে—

পুত্রো গৃৎসমদস্যাপি শুনকো যস্য শৌনকঃ
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈব চ
এতস্য বংশে সম্ভূতা বিচিত্রৈঃ কর্ম্মভি
র্দ্বিজাঃ॥ ৪—৩০ অ

গৃৎসমদের পুত্র শুনক। শুনকের পুত্র শৌনক, সেই শৌনকের চারি পুত্র কর্ম্ম ও গুণগত পার্থক্য বশতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণ চতুষ্টয় ভজনা করেন।

হরিবংশও বলিতেছেন—

—এতে হ্যঙ্গিরসঃ পুত্রাজাতা বংশে২থ ভার্গবে
ব্রাহ্মণা ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্রাশ্চ
ভরতর্ষভঃ।৪০।৩২ অঃ

ইহারা বীজী অঙ্গিরসের সন্তান। তাঁহারা ভৃগুবংশ বলিয়া প্রখ্যাত। এই বংশের লোকেরা কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ বৈশ্য ও কেহ শূদ্র হইয়াছিলেন।

* 'ময়া সৃষ্টং'—'ঈশ্বরেণ সৃষ্টং' এই ব্যাখ্যাও পৌরাণিক প্রবাদ সম্মুখ।

মহাভারতে লিখিত রহিয়াছে—

"ততো ব্রাহ্মণতাং জাতো বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ।
ক্ষত্রিয়ঃ সোহপ্যথ তথা ব্রহ্মবংশকারকঃ॥

বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়াও কেবল তপোবলে ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়াছিলেন। কেবল তাহাও নহে, তাঁহা হইতে কতিপয় ব্রাহ্মণবংশেরও সমুৎপত্তি হয়।

হরিবংশের অন্যত্র বিবৃত রহিয়াছে—

দিবোদাসস্য দায়াদো ব্রহ্মর্ষি মিত্রয়ু নৃপঃ
মৈত্রায়ণস্ততঃ সোমো মৈত্রেয়াস্ততঃ স্মৃতা
এতে বৈ সংশ্রিতাং পক্ষং ক্ষত্রোপেতাস্তে ভার্গবঃ॥

অর্থাৎ মহারাজ দিবোদাস ক্ষত্রিয় ছিলেন। তাঁহার জ্ঞাতি মিত্রয়ু অতীব ব্রহ্মপরায়ণ ছিলেন। তাই তিনি ব্রাহ্মণ্য লাভ করেন। উক্ত ব্রহ্মর্ষি মিত্রয়ুর পুত্র সোম এবং উক্ত সোমের বংশধরেরা "মৈত্রেয় ব্রাহ্মণ" নামে পরিচিত।

ভবিষ্যপুরাণ বলিতেছেন—

জাতো ব্যাসস্তু কৈবর্ত্ত্যাঃ শ্বপাকাশ্চ পরাশরঃ।
শুক্যাঃ শুকঃ কনাদাখ্যঃ তথোলুক্যাঃ সুতোঽভবৎ॥ ২২
মৃগীজা ঋষ্য শৃঙ্গোপি বশিষ্ঠো গণিকাত্মজঃ।
মন্দপালা মুনিশ্রেষ্ঠো নাবিকাপত্য মুচ্যতে॥ ২৩
মাণ্ডব্যো মুনিরাজস্তু মণ্ডুকী গর্ভ সম্ভূতঃ।
বহবোঽন্যোপি বিপ্রত্বঃ প্রাপ্তা যে শূদ্রবৎ দ্বিজা॥ ২৪

—৪২ অ, ব্রাহ্মপর্ব্ব ভবিষ্যপুরাণ।

অর্থাৎ কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস, কৈবর্ত্ত-কন্যা, পরাশর শ্বপাক কন্যা, শুকদেব শুকী, মহর্ষি কনাদ উলকী, মহাতপা ঋষ্যশৃঙ্গ মৃগী, জগদ্বন্দ্য বশিষ্ঠ স্বর্গ বেশ্যা উর্ব্বশী, মুনিশ্রেষ্ঠ মন্দপাক নাবিক কন্যা ও মুনিরাজ মাণ্ডব্য মণ্ডুকী নাম্নী নারী প্রভৃতির গর্ভ সম্ভূত। আরও অন্যান্য অনেকে শূদ্র হইয়াও গুণগরিমায় ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়াছিলেন। কি গুণগরিমায় ইঁহারা ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়াছিলেন? জগৎ-গুরু ভূদেব ব্রাহ্মণ কে? মহাভারত বলিতেছেন—

জিতেন্দ্রিয়ঃ ধর্ম্মপরঃ স্বাধ্যায় নিরতঃ শুচি।
কাম ক্রোধৌ বশে যস্য তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥

যাহা হউক, বাহুল্য বোধে আমরা অধিক প্রমাণ অবতারণে বিরত হইলাম। ইহা হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, পূর্ব্বকালে জাতি বিভাগ প্রথা জন্মগত ছিল না, পরন্তু গুণগত ও কর্ম্মগত ছিল। কতকটা একালের এনট্রান্স (Entrance) আই, এ (I. A.) বি-এ (B. A.) এম্-এ (M. A.) তর্করত্ন প্রভৃতি উপাধির ন্যায় ছিল। যেমন এম্-এ (M. A.) বি-এ (B. A.) ও তর্করত্ন প্রভৃতির পুত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইয়া ঐরূপ উপাধি লাভে সম্পূর্ণ অসমর্থ, তদ্রূপ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির পুত্রগণ প্রকৃত গুণবান না হইলে প্রাচীনকালে ঐরূপ হইতে পারিতেন না।

অবশ্য প্রশ্ন হইতে পারে যে, কেন জগন্মান্ত বেদেই ত বিশদাক্ষরে বিবৃত রহিয়াছে যে, সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং মনুষ্যগণকে চতুর্দ্ধা বিভক্ত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং বেদাচার্য্য পূজনীয় সায়নাচার্য্যও উক্ত মন্ত্রের এইরূপ ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। হাঁ, পুরুষ সুক্তের দ্বাদশ মন্ত্র বলিয়াছেন—

"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখ মাসীৎ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যৎ বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥"

সায়ণভাষ্য :—অস্য প্রজাপতে ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণত্ব জাতি বিশিষ্টো পুরুষো মুখমাসীৎ মুখাদুৎপন্ন ইত্যর্থঃ। যোহয়ং রাজন্যঃ ক্ষত্রিয়ত্ব জাতি বিশিষ্ট স্ বাহু কৃতঃ বাহুত্বেন নিষ্পা- দিতঃ বাহুভ্যামুৎপাদিতঃ ইত্যর্থঃ। তৎ তদানী মস্য প্রজাপতে যদ্বো উরূঃ তদ্রূপো বৈশ্যঃ সম্পন্ন উরুভ্যামুৎপন্ন ইত্যর্থঃ। তথাস্য পদ্ভ্যাং শূদ্রঃ শূদ্রত্ব জাতিমান্ অজায়ত।

বেদাচার্য্য সায়নাচার্য্যের এ ব্যাখ্যা কতদূর সাধীয়সী তাহা পণ্ডিতগণ বিচার করিবেন, কারণ আমি পণ্ডিতজ্ঞ নহি বা বেদজ্ঞ নহি—তবে আমরা উক্ত ভাষ্যে তৃপ্তি অনুভব করিতে পারিলাম না। কারণ (১) বিবেক ও যুক্তি ইহার সম্পূর্ণ পরিপন্থী (২) বেদ উপনিষৎ যখন সমস্বরেই বলিয়াছেন "ঈশ্বরের কোনও দেহ নাই, সুতরাং মুখাদিও নাই "অস্থন্বন্তং যদানস্থা বিভর্ত্তি।" ঋকবেদ। যাঁহার নিজের অস্থি নাই সেই অস্থিহীন ভগবান অস্থিবিশিষ্ট মনুষ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন।

তথা হি উপনিষৎ :—

"ওঁ সপর্য্যাগাৎ শুক্র মকায় মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।" সেই ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী, নির্ম্মল, কায়রহিত, ব্রণ ও স্নায়ুহীন, শুদ্ধ ও পাপপরিশূন্য, সুতরাং বেদ কি প্রকারে বেদ বিরুদ্ধ কথা বলিবেন? এরূপ স্থলে মহাত্মা সায়নাচার্য্যের ব্যাখ্যা কতদূর যুক্তিযুক্ত (rational) তাহা আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। তবে উক্ত বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যা কালে ঋক্‌বেদের প্রকৃতার্থবাহিনী টীকাকার পূজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীউমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাই সমীচীন ও যুক্তিযুক্ত (rational) এবং সর্ব্ব বিষয়েই সমন্বয় রক্ষিত হইয়াছে এইরূপ বিবেচিত হওয়ায় উহা নতমূর্দ্ধা হইয়া গ্রহণ করিলাম। আপনাদের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে উহা উদ্ধৃত করিতেছি—

"কেহ পুরুষ সূক্তের ১১শ মন্ত্রের প্রতি লক্ষ্য করিলে এই সায়ণ ব্যাখ্যা গরীয়সী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবেন না। ১১শ মন্ত্র বলিতেছেন 'সৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্। মুখং কিমস্য কৌ বাহু কৌ উরূ পাদৌ উচ্যতে॥"

অর্থাৎ—যখন দেবতারা যজ্ঞ করেন তখন তাঁহারা বিরাট পুরুষকে যজ্ঞের পশু কল্পনা করিয়াছিলেন, তাই এই মন্ত্রে ব্রহ্মবাদী ঋষিরা প্রশ্ন করিতেছেন যে, বিরাট পুরুষকে যজ্ঞে খণ্ড খণ্ড করা হইয়াছিল সে কত খণ্ড? এই বিরাট পুরুষের মুখ কি ছিল? বাহু ও উরুদ্বয় কি কি ছিল? এই পদদ্বয়ই বা কি বলিয়া উক্ত হইয়াছিল? * * *

দ্বাদশ মন্ত্রেরও কি প্রত্যেক পদে অপাদানের চিহ্ন রহিয়াছে? কখনও নহে।

প্রশ্ন।

মুখং কিমস্য
কৌ বাহূ
কৌ উরূ
কৌ পাদৌ উচ্যতে

উত্তর।

ব্রাহ্মণঃ অস্য মুখম্ আসীৎ
বাহূ রাজন্য কৃতঃ
উরূ তদস্য যৎ বৈশ্য
পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত

* * * 'পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত' এই অংশের অপাদনকে নিরঙ্কুশ আর্ষ প্রয়োগ বলিয়া মনে করিতে হইবে।

ক্রমশঃ

শ্রীললিতমোহন রায়।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। (শেষ)

(৮০ পৃষ্ঠার পর)

গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে এই সকল স্কুল প্রতিষ্ঠা ও পরিদর্শন জন্য সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষরূপে যে বেতন পান, তার উপর আরও ২০০৲ টাকা বেতন ধার্য্য করিয়া ইনস্পেক্টরের পদে নিযুক্ত করেন। তিনি এখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ও স্কুল সমূহের পরিদর্শক, দুই কাজই করিতে লাগিলেন। তদানীন্তন লেফটেনেণ্ট গভর্ণর সকল বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। যাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য কত জন কত রাজ-পোষাকে সজ্জিত হইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা দ্বারে অপেক্ষা করিয়া থাকিতেন, তাঁর গৃহ, লংক্লথের সামান্য উত্তরীয়, শাদা থান ধুতি ও তালতলার সামান্য চটী-পরিহিত এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের নিকট চির-অবারিত। কত লোক রাজপ্রতিনিধি-দর্শনের জন্য বাহিরে অপেক্ষা করিতেন। আর বিদ্যাসাগর মহাশয় যাইবা মাত্রই তিনিই সর্ব্বপ্রথম আহূত হইতেন। লংক্লথের উত্তরীয় ও চটীর অভ্যন্তরে কত আত্মমর্য্যাদা ও নিঃস্বার্থ মানব-হিতৈষণার জলন্ত বহ্নি জ্বলিতেছিল, তাহার নিকট এক অমানুষিক শক্তির জলন্ত আবির্ভাব উপলব্ধি করিয়া সকলেই মস্তক নত করিবেন। এই সময় শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টরের সঙ্গে তাঁহার মতভেদ হয়। তিনি সাধারণ শিক্ষা বিস্তারের জন্য অজস্র অর্থব্যয় করিতে লাগিলেন। পরে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া অনেক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিলেন, কিন্তু শিক্ষকদিগের বেতন প্রদান করিতে ডিরেক্টর অস্বীকৃত হন। ইহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর পাঁচ শত টাকা বেতনের কার্য্য পরিত্যাগ করেন। লেপটেনেণ্ট-গবর্ণরের আগ্রহাতিশয়, বন্ধুগণের অনুরোধ উপরোধ কিছুতেই অর্থের জন্য চাকুরী গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলেন না। আর একবার তিনি আত্ম সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া দারিদ্র্যকে বরণ করিয়াছিলেন। তাঁর আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া তিনি দেশের সেবার জন্য আবার পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবার যখন দেখিলেন, তিনি যে দেশসেবার অনুরোধে চাকুরী গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই দেশ-সেবা ব্রতেই তিনি বাধা প্রাপ্ত হইলেন, তখন কি তিনি সামান্য অর্থের লোভে কিম্বা শারীরিক পশু জীবনের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য দাস বৃত্তি গ্রহণ করিতে পারেন? বিদ্যা বিতরণ করাই যে ভারতের প্রাচীনতম প্রথা, সে ভারতের প্রধান বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া তিনি কি কখনও বিদ্যা-বিক্রয়ের প্রতি আন্তরিক বিদ্বেষ পোষণ না করিয়া পারেন? তথাপি দেশে সর্ব্বজাতিতে সর্ব্ব শ্রেণীতে স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে শিক্ষা বিস্তার জন্য ও তাঁহার অতি প্রিয় শিক্ষা-মন্দির সংস্কৃত কলেজের উন্নতি সাধন উদ্দেশ্যেই তিনি চাকুরী-জীবনে প্রবেশ করিয়াছিলেন, আর যখন সেই উচ্চ ব্রত সাধনে তিনি বাধা প্রাপ্ত হইলেন, তখন তিনি পাঁচ শত টাকা বেতনের উচ্চপদ লোষ্ট্রের ন্যায় পরিত্যাগ করিলেন। কঠোর তপস্যাই যাঁহার জীবন, দারিদ্র্যের মধ্যে যিনি লালিত পালিত বর্দ্ধিত, তিনি ত জীবন-সংগ্রামে চিরজয়ী। মনুষ্যত্ব যাঁর জীবনের উচ্চ সাধনা, কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায় যাঁর জীবনের একমাত্র অবলম্বন, পরম পিতা পরমেশ্বর যাঁহার জীবনে উচ্চ মহৎ উদ্দেশ্য সাধন জন্য অসীম মানসিক শক্তি,

উজ্জ্বল প্রতিভা, দয়ার কোমল মহৎহৃদয় প্রদান করিয়াছেন, লক্ষ্মী তাঁহাকে বরণ করিয়া লয়। অর্থের অভাব তাঁহাকে সহ্য করিতে হইবে কেন ?

সাহিত্য-সেবা।—কর্ম্মজীবনে থাকিতে থাকিতেই তিনি হিন্দি হইতে বেতাল-পঞ্চবিংশতি, ইংরেজী গ্রন্থ অবলম্বনে বোধোদয়, আখ্যানমঞ্জরী, কবিতাবলী প্রভৃতি বালক-পাঠ্য গ্রন্থ রচনা করেন। অনুবাদে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি অনুবাদে প্রাণ ও প্রাণের গতি সঞ্চারিত করিয়া তাহাকে এত সোজ্জ্বল ও সুন্দর করিয়া তুলিতেন যে, তাঁহার কোন গ্রন্থকে অনুবাদ বলিয়াই মনে হয় না। তাঁহার অনুবাদে এমন একটী ছন্দ ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, তাহা পাঠ করিতে করিতে হৃদয় স্বতঃই সঙ্গীতের মাধুর্য্যে ভরিয়া উঠে। এইজন্য শিশুগণ তাঁহার পুস্তক পাঠ করিয়া শিক্ষা ও আনন্দ, উভয়ই লাভ করে। তাঁহার ভাষা হৃদয়কে স্পন্দিত করে বলিয়া তাহা মানস-পটে এত সহজে মুদ্রিত হইয়া যায়। তিনি ক্রমে অনেক পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করেন। বাঙ্গালা ভাষার অদ্বিতীয় লেখক বলিয়া সর্ব্বত্র তাঁহার খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহার শকুন্তলা ও সীতার বনবাস এখনও বাঙ্গালা ভাষার অপ্রতিদ্বন্দ্বী আদর্শ; এবং আরও অনেক অনেক দিন এই উচ্চস্থান অধিকার করিয়া থাকিবে। বিদ্যারম্ভে বর্ণপরিচয়, তারপর বর্ণপরিচয় ২য় ভাগ, কথামালা, আখ্যানমঞ্জরী, বোধোদয়, চরিতাবলী, এবং পরিশেষে শকুন্তলা ও সীতার বনবাস পাঠ করিয়া কেবল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গ্রন্থপাঠেই এক জন বাঙ্গালা ভাষায় সুপণ্ডিত হইয়া উঠিতে পারেন। এইজন্য বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ, ধনী, দরিদ্র, হাকিম, কৃষক, সকলের মুখেই বিদ্যাসাগরের নাম। বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে গৃহে গৃহে বিদ্যাসাগর মহাশয় গৌরবে মণ্ডিত হইয়া গৃহদেবতারূপে প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার এই গ্রন্থ বিক্রয় হইতে স্রোতের ন্যায় অর্থ আসিতে লাগিল। তিনি দয়াদায়া প্রণোদিত হইয়া শত শত বিপন্নকে নানাপ্রকার বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে, সহস্র সহস্র নিরন্নকে অন্নদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, দুর্ভিক্ষক্লিষ্টকে জীবন দান করিতে এই অর্থ অকাতরে ব্যয় করিতে লাগিলেন।

সাহিত্যে তাঁহার স্থান কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তর অল্প কথায় দেওয়া যায় না। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যকে একটী আকার দান করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাতে প্রাণ সঞ্চারিত করিয়া তাহাকে এক বিশেষ সৌন্দর্য্যে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছেন। সংস্কৃতমূলক বাঙ্গালা গদ্য সমাস-বহুল শব্দ-যোজনায় মন্থরগতি ও বিকলাঙ্গ। তাহার নিজের কোন সহজ গতি-ভঙ্গি, বিশিষ্ট আকার-শ্রী ও ধ্বনি বঙ্গভাষা লাভ করিতে পারে নাই। হৃদয়ই পূর্ণজীবন; বুদ্ধি তাহার একদেশ মাত্র। বাঙ্গালা গদ্য কঠোর চিন্তা প্রকাশেরই ভাষা ছিল। বাঙ্গালা পদ্যই হৃদয়ের ভাষা ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গালা গদ্যকে ভয়, বিস্ময়, শোক, আনন্দ, মাধুর্য্য প্রভৃতি হৃদয়ের ভাব-বৈচিত্র্য-প্রকাশের উপযোগী করিয়াছেন। হৃদয়ের পূর্ণপ্রাণ তানলয় সঙ্গীতে আত্মপ্রকাশ করে; হৃদয় সঞ্চারিত করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাকে জীবন্ত ও স্বচ্ছন্দ গতিশীল, হৃদয়ের পূর্ণপ্রাণের ঝঙ্কারে সঙ্গীতময়, ভাবের উচ্ছ্বাসে তরঙ্গায়িত করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের চিরনবীনতায় সুন্দর সুকোমল সংস্কৃত-

মূলক সমাস-বহুল ভাষাকে তাহার আদি-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বাঙ্গালী হৃদয়ের স্পন্দনে পূর্ণ জীবন্ত মূর্ত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সুমহৎ কীর্ত্তি। তিনি প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ভাষার এই অপূর্ব্ব শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া ভাষা অবলম্বনে বাঙ্গালায় জাতীয় জীবনের সৌধ নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। সমগ্র বাঙ্গালীজাতি তাঁহার নিকট অপরিশোধনীয় কৃতজ্ঞতাঋণে আবদ্ধ। বাঙ্গালী মাত্রই আজ যদি বাঙ্গালা ভাষার জন্য গৌরব অনুভব করেন, সেই গৌরবের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চরণতলে ভক্তির অঞ্জলি প্রদান করিবে। আজ যদি বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্য পৃথিবীর ভাষাসমূহের মহাসভায় উচ্চস্থান লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে, সেই গৌরব কি স্বর্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অমরাত্মা অনুভব করিতেছেন?

দয়া-ব্রত।—দয়া তাঁহার প্রকৃতির সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপাদান, দয়া তাঁর ভূষণ, দয়া তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত। কবিবর নবীনচন্দ্র তাঁহার পলাশী যুদ্ধের উৎসর্গ পত্রে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন,—"তাঁহার দয়ার সাগরের বারিবিন্দু সিঞ্চনে যে হৃদয়-কানন দারিদ্র্যের দাবানল হইতে রক্ষা পাইয়াছিল, সেই হৃদয়-কাননের এই সামান্য কুসুম তাঁহারই চরণে উৎসর্গীকৃত হইল।" কত জীবন-কুসুম, উজ্জ্বল প্রতিভা তাঁহার দয়া না পাইলে অকালে কালকবলে পতিত হইত, বলা যায় না। মধুসূদনের যে উজ্জ্বল কবি-প্রতিভা কাব্য-'মধুচক্র' রচনা করিয়াছে, "গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি," এবং "শ্যামা জন্মদে" বলিয়া বঙ্গ জননীর বন্দনা গান করিয়াছে, তাহা বিকশিত হইবার বহু পূর্ব্বেই মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইত, যদি বিদ্যাসাগর মহাশয় আপনার করুণ হৃদয়ের বেষ্টনে তাহাকে রক্ষা না করিতেন। কোথায় দুঃখিনী পতিহীনা জননী সন্তান বক্ষে লইয়া অনাহারে পথিপার্শ্বে রোদন করিতেছে, আর দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্রে করুণ হৃদয় তাহার ক্রন্দনে আত্মহারা হইয়া বিগলিত ধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে; কোথায় পিতৃমাতৃহীন শিশু নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়া আছে, আর ঈশ্বরচন্দ্র তাহার আশ্রয় স্বরূপ হইয়া তাহার শিক্ষার ও উন্নতির পথ মুক্ত করিয়া দিতেছেন। শীর্ণ-দেহ, কঙ্কাল-মাত্র সার, অনাহার-ক্লিষ্ট, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত, সহস্র সহস্র নর-নারীর মুখে তিনি স্বহস্তে অন্ন তুলিয়া দিতেছেন—সে দৃশ্য স্বর্গের দৃশ্য! ভগবানের করুণা মূর্ত্তিমতী হইয়া যেন অবতীর্ণ; শ্রীবুদ্ধদেবের মৈত্রী করুণা যেন আবার ঈশ্বরচন্দ্র-মূর্ত্তিতে পতিত বঙ্গদেশকে ধন্য করিবার জন্য স্বর্গ হইতে ভূতলে আগমন করিয়াছে। দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান ঈশ্বরচন্দ্রের হৃদয় দয়ার অনন্ত প্রস্রবণ। যখন নিজের আহারের সংস্থান ছিল না, তখনও বালক ঈশ্বরচন্দ্র নিজের বৃত্তির টাকায় নিজে না খাইয়াও সহপাঠীকে খাওয়াইতেন, দরিদ্র ছাত্র কি কলেজের ভৃত্যের গাত্রাবরণ কিনিয়া দিতেন। যখন সামান্য মাত্র অর্থ উপার্জ্জন করিয়া অতি কষ্টে পরিবার প্রতিপালন করিতেন, তখনও কত নিরাশ্রয় ছাত্রকে নিজের বাসায় আশ্রয় ও আহার প্রদান করিয়া তাহাদের শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। আর, যখন উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মফঃস্বলে পরিভ্রমণ করিতেন, তখন তিনি অকাতরে দুইহস্তে অর্থ বিলাইতেন। বঙ্গের সমুদয় দরিদ্র-প্রাণ, দুঃখী-হৃদয় তাঁহাকে "দয়ার সাগর" বলিয়া অভি-

নন্দিত করিয়াছে। পল্লীর কৃষক বালকও গান করিত—"দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর চিরজীবী হও।" তাঁহার ভ্রাতৃবধূ যখন তাঁহার নিকট গহনা চাহিয়াছিলেন, তিনি দীন দরিদ্রকে বিতরণের জন্য চাউলের ভাণ্ডার গৃহে রাখিতেন, তাহার চাবি তাঁহাকে দিয়া বলিলেন—"দানই হস্তের শোভা সম্পাদন করে।"

তাঁহার দয়া অন্ন দান করিয়া তৃপ্ত হইত না। রোগীর সেবায় তিনি জননী সদৃশ। এক সময় বিসূচিকা রোগীর নিকট কেহ যাইতে চাহিত না। নিকট আত্মীয় যাঁরা, তাঁরাও বিসূচিকা রোগীর সেবা করিতে ভয় পাইতেন। দাস দাসীর এই রোগ হইলে, তাহাদের ত কোন সেবা যত্নই হইত না, তাহারা অযত্নেই মৃত্যুমুখে পতিত হইত। এখন ডাক্তারগণ প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, এই রোগ এত সংক্রামক ব্যাধি নয়, নিয়মিত আহার করিলে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিলে, আহারের পূর্ব্বে হস্তপদাদি ভালরূপে প্রক্ষালন করিয়া আহারে বসিলে ও জল প্রভৃতি পানীয় দ্রব্যে রোগের বীজ যাহাতে প্রবেশ না করে, সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিলে এবং তাহা ভালরূপ ফুটাইয়া ব্যবহার করিলে, সমস্তদিন রোগীর পার্শ্বে বসিয়া ও রোগীর সেবা করিলেও রোগে আক্রান্ত হইবার কোন আশঙ্কা করিবার কারণ নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় মৃত্যু-ভয় জয় করিয়াছিলেন। যে রোগীর সেবা যত্ন হইত না, তাহাকে বাড়ী লইয়া আসিয়া আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেবাদ্বারা রোগমুক্ত ও সুস্থ করিয়া গৃহে পাঠাইয়া দিতেন। বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া কেহ রাস্তায় পড়িয়া আছে, তিনি যদি দেখিতে পাইতেন, তাহাকে কোলে লইয়া তিনি বাড়ী লইয়া আসিতেন, এক এক বার তাঁহার সমস্ত শরীর রোগীর উদ্গীর্ণ পদার্থ ও মলে ভাসিয়া যাইত। নিজ হস্তে তাহার মল পরিষ্কার করিতেন, নূতন বস্ত্র ও বিছানায় শোয়াইয়া রাখিতেন। তাহার সহাধ্যায়ী ছাত্র, পরিচিত বন্ধু কি অধ্যাপকদের রোগ হইলে ঈশ্বরচন্দ্রের ন্যায় কে তাঁহাদের অক্লান্ত সেবা করিতেন? যখন দেশে যাইতেন, গ্রামস্থ সকলের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া রোগীর সেবা করিতেন, অভাবগ্রস্তদের অভাব দূর করিতেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের দয়া তাঁহার স্বদেশবাসীর সাময়িক দুঃখ দূর করিয়া তৃপ্ত হইতে পারিল না। অজ্ঞানতা অনেক দুঃখ দারিদ্র্যের জননী। দেশের এই অজ্ঞানতা দূর করিবার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হইলেন। নিজের ব্যয়ে স্বগ্রামে এক উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয়, ও শ্রমজীবীদিগের শিক্ষার জন্য নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। এই সকল বিদ্যালয়ে কোন ছাত্রকে বেতন দিতে হইত না। অনেক গ্রামে তিনি বালক বালিকাদিগের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় সমূহ স্থাপন করিয়াছেন। কলিকাতা মহিলা শিক্ষার জন্য বেথুন কলেজ স্থাপনে তিনি একজন প্রধান উদ্যোগী। তাঁহার মহীয়সী কীর্ত্তি তাঁহার শিক্ষামন্দির—মেট্রোপলিটন কলেজ। গরিব ছাত্রদিগের মধ্যে উচ্চ শিক্ষা বিস্তার করিবার জন্য এই কলেজ তিনি প্রতিষ্টিত করেন। এই উচ্চ সৌধ চিরকাল তাঁহার দয়ার উচ্চ কীর্ত্তিস্তম্ভরূপে দণ্ডায়মান থাকিবে।

যে হৃদয় আতুর প্রাণের ক্রন্দনে আকুল হইয়া উঠিত, সে হৃদয় কি বিধবার দুঃখে, নারীর অমর্য্যাদায় স্থির হইয়া থাকিতে পারে? তিনি পুরুষের বহুদার পরিগ্রহ রূপ সামাজিক কু-প্রথার উচ্ছেদ সাধনে বদ্ধপরিকর হইলেন। তিনি এই প্রথার বিরুদ্ধে সতেজ লেখনীধারণ

পূর্ব্বক ওজস্বী ভাষায় প্রতিবাদ করিয়া সমাজে আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। তাঁহাদের গ্রামে বালবিধবার দুর্দ্দশা দেখিয়া তিনি দরদর ধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন। তাঁহার জননী দেবীর হৃদয়ও অস্থির হইয়া উঠিল; তাঁহার জননীদেবী তাঁহাকে বলিলেন—"ঈশ্বর, শাস্ত্রে কি এই সকল বালবিধবাদের জন্য কোন ব্যবস্থা পাওয়া যায় না?" তাঁহার পিতাও তাঁহাকে বিধবার দুঃখমোচনের জন্য উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। দিনের পর দিন গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া তিনি বিধবা বিবাহের সমর্থনে শাস্ত্রমূলক যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার হৃদয়ের সুকোমল দয়া ভৈরবী মূর্ত্তিধারণ করিয়া সামাজিক সংস্কারের বিরুদ্ধে আগ্নেয়বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। আগ্নেয়-গিরির অগ্নি উদ্গমের ন্যায় অগ্নিময় ভাষায় সকলের নিদ্রিত প্রাণে নূতন উত্তেজনা সঞ্চারিত করিল; দেশের শক্তিশালী লোকদিগের অল্প কয়েকজন মাত্র তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। অধিকাংশ লোকই তাঁহার বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করিল। এমন কি, তাঁহার জীবন পর্য্যন্ত শঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। একদিন গভীর রাত্রিতে তিনি সংস্কৃত কলেজ তাঁহার শাস্ত্রাধ্যয়ন ও গ্রন্থ লেখার কার্য্য সেই দিনের শেষ করিয়া যখন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন তাঁহার বিরোধী-পক্ষ-নিয়োজিত একজন বলিষ্ঠ দৃঢ়কায় দুর্ব্বৃত্ত লোক তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া যষ্টি প্রহারে তাঁহার প্রাণনাশে উদ্যত হয়। তাঁহার বিশ্বস্ত ভৃত্য নিজের লৌহ-কঠিন হস্তে সমুদয় লগুড়প্রহার গ্রহণ করিয়া প্রভুর জীবন রক্ষা করিয়াছিল। যে ভৃত্য আজ তাঁহার জীবন রক্ষা করিয়াছিল, সে এক সময় দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। একদিন যখন বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বীয় গ্রাম বীরসিংহ হইতে কলিকাতা আসিতেছিলেন, তখন তিনি সেই দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। তাঁহার নির্ভীক তেজঃপুঞ্জ দৃষ্টি ও মুখশ্রী, তাঁহার সদাশয়তা ও ক্ষমা, প্রেম ও দয়া এই দস্যুর প্রাণকে বিকলিত করিল, সে তাঁহার পদতলে পড়িয়া চিরদিনের জন্য তাঁহার হইয়া গেল। প্রেম ও ক্ষমার কি অপূর্ব্ব মহিমা!

মাতৃভক্তি ও ভ্রাতৃস্নেহ ঈশ্বরচন্দ্রের অতুলনীয়। তিনি মাতাপিতাকে প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ দেবতা জ্ঞানে ভক্তি করিতেন। পিতা মাতার সেবা করিয়া তাঁহাদের চরণতলে প্রণত হইয়া তিনি হৃদয়ের ভক্তি বৃত্তির চরিতার্থতা সাধন করিতেন। তাঁহাদিগকে সুখী করা, তাঁহাদের সেবা করা তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম ছিল। দয়া ভক্তি প্রভৃতি হৃদয়ের সুকোমল বৃত্তিসমূহ কেবলমাত্র বন্ধুজনে পর্য্যবসিত হয় না। তাহার মধ্যে স্বর্গীয় তেজ ও অমানুষিক শক্তি নিহিত আছে। হৃদয়ে যখন কোন প্রবলভাবের বন্যা বহিত থাকে, তাহার নিকট সমুদয় বাধা বিঘ্ন তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যায়। হৃদয়ের শক্তির নিকট প্রকৃতি মস্তক নত করে, পর্ব্বত সরিয়া দাঁড়ায়, সমুদ্র আপন বক্ষ বিস্তৃত করিয়া তাহার গতি-পথ বিস্তৃত করিয়া দেয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোন ভ্রাতার বিবাহ উপলক্ষে তাঁহার জননী তাঁহাকে বাড়ী যাইবার জন্য লিখিয়াছিলেন। তিনি ছুটীর প্রার্থনা করিলেন; কর্ত্তৃপক্ষ ছুটী দিতে অস্বীকার করিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহার জননী দেবী যে চক্ষুর জলে ভাসিয়া যাইবেন, এই কথা মনে হইবার মাত্র, তাঁহার জননীর সেই সজল-

বদন মূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়কে উদ্বেলিত করিয়া তুলিল; তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; তিনি উর্দ্ধতন কর্ম্মচারির নিকট কর্ম্ম-পরিত্যাগ-পত্র লইয়া গিয়া বলিলেন—"আমার জননীর হৃদয়-বেদনা আমার সকল অর্থ কষ্টের অনেক উর্দ্ধে, আমার কর্ম্ম পরিত্যাগপত্র গ্রহণ করেন; আমি জননীর তৃপ্তির জন্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া দেশে চলিলাম।" সেই কর্ম্মচারী তাঁহার অবলা মাতৃ-ভক্তি দেখিয়া হৃদয়াবেগে অভিভূত হইয়া পড়িলেন ও তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ছুটী প্রদান করিলেন। তিনি ছুটী পাইবা মাত্র পদব্রজে দেশাভিমুখে ছুটিলেন। তখন বর্ষাকাল। যখন দামোদরের তীরে উপস্থিত হইলেন, তখন সন্ধ্যা আগত প্রায়। নদী তখন কানায় কানায় প্রবল স্রোতে তীর বেগে ছুটিয়াছে। তখন একখানি নৌকাও ঘাটে ছিল না। জননীর বিষাদ-মূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে আত্মহারা করিয়া তুলিল। তিনি প্রবল স্রোতের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া সন্তরণ পূর্ব্বক নদী অতিক্রম করিবার জন্য নদীতে ঝম্প প্রদান করিলেন। হৃদয়ের আত্মহারা ভাব বাহুতে অসীম শক্তির সঞ্চার করিল। নদী যেন এই মাতৃভক্ত সন্তানকে বক্ষে লইয়া আপনি ধন্য হইয়া উঠিল। কত যুগ ধরিয়া এই পর্ব্বত-দুহিতা নদী যৌবনের তরঙ্গায়িত পূর্ণ জীবনে সমুদ্রের দিকে ছুটিয়াছে। বৎসরের পর বৎসর তাহার উপর দিয়া প্রখর সূর্য্যকিরণে ঝলসিত করিয়া সুমন্দ বাতাসে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গের উল্লাসময় নর্ত্তনে বক্ষ সচঞ্চল করিয়া কিম্বা প্রবল ঝড়ের তাড়নে বুককে সংক্ষুব্ধ ও বিলোড়িত করিয়া, ঘন মেঘের কৃষ্ণচ্ছায়ায় বক্ষ অন্ধকারে আবৃত করিয়া, কিম্বা শরতের বিক্ষিপ্ত মেঘমালার বিচিত্র সৌন্দর্য্যে নদীবক্ষ চিত্রিত করিয়া প্রাতঃ সন্ধ্যায় আকাশের বর্ণবৈচিত্র্যময় শোভা প্রতিফলিত করিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে; কত ভক্তহৃদয়ের ভক্তি-বন্ধন-লিপ্ত পুষ্পমালায় বক্ষ সজ্জিত হইয়াছে। কত শ্বেত পালে সজ্জিত তরণীর বহর সঙ্গীতে ভাসাইয়া তাহার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, কত পণ্য দ্রব্য লইয়া অর্ণবপোত তাহার শান্ত বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া ভাসিয়া গিয়াছে; কিন্তু আজ এই মানব-দেবকে বক্ষে লইয়া যে আনন্দে ইহা বহিয়া চলিয়াছে, তাহার এই সৌভাগ্য বুঝি আর কখনও হয় নাই। মাতৃ-ভক্তির মহাশক্তি দ্বারা সজ্জিত ঈশ্বরচন্দ্রের নির্ভীক হৃদয়ের নিকট যেন মস্তক নত করিয়া তরঙ্গরাশি তাহাকে বক্ষে করিয়া পরপারে লইয়া গেল। সিক্ত বস্ত্রে সেই রজনী কোন আত্মীয়ের বাড়ী আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পরদিন প্রত্যূষে মাতৃদেবীর পদ বন্দনা করিলেন। এইরূপ মাতৃভক্তির দৃষ্টান্ত কি কোথাও দেখিতে পাওয়া যায়? এই জননীর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়াই বিদ্যাসাগর মহাশয় বালবিধবার দুঃখ-মোচনার্থ বিধবা বিবাহ বিধিসঙ্গত করিবার জন্য আইন প্রণয়ন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া বঙ্গীয় সমাজের প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে গভীর আন্দোলন তুলিয়াছিলেন। তাঁহার জননীর হৃদয়ও দয়ায় পূর্ণ, স্নেহে সুকোমল ছিল। প্রতিবেশিগণের মুখে অন্ন দিবার জন্য, রোগীর সেবার জন্য, দুঃখীর দুঃখ মোচনের জন্য তাঁহার হস্ত সর্ব্বদা উন্মুক্ত। তাঁহার গৃহ কত লোকের গৃহ ছিল, তাঁহার মাতৃহৃদয়ে কত লোকের স্থান ছিল। এমন জননী না হইলে কি এমন সন্তান জন্মগ্রহণ করে? নেপোলিয়ন বলিয়াছিলেন, "আমাকে ভাল জননী দেও, আমি মহৎ জাতি প্রদান করিব।" জননীগণ ভবিষ্যৎ বংশের জননী। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননীর

ন্যায় জননী যদি আমাদের দেশে আরও যদি জন্মগ্রহণ করেন, আমাদের ভবিষ্যৎ সমাজ পৃথিবীতে বরণ্য হইবে, সন্দেহ কি ?

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভ্রাতৃস্নেহের তুলনা পৃথিবীতে পাওয়া যায় না। তাঁহার ভ্রাতৃগণ তাঁহার নিকটে কলিকাতায় থাকিয়াই অধ্যয়ন করিত। তাহারা তাঁহার সঙ্গে এক বিছানায় শয়ন করিত। কখনও কখনও শয্যায় মূত্র ত্যাগ করিয়া তাহার সমস্ত শরীর ভাসাইয়া দিত। তিনি আনন্দে ঠিক জননীর ন্যায় স্বহস্তে তাহাদের মল মূত্র পরিষ্কার করিয়া দিতেন, বিছানা ধুইয়া দিতেন, তাহাদিগকে খাওয়াইয়া দিতেন, ও নিজে তাহাদের পড়ার তত্ত্বাবধান করিতেন ও শিক্ষাদান করিতেন। তাহাদের কোন কষ্ট তাঁহার হৃদয়কে অস্থির করিয়া তুলিত। তাঁহার সকল ভাই যেন একহৃদয়, একপ্রাণ ও একদেহ। তিনি যখন উচ্চ পদে আরূঢ়, তখন তাঁহার দুই ভাই দুরন্ত বিসূচিকা রোগে কালগ্রাসে পতিত হয়। তিনি তাহাতে কাঁদিয়া ব্যাকুল; কিছুতেই সান্ত্বনা লাভ করিতে পারেন নাই; মাতৃবেদনা আরও প্রবল হইয়া উঠিবে, কেবল এই ভয়ে তিনি আপনাকে সংযত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

সত্যপরায়ণতা, সত্যানুরাগ নির্ভীকহৃদয়ের নিত্য সহচর। ভীরুতাই মিথ্যার জননী। যে হৃদয়ে অমিত সাহস, মিথ্যা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। ঈশ্বরচন্দ্র হৃদয়ের সাহস ও অকুতোভয়তা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্থির অটল হৃদয়ে দুঃখ-ভয়, দারিদ্র্য ভয়, রোগ-ভয়, মৃত্যু-ভয় কিছুই কোন্ দিনের জন্য স্থান পায় নাই। কোন্ ভয়ে তিনি মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিবেন ? সত্যপরায়ণতা মনুষ্যত্ব-জ্ঞাপক। কর্ত্তব্য-পথে অটল, স্থির, উচ্চ মহৎ লক্ষ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত জীবন কোন্ প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া মিথ্যাকে অবলম্বন করিবে ? অর্থের লালসা জীবনকে সত্যভ্রষ্ট করে; এবং এই অর্থ বিষয়ে সততা চরিত্রের কষ্টিপাথর' স্বরূপ' বিদ্যাসাগর মহাশয় যার নিকট যত টাকা পাইতেন, তার সুন্দর হিসাব রাখিতেন। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কাহারও প্রাপ্য অদেয় আছে কি না, জানিবার জন্য যখন পুরাতন খাতা দেখিতে-ছিলেন, তখন দেখিলেন যে, তিনি গভর্ণমেণ্ট হইতে দশসহস্র টাকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার খরচের কোন হিসাব দেখিতে পাই-লেন না। তৎক্ষণাৎ তিনি গভর্ণমেণ্টকে ঐ বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের হিসাবে ঐ টাকার বিষয় কিছুই সন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন ঐ টাকা খরচ করিয়াছেন কিনা, সে বিষয়ে কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না, তখন তিনি নিজের তহবিল হইতে দশ সহস্র টাকা গভর্ণমেণ্টকে পাঠাইয়া দিলেন।

তাঁহার কথা ও কার্য্যে গভীর সামঞ্জস্য ছিল। এক প্রকারে তিনি বলিবেন ও উপদেশ দিবেন, আর অন্যরূপ আচরণ করিবেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় সেরূপ ধাতুতে গঠিত ছিলেন না। এইজন্যই তাঁহার প্রতি লোকের এত অচলা ভক্তি। তাঁহার কার্য্য ও কথার মধ্যে নীচ স্বার্থপরতার কোন গন্ধ ছিল না। তিনি দেশের মঙ্গলোদ্দেশেই সকল কথা বলিতেন ও সকল কার্য্য করিতেন। এইজন্য তদানীন্তন লেপ্‌টেনেণ্ট-গভর্ণর সকল বিষয়ে তাঁহার পরা-মর্শ গ্রহণ করিতেন।

তাঁহার সকল বিষয়ে, আহারে ও পরিচ্ছদে, গৃহসজ্জায় একটা সাদাসিধা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাব তাঁহার হৃদয়ের পবিত্রতা সূচিত করে। তাঁহার জীবনের একমাত্র বিলাসোপকরণ

তাঁহার পুস্তক। তাঁহার পুস্তক সকল তিনি অতি পারিপাট্যের সহিত সুন্দররূপে বাঁধাইয়া সজ্জিত করিয়া রাখিতেন। নারিজাতির প্রতি অবমাননা তিনি প্রাণান্তেও সহ্য করিতে পারিতেন না। একদিন তাঁহার কলেজের কয়েকটী ছেলে তাহার ত্রিতল ছাদের উপর দাঁড়াইয়া পার্শ্ববর্ত্তী গৃহের মহিলাদের প্রতি অপবিত্র-দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়াছিল। এজন্য সঙ্কুচিত হইয়া তাহাদিগকে সর্ব্বদা স্ব স্ব প্রকোষ্ঠে নিবদ্ধ থাকিতে হইত। এই কথা যখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কর্ণগোচর হইল, তখন তিনি একদিন সন্ধ্যার সময় গোপনে তাঁর কলেজের ত্রিতল ছাদে উঠিয়া একদল ছেলে দেখিতে পাইলেন। বাঘ যেরূপ শিকারের উপর লাফাইয়া পড়ে, তিনি সেইরূপ তাদের আক্রমণ করিয়া হৃদয়ের অগ্নি চক্ষু ও মুখে উদ্গীর্ণ করিয়া তীব্র কঠোর ভাষায় নিজেদের মাতা ভগিনীদের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া ভৎ‌র্সনা করিলেন, আর নিজের কলেজ হইতে তাহাদের বিহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। কলেজ উঠিয়া যাইবে, তথাপি এইরূপ ছাত্রদের বেতন দ্বারা তিনি কলেজ পুষ্ট করিয়া রাখিতে পারেন না।

আর সকলের উপর কি তাঁহার প্রবল ইচ্ছাশক্তি। নেপোলিয়ন যেরূপ বলিয়াছিলেন—আল্‌পস্ পর্ব্বত আমার পথরোধ করিতে পারিবে না, তিনিও শত সহস্র বাধা বিঘ্নকে প্রবল ইচ্ছা-শক্তির প্রভাবে নত করিয়া তাহাদের উপর দিয়া সবেগে দৃঢ় পদবিক্ষেপে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পথে বন্ধুও দাঁড়াইতে পারেন না, শত্রুও দাঁড়াইতে পারেন না। এখানে মৃত্যুর পরপারে যেরূপ হয়, সেরূপ শাস্ত্রকারের ভাষায় বলিতে হয়, বন্ধু অবন্ধু হয়, পিতা অপিতা হয়। লজ্জা সম্মান তাঁহার নিকট অতি তুচ্ছ কথা। একদিন তাঁহার কোন ধনী বন্ধুর দরওয়ান দরজা হইতে ভিখারীকে তাড়াইয়া দিয়াছিল, তাহার পর তিনি আর তাঁহার সেই বন্ধুর মুখ দর্শন করেন নাই। দরিদ্র দোকানীর দোকানে সামান্য মাদুরাসনে বসিয়া তিনি তাহার সঙ্গে প্রাণ ভরিয়া আলাপ করিতেন, আর সম্ভ্রান্ত পদস্থ বন্ধু তাহাকে দেখিয়াও যেন দেখিতে পান নাই, এরূপভাবে চলিয়া যাইতেন, কিন্তু বিদ্যাসাগর তাঁহার পদস্থ বন্ধুর এই সঙ্কোচ দেখিয়া আরও আনন্দের সহিত প্রাণ খুলিয়া দরিদ্র দোকানীর সঙ্গে একাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া আলাপ করিতেন।

মনুষ্যত্বের গৌরবে তিনি ভূষিত ছিলেন এবং সেই গৌরব চিরদিন তাঁহার জীবনে তিনি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। কোন স্বার্থের নিকট তিনি এই গৌরব বলিদান করেন নাই। এমন মানব-প্রেমে কুসুমের ন্যায় সুকোমল ও বজ্রের ন্যায় সুকঠিন হৃদয় লইয়া তিনি পৃথিবীতে মানব জন্ম সার্থক করিয়া এই পৃথিবী হইতে মহাপ্রস্থান করিলেন।

মৃত্যু-রোগের সঙ্গে সংক্রামেও তিনি কি বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন। পৃষ্ঠদেশে তাঁহার একবার দুষ্টব্রণ হইয়াছিল। ডাক্তার যখন ঔষধ প্রয়োগে অজ্ঞান করিয়া অস্ত্র প্রয়োগ করিবেন বলিলেন, তিনি বলিলেন—"আপনারা আমাকে অজ্ঞান করিয়া করিয়া অস্ত্র প্রয়োগ করিবেন না; আমি স্থির থাকিব, একটুও নড়িব চড়িব না; আপনারা যেরূপ খুসী অস্ত্র করিবেন।" ডাক্তারগণ দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক্ হইলেন যে, এত কঠিন অস্ত্র চিকিৎসাতে তিনি আপনাকে অজ্ঞান হইতে দিলেন না; একটু মুখ বিকৃত না করিয়া স্থিরভাবে বসিয়াছিলেন। নির্ম্মম মৃত্যু এইরূপ বীর পুরুষেরও সম্মান প্রদর্শন করিল; কিম্বা এই পৃথিবী তাঁর উপ-

যুক্ত নয় মনে করিয়া অন্যত্র এই হৃদয়ের পুরস্কার দান করিবার জন্য তাঁহাকে পৃথিবী হইতে লইয়া গেলেন। বিষম জরের রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার কঠিন দেহকে আক্রমণ করিল। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই শ্রাবণ বঙ্গদেশের কি বিষম দিন ? দেশের দুঃখী দরিদ্র তাঁহাদের স্নেহময় পিতাকে হারাইল, অনাথ বালকবালিকাগণ তাহাদের আশ্রয়তরু হারাইলেন ; মৃত্যুশয্যাশায়ী রুগ্নগণ জননী হস্তের স্নেহ-পূর্ণ ও সকল রোগের মহৌষধ স্বরূপ হৃদয়ের আত্ম-হারা সহানুভূতি হারাইল ; মহিলাগণ তাঁহাদের অকৃত্রিম বন্ধু হারাইল ; শিক্ষার্থীগণ তাহাদের কল্পতরু হারাইল ; বঙ্গভাষা শ্রেষ্ঠ সেবক হারাইলেন ; সাহিত্য-মন্দির আপনার নির্ম্মাতা হারাইলেন—আর বঙ্গজননী তাঁহার এই সুপুত্র হারাইয়া হাহাকার ধ্বনিতে আকাশ বিদীর্ণ করিয়া বরষার ধারায় বক্ষ ভাসাইলেন। তাঁহার দেহ হইতে প্রাণবায়ু বাহির হইবা মাত্র সেই সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। কলিকাতার গৃহে গৃহে রোদনধ্বনি উঠিল। বৃদ্ধ, যুবা দলে দলে একবার এই বীর পুরুষের অন্তিম সমাধি দেখিতে শ্মশানাভিমুখে ছুটিল। সকলের মুখেই বিষাদের ঘনচ্ছায়া ; সকলের প্রাণ শোকে-অভিভূত, সকল কণ্ঠ তাঁহার যশোগীতিতে ভরিয়া উঠিল ; সকল লেখনী পদ্যে গদ্যে তাঁহার গুণগাথা কীর্ত্তন করিয়া ধন্য হইল। সহরে সহরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে তাঁহার শোক-সভা হইতে লাগিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবন-আলেখ্য সম্মুখে রাখিয়া বালকগণ যদি নিজ জীবনে তাঁহার বিশ্ব-প্রাণ, মহৎ, উদার, সুকোমল, পরদুঃখকাতর জননী-হৃদয়, নির্ভীক তেজস্বী, স্বার্থকলুষশূন্য পুণ্য-সুন্দর চরিত্র লাভ করিবার জন্য যত্ন করে ও মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া ধন্য হয়, তবে বিধাতার অজস্র আশীর্ব্বাদ জননী বঙ্গভূমির উপর বর্ষিত হইয়া তাহাকে উচ্চ গৌরবে মণ্ডিত করিবে।

শ্রীবেণীমাধব দাস।

স্রোতের শৈবাল।

জল হয়েছে চলছে ভেসে তরঙ্গের শৈবাল,
কোথায় ছিলে কোথায় যাবে হবে কিবা হাল ?
ছিলে ঝিলে পুকুর জলে বাসা বেন্ধে সুখে,
ভেবেছিলে গৃহ ছেড়ে যাবে অন্য মুখে।
সেই বাড়ী ঘর জোক পোকাগণ সঙ্গে ছিল জলে
বরষার বারি ধারা আসবে না এই বলে।
আজি ঘর বাড়ী পাত্তাতারি সঙ্গে নিয়ে সবে
ভাসতে ভাসতে চল্লে কোথা বলবে কিগো এবে।
কোথায় ছিলে কোথায় যাবে কর্ব্বে কি গো সেথা
বন্ধু বান্ধব দারা সুতের পাবে কিগো দেখা।
তারাও সবে যাচ্ছে চলে অনুকূল স্রোতে
কেউ এথানে কেউ সেখানে কেউ বা ডুবেছে পথে।
আমরা সবে এমনি করে যাব কালের স্রোতে,
বন্ধু জনে বিদায় দিলে ভাসি অশ্রু জলে।
কেউ যাবে না মোদের সনে কিন্তু বল ভাই,
এই জলেতে ভেসে ভেসে শেষে কোথা যাই।
সাগর জলে স্রোতে নাই কি থাকবে কোথা বেঁধে,
অকুল স্রোতে চলে যাবে কে সেই বেগ রোধে ?
অনন্ত সে অকূল সাগর ঝঞ্ঝাবাতে ভরা,
কেহ পূর্ব্বে কেহ উত্তরে আর পাবে না ধরা।
হায় এমনি তোদের মতন মোদের জীবনের গতি,
কোথায় যেতেম না থাকিলে জগতের পতি !

অকূল পাথার অতল জলে তিনি কর্ণধার
ভয় নাইরে তথায় হবি ভবার্ণব পার।

থাকবে নারে দুঃখ জ্বালা পচা জলের গন্ধ,
সেই দেশেতে পাবিরে ভাই পরম আনন্দ।

শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত।

'সখা'-প্রবর্ত্তক প্রমদাচরণ সেন।

জন্ম—৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৬৬

মৃত্যু—৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৯২।

খুলনা জেলার সেনহাটী যাঁহাদের পরিচয়ে দেশ বিদেশে খ্যাতলাভ করিয়াছে, বালক-বন্ধু 'সখা'-প্রবর্ত্তক, কর্ম্মী প্রমদাচরণ সেন তাঁহাদের অন্যতম। এজগতে সচরাচর যে শ্রেণীর লোকের জীবনচরিত লিখিত, পঠিত হইয়া থাকে, প্রমদাচরণ সে শ্রেণীভুক্ত হইবার অবসর পান নাই সত্য, কিন্তু শিশু মাসিক সাহিত্য "সখার" জন্মদাতা বলিয়া বাঙ্গালীর নিকট যে তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন, একথা জোর করিয়াই বলা যাইতে পারে। প্রমদাচরণের পূর্ব্বে খ্রীষ্টান প্রচারকগণ, মনস্বী কেশবচন্দ্র সেন ও জোঁড়াসাকো ঠাকুর পরিবার হইতে এ বিষয়ে কিছু কিছু চেষ্টা হইয়াছিল সত্য; কিন্তু শিশু-সাহিত্যের আদর্শ ও মর্য্যাদা সম্যক উপলব্ধি করিয়া সাধনার পথে অগ্রসর হইতে পারেন নাই। 'সখার' পরে তদনুকরণে কত মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে, কিন্তু তাহার কোন খানিই সখার সমকক্ষ হইতে পারে নাই—একথা চক্ষুষ্মান ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার কারণ কি? ইহার কারণ—প্রমদাচরণ যে ভাবে শিশু-সাহিত্যের আদর্শ ধরিয়াছিলেন, আর কেহই সে ভাবে ধরিতে পারেন নাই। ইহার কারণ—প্রমদাচরণের ন্যায় উদ্ভাবনীশক্তি ও প্রতিভা সকলের থাকে না, আর তাঁহার ন্যায় কর্ম্মনিষ্ঠ লোকও সাহিত্য ক্ষেত্রে নিতান্ত দুর্লভ।

প্রমদাচরণ যখন বিধিনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করেন, তখন আমি নিতান্ত বালক, সুতরাং তিনি ও আমি এক গ্রামবাসী হইলেও তাঁহার সাহচর্য্য লাভ আমার অদৃষ্টে অধিক ঘটে নাই। শিশুকালে অজ্ঞানবস্থায় হয়ত তাঁহাকে দেখিয়া থাকিতে পারি, কিন্তু জ্ঞানতঃ তাঁহাকে দেখিবার—তাঁহার সহিত কথা বলিবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছে মাত্র আমার একবার—অল্প সময়ের জন্য—যে খুলনায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অম্বিকাচরণ সেনের বাসাবাটীতে—তাঁহার মৃত্যুশয্যায়। কিন্তু অল্প সময়ের জন্য হইলেও, সেই একবারই তাঁহার ব্যবহারে যে অমায়িকতা ও চরিত্রে যে বজ্রকঠোর ও কুসুমকোমল ভাবের অভিব্যক্তি দেখিয়াছিলাম, এই বত্রিশবৎসর ধরিয়া নানা ভাবে নানা লোকের সংস্পর্শে আসিয়াও সে ভাবের অভিব্যক্ত আর বড় দেখিয়াছি বলিয়া বোধ হয় না।

আমি তখন আমাদের গ্রামের স্কুলের শিশুশ্রেণীর নিম্নতম বিভাগে পড়িতাম। আমাদের বার্ষিক পরীক্ষা হইয়া গেল—আমরা উচ্চতর শ্রেণীতে প্রমোশন পাইলাম।

কয়েকদিন পরে শুনিলাম, প্রমদাবাবু নামক কে একজন ভদ্রলোক প্রত্যেক শ্রেণীর প্রথম তিনটী ছাত্রকে পুরস্কার দিবেন। পুরস্কার আনিতে খুলনায় যাইতে হইবে। স্কুল হইতে এই সংবাদ শুনিয়া বাড়ী গিয়া আমার ছোট দাদাকে (দেবঘর-প্রবাসী বিখ্যাত আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক শ্রীযুক্ত প্রমদাচরণ সেন বৈদ্যরত্ন) প্রমদাবাবুর কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন—'প্রমদা, বাবু আমাদের এই গ্রামেরই লোক—তাঁহার বাড়ী বক্সীপাড়ায় —তিনি ছেলেদিগকে বড় ভালবাসেন। আমাদের বাড়ীতে যে সখা আইসে, ছেলেপিলেদের উপকারের জন্য তিনি ঐ পত্রিকা বাহির করিয়াছেন। তিনি পীড়িত হইয়া খুলনায় তাঁহার দাদা অম্বিকা বাবুর বাসায় আছেন। তিনিই নিজের টাকা দিয়া বই কিনিয়া পুরস্কার দিবেন।

আমার ছোট দাদা 'সখার-গ্রাহক ছিলেন। মাসে মাসে আমাদের বাড়ীতে 'সখা' আসিত। আমি উহা বড় বুঝিতে পারিতাম না, তবে ছোট দাদা যখন উপদেশের গল্পগুলি পড়িতেন, তাহা মন দিয়া শুনিতাম। আর উহার ছবি দেখিয়া বড় আমোদ পাইতাম। এই ভাবে 'সখার' সহিত আমার একটা পরিচয়, একটা সখিত্ব জন্মিয়াছিল। সুতরাং যখন শুনিলাম, সখা যিনি বাহির করিয়াছেন, সেই প্রমদা বাবুই পুরস্কার দিবেন, তখন আমার বড় আনন্দ হইল—তাঁহাকে দেখিবার জন্যও বড় উৎসুক হইয়া পড়িলাম।

নির্দ্দিষ্ট দিবসে অন্যান্য ছাত্র, শিক্ষকবর্গ ও গ্রামের বিশিষ্ট বিশিষ্ট ভদ্রলোকগণের সঙ্গে বিশেষ উৎসাহের সহিত খুলনায় যাত্রা করিলাম; আমরা অম্বিকা বাবুর বাসা বাড়ীতে পৌছিলাম। তাঁহার বহির্ব্বাটীর বিস্তৃত প্রাঙ্গণে চন্দ্রাতপ-নিম্নে পুরস্কার-বিতরণ-সভায় স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। আমরা সেখানে পৌছিবার কিছুক্ষণ পরে কয়েকজন লোক আরাম-কেদারায় শায়িত একজন রুগ্ন ভদ্রলোককে সভাস্থলে লইয়া আসিল। ছোট দাদা অস্ফুট স্বরে বলিলেন,—'এই প্রমদা বাবু'।

যথাসময়ে পুরস্কার বিতরণ আরম্ভ হইল। আমরা এক এক করিয়া তাঁহার নিকট হইতে পুরস্কার লইয়া আসিলাম। বই হাতে দিয়া তিনি ক্ষীণস্বরে কত স্নেহের কথা—কথা উৎসাহের কথা বলিলেন। পুরস্কার বিতরণ ও সভার অন্যান্য কার্য্য শেষ হইয়া গেলে, লোকজন কমিতে আরম্ভ করিলে আমাকে লইয়া আমার ছোট দাদা তাঁহার কাছে গেলেন—আমরা দুই ভাই তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তাঁহার ও আমার ছোট দাদার উভয়ের এক নাম ছিল বলিয়া প্রমদা বাবু ছোট দাদাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। আমরা প্রণাম করিলে—আমি পুরস্কার পাইয়াছি বলিয়া তিনি আমার গায়ে মাথায় হাতবুলাইয়া কত আশার, কত উপদেশের কথা বলিতে লাগিলেন। সে স্নেহের স্পর্শে, সে মধুর কথায়, কি জানি এক অনির্ব্বচনীয় আবেশে আমার দেহ রোমাঞ্চিত ও অন্তরাত্মা পুলকাকুল হইয়া উঠিল—সে স্পর্শজনিত সুখানুভব আমি এ জীবনে ভুলিতে পারিব না। এখনও কোন সুখাবেগে আমার দেহ মন পুলকিত হইলে আমার সেই স্নেহ-স্নিগ্ধ স্পর্শের কথাই মনে পড়ে।

অনেকপূর্ব্বে যশোহর ও খুলনার কলিকাতাপ্রবাসী ছাত্রবৃন্দ ও কৃতবিদ্য ব্যক্তিসমূহ মিলিত হইয়া যশোহর-খুলনা সম্মিলনী সভা স্থাপিত করেন। সভার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, উভয় জেলার গ্রাম সমূহে বালকদিগের নীতি ও ব্যায়াম ও বালিকাদিগের মধ্যে সাধারণ

শিক্ষা প্রচার করা। বৎসরের শেষে এই উদ্যোক্তৃবর্গ বালক বালিকাদিগের পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া গুনাণুসারে পারিতোষিক প্রদান করিতেন। সেবার আমি নীতিশিক্ষা বিভাগে শিশুশ্রেণীতে পরীক্ষা দিয়াছিলাম। আমাদের পাঠ্য ছিল, 'শিশুর সদাচার' নামক একখানি অতি ক্ষুদ্র পুস্তক। এই পরীক্ষায় সভার কর্ত্তৃপক্ষীয় আমাকে 'পুরুবিক্রম নাটক' পুরস্কার দিয়াছিলেন। এই পুরস্কারে আমি কিম্বা আমার অভিভাবকবর্গ কেহই সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। প্রমদা বাবু এই সভার প্রাণ-স্থানীয় ছিলেন। তাই তাঁহাকে দেখিবার জন্য ছোট দাদা সে বই খানা সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

প্রমদাবাবু যখন আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া নানা কথা কহিতেছিলেন, তখন ছোট দাদা পুস্তকখানা তাহার সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন —'আমার ভাই নীতিশিক্ষা বিভাগের শিশুশ্রেণীতে পরীক্ষা দিয়া প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে, কিন্তু সভা হইতে পুরস্কার পাইয়াছে, এই পুরুবিক্রম নাটক। ছোট দাদার কথা শেষ কথা না হইতেই স্বপ্তসিংহ যেন ক্রোধে ও বিরক্তিতে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। তিনি উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—'কি নীতি শিক্ষার পুরস্কার দিল নাটক—? ইহাতে দেশ ভক্ত বীরের কথা বর্ণিত আছে সত্য, কিন্তু বালকের হাতে নাটক দিবার ব্যবস্থা কোন ক্রমেই ভাল বলিতে পারিব না। কি করিব, আমি উত্থানশক্তি-রহিত হইয়া দূরে পড়িয়া আছি, নতুবা এখনই ইহার প্রতিকার করিতাম।' এই বলিয়া ক্লান্তিবশতঃ একটু নীরব হইলেন। একটু পরে গভীর স্নেহ ভরে আমাকে বলিলেন—'মণি, এই বই পড়িও না। আমি সুস্থ হইয়া কলিকাতায় গিয়া তোমাকে ভাল বই পাঠাইয়া দিব। আগামী বৎসর পরীক্ষা দিয়াও এইরূপ ১ম হওয়া চাই। তাহা হইলে খুব ভাল ভাল বই পাইবা। আর সদা সর্ব্বদা লোকের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করিবা। তাহা হইলে সকলেই তোমাকে ভালবাসিবে।' এই বলিয়া তিনি চুপ করিলেন, আমরাও তাহাকে অত্যন্ত ক্লান্ত দেখিয়া আবার প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

ইহার অল্প কয়েক দিন পরে একদিন ছোট দাদা বলিলেন—'কাল প্রমদাবাবু মারা গিয়াছেন!' এই সংবাদ আমার বড় কষ্ট হইতে লাগিল, আর থাকিয়া থাকিয়া তাঁহার সেই শীর্ণ রুগ্নদেহ ও ঈষৎম্লান স্নেহময় মূর্ত্তি মনে হইতে লাগিল। তাঁহার মৃত্যুর পরে 'সখায়' একটী শোক-কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। সে কবিতাটী এত মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল যে, তাহা পড়িতে পড়িতে আমি কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিলাম। সে অনেক দিনের কথা; কবিতাটীর আমি আর সব ভুলিয়া গিয়াছি কিন্তু—"ধরাধামে নাই আর প্রমদাচরণ" এই পংক্তিটী আমি এখনও ভুলি নাই। সুখে দুঃখে, সময়ে অসময়ে, যখনই সে পংক্তিটী আমার মনে পড়ে, তখনই তীব্রশোকের করুণঝঙ্কারে আমার অন্তরাত্মা আকুলিত হইয়া আমার চক্ষু অশ্রুসিক্ত করিয়া দেয়।

প্রমদাচরণ যে কি বস্তু ছিলেন—প্রমদাচরণের মৃত্যুতে দেশের দশের ও বাঙ্গালার বালক সম্প্রদায়ের যে কি ক্ষতি হইয়াছে, তখন তাহা বুঝিবার শক্তি হয় নাই —বুঝিতে পারি নাই—কিন্তু এখন বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সমসাময়িক ও সহধর্ম্মীদের নিকট যতই তাঁহার কথা শুনিতেছি, ততই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতেছি! তাঁহার 'মহৎজীবনের আখ্যায়িকাবলী', তাঁহার 'সাথী, তাহার 'চিন্তাশতক' যত

পড়িতেছি, ততই তাহার মধ্য হইতে তাঁহার স্বরূপমূর্ত্তি বাহির হইয়া আমাদিগকে বিস্ময়-বিমূঢ় করিয়া দিতেছে।

তাঁহার বড় সাধের, বড় আদরের 'সখা' তাৎকালীন বঙ্গীয় বালক সম্প্রদায়ের উপর কি আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, সে কথার সাক্ষ্য এখনকার বালকগণের পিতা, পিতামহগণ দিবেন, কিন্তু একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, বাঙ্গালার বালক সম্প্রদায়ের ভাগ্যে 'সখার' মত সখা আর এপর্য্যন্ত জুটে নাই। কিন্তু সে 'সখার' ও সখার জন্মদাতার স্মৃতি রক্ষার জন্য বাঙ্গালী কি করিয়াছে?— কিছুই না। কিন্তু তাহাতে তাঁহার কি হইয়াছে? এই অসার পৃথিবীর স্মৃতি তিনি ত কোন দিনই চাহেন নাই। সুতরাং—

'স্মৃতি যদি মুছে যায়,
কি ক্ষতি তাহার তায়?
অসার ধরার স্মৃতি
সে কি কভু চেয়েছে?
'যে ধনের ছিল তৃষা,
যার তরে ছিল আশা—
মিটিয়াছে সে পিপাসা,—
আজিত তা পেয়েছে।'*

—তিনি যে ধনের কাঙ্গাল ছিলেন,— যে তৃষ্ণায় কাতর ছিলেন, ভগবানের সাযুজ্য লাভ করিয়া—ভগবৎপ্রেমসুধা পান করিয়া তাঁহার সে পিপাসা মিটিয়া গিয়াছে। সুতরাং অসার ধরার লোক তাঁহার জন্য কিছু করুক বা না করুক, তাহাতে তাঁহার কিছুই আসিয়া যাইবে না, কিন্তু তাই বলিয়া বাঙ্গালী তাঁহার নিকট যাহা পাইয়াছে, তাহার জন্য কি কৃতজ্ঞতা টুকুও দেখাইবে না? দেবতা কিছু চাহেন না বলিয়া ভক্ত কি কখনও তাঁহার পদে অঞ্জলি দিতে বিরত হয়? ভক্ত তাহার আরাধ্যের উদ্দেশ্যে নানাভাবে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করে, ইহা স্বাভাবিক —যেখানে সেই অনুষ্ঠানের অভাব দৃষ্ট হয়, সেখানে ভক্তির আবেগ সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে, একথা প্রত্যেক লোকেরই বলিবার অধিকার আছে।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন।

পূর্ব্ববঙ্গে দাসত্ব-প্রথা।

প্রাচীন সময় হইতে পূর্ব্ববঙ্গে এক প্রকার দাসত্ব প্রথা প্রচলিত ছিল। প্রায় প্রত্যেক ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য পরিবারের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দাস বা দাস পরিবার ছিল। কিন্তু ইহারা আফ্রিকা বা আমেরিকার ক্রীতদাসদিগের ন্যায় উৎপীড়িত বা যথেচ্ছ ব্যবহৃত হইত না। ইহারা আপন আপন প্রভুর নিকট হইতে জমি প্রাপ্ত হইত এবং তাহা চাষ আবাদ করিয়া পরিবারের জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। এই সকল দাসদিগকে গোলাম বা নফর বলিত। ইহারা আবশ্যকমত প্রভুর বাটীর ভৃত্যের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। ইহাদের পরিবারগণও সময়ে সময়ে প্রভুর বাটীর চাকরাণীর কার্য্য করিত। এই সকল কার্য্যের জন্য তাহারা

---

* প্রমদাচরণের ভ্রাতুষ্পুত্র, স্বাধীন ত্রিপুরারাজ্যের রাষ্ট্রসচীব দেওয়ান শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার সেন এম এ, বি-এল প্রণীত 'কবিতা কুসুমে'র উৎসর্গ পত্র ঈষৎ পরিবর্ত্তিত।

লেখক।

কোন বেতন পাইত না, তৎপরিবর্ত্তে জমির উপস্বত্ব ভোগ করিত এবং রীতিমত আহারাদি পাইত। সহায়হীন হইলে যথাসম্ভব আদরের সহিত প্রতিপালিত হইত। প্রভুর বিশ্বাসভাজন হইলে অনেক উচ্চপদেও নিযুক্ত হইত, অদ্যাপি অনেকে জমিদার ও সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবারে এইরূপ দাসত্ব প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু সভ্যতা ও শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে এই প্রথা লোপ পাইতেছে। পূর্ব্ব বঙ্গে এই সকল দাস শূদ্র নামে খ্যাত। শূদ্রগণের মধ্যে অনেকে এক্ষণে উপযুক্ত শিক্ষা ও উচ্চপদ লাভ করিয়া অগত্যা জন্মভূমি ত্যাগ করতঃ স্থানান্তরে বসবাস করিতেছে এবং সমাজে আপনাদিগের ন্যায্য দাবী স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছে। কেহ কেহ উচ্চ কায়স্থদিগের সহিত পুত্রকন্যা আদান প্রদান করিয়া কায়স্থ নামে পরিচিত হইতেছে। যাহারা রীতিমত শিক্ষা লাভ করে নাই, তাহারা কনষ্টেবল, আদালতের পিয়ন, বরকন্দাজ, সর্দ্দার প্রভৃতির কার্য্য করিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে।

পশ্চিম বঙ্গে এইরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয় না, কিম্বা প্রচলিত থাকিলেও অনেক দিন হইতে ইহার লোপ হইয়াছে। পশ্চিম বঙ্গে শূদ্র বলিয়া কোন শ্রেণীবিভাগ দৃষ্ট হয় না। সকলেই কায়স্থ বলিয়া পরিচিত। পূর্ব্ববঙ্গেও শূদ্রগণ এক্ষণে শূদ্র বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করে। ইহা স্বাভাবিকও বটে। এজন্য লোক সংখ্যা গণনার সময় অনেকেই জাতিবিভাগে আপনাদিগকে কায়স্থ বলিয়া লিখাইয়া দিয়াছে। ইহাতে স্থানে স্থানে কায়স্থদিগের সহিত ইহাদের কলহও ঘটিয়াছে। শূদ্রগণ প্রভুর বাটীর ভৃত্যের কাজ করিবার জন্য যে জমি ভোগ করিত, তাহা নানকার বা চাকরান্ নামে অভিহিত হয়। এই শ্রেণীর লোকদিগের অন্যান্য কার্য্যের মধ্যে একটী কাজ এই ছিল যে, বিবাহ সময়ে মুখচন্দ্রিকা অর্থাৎ বরকন্যার পরস্পর মুখ দর্শন কালে উভয়কে আসনসহ উর্দ্ধে উঠাইতে হইত। ইহাকে পূর্ব্বাঞ্চলে পাটধরা বলে। এই, পাটধরা কার্য্য শূদ্রগণ এক্ষণে অতি হীন ও অপমানজনক বলিয়া মনে করে এবং কেহই ইহা করিতে চায় না। এজন্য এবং জমির মালিকের বশ্যতা স্বীকার করিতে অসম্মত হওয়ায় অনেক শূদ্র নান্‌কার জমি হইতে উৎখাত হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ের সেটেলমেণ্টে অনেক প্রজা আপন আপন জমি নান্‌কার লিখিতে অস্বীকৃত হওয়ায় প্রজা ও মালিকে বিবাদ হইতেছে এবং অনেকে স্বেচ্ছাক্রমে নিজ নিজ নান্‌কার জমি ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হইতেছে।

সাধারণতঃ দুর্ভিক্ষ বা অন্ন কষ্টের সময় অথবা ঋণগ্রস্ত হইয়া নিম্নশ্রেণীর লোকেরা আপনাদিগকে সামান্য মূল্যে বিক্রয় করিত এবং জাবজ্জীবন পুরুষানুক্রমে গোলামী অর্থাৎ দাসত্ব করিতে অঙ্গীকার করিয়া আত্মবিক্রয়পত্র লিখিয়া দিত। ইহার দুইখণ্ড কীটদষ্ট পত্র ও তাহার প্রতিলিপি এই স্থানে প্রদত্ত হইল। ইহাতে দেশের কিরূপ দুরবস্থা ছিল এবং সমাজ কিরূপ হৃদয়হীন ছিল, তাহা দৃষ্ট হইবে। ইহার একখানিতে মাত্র ১১ এগারটী টাকার জন্য মুচিরাম নামক এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রী, ৩ পুত্র ও ১ কন্যা, মোট ৬ জন, অপর খানিতে রামিরাম নামক একব্যক্তি ২১৲ টাকা পাইয়া স্ত্রী পুত্র কন্যাসহ ৫ জন যাবজ্জীবন ও পুরুষানুক্রমে দাসত্ব করিতে অঙ্গীকার করিয়া আত্মবিক্রয় পত্র লিখিয়া দিয়াছিল। প্রথম পত্রখানি ১৯৩ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। উভয় পত্রই ইংরেজ রাজত্বের পূর্ব্বে মুসলমান

রাজত্বের সময় লিখিত হইয়াছিল। এতদ্দারা সেই সময়ের হস্তলিপির আকারও দৃষ্ট হইবে এবং ভাষারও পরিচয় পাওয়া যাইবে।

প্রথম পত্র।

প্রতিলিপি

৭ই আদি কির্দ্দ সকলমঙ্গলালয়

শ্রীজয়কৃষ্ণ গুহ সুচরিতেষু লিখিতং

শ্রীমুচিরাম চঙ্গ তস্য স্ত্রী শ্রীমতিতপী তস্য পুত্র শ্রীপঞ্চাচঙ্গ ও শ্রীবারুচঙ্গ ও শ্রীরঞ্জিত-চঙ্গ কন্যা শ্রীমতি কালিন্দিবালা আপ্ত (আত্ম) বিক্রয় পত্রমিদং কার্যাঞ্চাগে আমরা সপরিবারে অন্নরিণ (ঋণ) উপহতি (?) ক্রেমে নগদ মূল্য তোমার স্থানে ১১ এগার রুপাইয়া পা য়া স্বইচ্ছা পূর্ব্বক আপ্ত বিক্রি হইলাম। তোমার পুত্র পৌত্র আদি ক্রেমে আমার পুত্র পৌত্র আদি ক্রেমে গোলামি করিব। এহি করারে আত্ম বিক্রয় পত্র দিলাম। ইতি সন ১১৩৪ চৌত্রিষ তেরিখ ১৬ ফাল্গুণ। এই পত্রের অ পর পৃষ্ঠায় স্বাক্ষীদিগের নাম।

(অপর পৃষ্ঠে সাক্ষীদিগের নাম)

নিসানসহি

শ্রীমুচিরাম চঙ্গ

শ্রীমতি তপী

শ্রীপঞ্চা চঙ্গ

শ্রীবারু বঙ্গ ও শ্রীরঞ্জিত চঙ্গ

শ্রীমতি কালিচঙ্গ।

ইআদিকীর্দ্দ শ্রীশোভারাম গুহ সুচরিতেষু লিখিতং শ্রীবাসিরার শূদ্র ওলদে সাদুরাম শূদ্র ইরফে দেবাই শূদ্র তস্যস্ত্রী শ্রীমতি মাধবী তস্য পুত্র শ্রীরামধন শূদ্র ও শ্রীসদারাম শূদ্র তস্য ভগ্নি শ্রীমতি রতনি কওলা আপ্ত বিক্রি পত্র-মিদং কার্য্যঞ্চআগে আমরা সকলে মহাতুর্ব্বিক্ষে অন্নরিণ উপহতি ক্রেমে আপন আপন সহ ইচ্ছা-পূর্ব্বক তোমার স্থানে নগদ মূল্য পুরওজন দহ-মাসি ২১৲ এক্কৈস রুপাইয়া দস্তবদস্ত পাইআ আপ্ত বিক্রয় হইলাম তোমা পুত্র পৌত্রাদি ক্রেমে দান বিক্রির অধিকারি হইআ নফরি দাস্যতা করাইবা আমার পুত্র পৌত্রাদি ক্রেমে নফরি দাস্যতা করিব এহি করারে আপ্ত বিক্রিয় পত্র দিলাম ইতি সন ১১৬১ এগারসও একসাইট তেরিখ ২৫ ফাল্গুণ রোজ শুক্রবার

জায় জিনিস

আরকট ১১৲

দহমাসি ১০৲

২১৲ এহি এক্কৈশ রুপাইয়া পাইলাম ইতি

নিসানসই

শ্রীসদারাম শূদ্র

শ্রীরামধন শূদ্র

শ্রীমতি মাধবি

শ্রীবাসিরাম শূদ্র

শ্রীমতি রতনি

শ্রীমোহিনীমোহন বসু।

পোলাও—অষ্টম উচ্ছ্বাস।

কুন্দ শুভ্র সিংহ কেশর,
তাও করিলে লালে লাল!
সাবাস তোমায় বঙ্গ কুমার,
সাবাস তোমায় নন্দলাল।

জগতের
এমনি নিয়ম এমনি নিয়ম
কেউ বা ভেঙ্গে দিচ্ছে মরম,
কেউ বা পুনঃ ভাঙ্গা মনে,
লাগায়ে প্রলেপ সযতনে.

কেউ বা আবার খোঁচার উপর,
লাগিয়ে দেয় খোঁচা,
কেউ বা বলে দরদ ছলে
রক্ত ওর মোছা।
নির্দ্দয়তা সুয়ো রাণী
সতীন ওর করুণা,
বুড়ীর মত ধিকিয়ে চলে,
যদিও স্বভাব তরুণা;
খিঙ্কী এবার চূড়ায় বসে,
জাঁক কচ্ছে আপনার,
কীর্ত্তি কত হচ্ছে হত
কাল অঙ্গ বসুধার।
আলগামুখী আশা ছুঁড়ী
কাণের কাছে বক্‌বকায়,
সোণার আলোর স্বপ্নদিয়ে
নিরাশ মনে খুব চেতায়।
ধীরে চল মলয় বা'
বাঘে ছুলে আঠার ঘা,
হিঃ হিঃ হিঃ হা হা হাঃ
বাঘে ছুলে আঠার ঘা।
কেতন বর্ণ হল কেমন
মাছরাঙা,
দণ্ড খানায় ঘুণ্ ধরেছে
বুক ভাঙা!
ম্যারাথন থার্ম্মোপলি,
হয়ে গেছে ছাই,
যদুপতি যদুপতি
যদুপতি নাই।
The Spirit of contentment
নিত্য অভাব তরে,
আর বুঝি গো তিষ্ঠোয় না
আমা সবা ঘরে।
সত্য নাই সত্য নাই,
ছনিয়া যেন মিথ্যে,
মিষ্টি যা' তা' চলে গেছে
সবই যেন তিত্তে।
ঈশার ভায়া গীতার গাঁথা
চৈতন্যের শিখরিণী,
বুদ্ধের সেই গহিন গাহন
মেকনের ভক্তি চিনি,
এসব যেন যাচ্ছে ডুবে
পাপের কুয়াসায়।
হৃদয় যেন পাষাণ হেন
ভোগের পিপাসায়,
স্বাধীন ভাবে বল্‌ব কি গো
ভাষার মাঝে gag,
Neck-tie আর পর্‌ব কবে
গলার উপর ঘ্যাগ।
সোণার দাঁড়ে বসে আছি,
সোণার শিকল পায়,
বনের পাখী অবাক্ চোখে
খাঁচার পানে চায়।
শ্রাবণ মেঘের বরণ কাল,
রূপ লেগেছে তমালে,
মনের মাঝে গুমোট বাঁধা,
মেঘটা কে গো সাজালে।
ও মেঘেতে বিজলী খেলে,
শত কামান গাজে,
এ মেঘেতে শব্দহীন
নীরবতা বাজে।
শিরায় শিরায় কাঁপন ওঠে,
রক্ত করে জল,
নয়ন কোণে অশ্রু এসে,
করে টলমল!!
ফন্ ফন্ ফন্ হৃদয়-যন্ত্র,
হচ্ছে আলোড়িত,
রাশি কাল ধোঁয়া,
হতেছে নির্গত।

ঘুমের মাঝে ছায়ার মত,
ছায়ার দেশের প্রাণী যত,
অতি তীব্র ইঙ্গিতেতে;
কি যেন সব বল্‌ছে মেতে,
রক্ত তারা খেতে চায়,
পাগল-পারা চিত্তে ধায়,
লুটতে বলে ছুটতে বলে,
মাখ্‌তে বলে রুধির,
খেতে বলে পিতে বলে
তীব্র রুদ্র মদির।
ভেঙে ফেলে গড়্‌তে বলে
নূতন গড়া,
দর্পে আর পৈশাচ্যে
ডুব্‌ছে ধরা।
ধান গাছে ধান ফলে
নারকেল গাছে মুছি,
খুব-ওড়াও ভাই ছোকা দিয়ে
টাট্‌কা টাট্‌কা লুচি।
এত বড় পুকুরেতে বুঝি মাছ নাই,
আর ত শুনিনে সেই গুপ্‌ গাপ্‌ ঘাই,
মণ্টেগু ফেলিল জাল, বাঙ্গালী-গৌরব,
পড়িল তাহার মাঝে প্রাচীন রাঘব;
বুড়ো বুড়ো মাছ গুলো সব প'ল ধরা,
এখন কি করা যায় বিপুলাচ ধরা!
আনিবাসনায় কাণী করিল দুর্জন,
গরমেতে জল ঢালা নরমে নরম,
Politics মাতোয়ারা কেষ্ট বিষ্টু সব,
কেঁদে কেঁদে ক্ষুধার্ত্তেরা হতেছে নীরব,
প্রাণের "প্রফুল্ল" দেখ, হয়ে মর্ম্মাহত,
দরিদ্রের তরে আজ কাঁদিছে নিয়ত।
সর্ব্বাধিকারীর শ্লেষ শ্লেষ্মায় ভরা,
বড় হ'তে ইচ্ছা ব'লে বাত কড়া কড়া।
কাঠিন্য গর্ব্বের কণা সদা মাথা খাড়া,
হেসে কুটি কুটি যত বিনয়ের পাড়া।

কোথা সে ভারতবর্ষ চারুতায় ভরা,
কোথা তার প্রাচুর্য্যের অমৃতের সরা?
ওই ম্যালেরিয়া যেন, রাক্ষসী পুতনা,
লোল-জিহ্বা, রক্তাম্বরা, ঘূর্ণিত নয়না।
শিশুর লাবণ্য হ'রে যুবতী যৌবন,
শক্তিধর-শক্তি হরি' করে আলিঙ্গন,
দয়া নাই পথ্য নাই সূর্য্যের নন্দন
দিন রাত করিতেছে দারিদ্র্য মোচন।
কোথা ভারতের রাজা, রাজার গৌরব,
আময়ে প্রকৃতিবর্গ হতেছে নীরব।
অন্ন নাই, স্বাস্থ্য নাই, পীড়ার তাড়নে
অভিভূত হ'য়ে সব মরিছে মরমে!
Ladyর জুতা কিনে এনে
পরাও ললনায়,
(আর) গলায় দিয়ে Neck-tie বাছ
পুরাও বাসনায়।
জুঁই শেফালি টগর বেলা
উঠিয়ে ফেলে দিয়ে,
বাগান কর মনের মত
ম্যাগ্‌নোলিয়া নিয়ে;
ঘোম্‌টা ঘোচাও সিঁদুর মোচাও,
স্বাধীনভাবে প্রেম কর,
Nation যদি হ'তে চাও
ফিরিঙ্গি এ নাম ধর।
চাপে পড়ে সমাজটা যে
হয়ে পড়ছে চ্যাপ্‌টা,
(এখন) মাথার মাঝে গুঁজ্‌তে হবে
হ্যাট্‌টা কিম্বা ক্যাপ্‌টা।
রোগটা যে কি হচ্ছেনা ঠিক
বোকা Dr. Merryman,
দর্শনি যা ল'য়ে যান,
গুন্‌ গুনিয়ে গেয়ে গান;
গিলে দেওয়া লম্বা কোঁচার
রেওয়াজ টাকি হবে রদ,

সবাই আমরা আওড়াব কি
Nasty nasty ড্যামের গদ ?
কুমার তাহার ঘুরিয়েছে ভাই
চাকাখানা ?
সরা হবে কি কলসী হবে
নাইক জানা।
আমরা হ'তে চাচ্ছি কি ?
আমরা হ'তে যাচ্ছি কি ?
আমরা কেমন হলে কেমন হব,
বুঝতে পারছি কি ?
আমরা স্রোতের জলে ভাসতে জানি,
জানিনাক উজোতে,
ঠাণ্ডা হ'য়ে করতেছি বাস
চুনার পুরীর কুজোতে।
মনের চিতায় লক্ লক্ করি
আগুন জ্বলে,
মনে হয় যেন স্বস্তি নাইক,
জগতী তলে।
শিক্ষিত দেশ শিক্ষিত দেশ
শিক্ষিত মোরা কোন্‌খানে,
Monumental liar গুলা
সমাজ বেদীর মাঝখানে
[সস্তি]

আমরা

Democrat নই Theocrat নই
পুরোদমে Epicurean,
জোঁক জামাইয়ের মাকে বলি
মাঝে মাঝে 'dear বেয়ান'
ওগো মহালক্ষ্মি ওগো ইংরাজের ভাষা,
এত ভজনায় তবু মিটালেনা আশা।
লইলে না উপচার rafty হ'য়ে র'লে,
ভক্ত বলে দয়া করে না তুলিলে কোলে।
অর্থগৃধ্নু Brutusএর ঘোর প্রলোভন,
Nickleby সুন্দরীর কৌতুক মোহন,
Quad quack আর Kick the বকেটে,
পূর্ণ করি রাখিলাম মনের পকেটে।
Cockles of the heart আরও কত কি যে,
শিখা'লাম শিষ্যদলে শিখিলাম নিজে।
এবে ভাসিতেছি সদা নিরাকার নীরে,
মিটিলনা বিন্দু আশা র'লাম তিমিরে।

(ওরে) ম্যানচেষ্টার কি গুণ করেছে
তাঁতী মাকু ভাঙ্গে,
মাঝির জালে মাছ পড়ে না
চড় পড়েছে গাঙ্গে।
গোজ গাঁজ ঢিবে ঢাবা
নরদ তক্তি শানা,
এপং দেপং গন্ধ পুষ্পং
লাক ফণাফণ্ ফণা—
তাঁতীর মাকু আর চলে না
পেট ভরেনা ফ্যানে,
এমন দুর্দ্দিন দেখিনি ত
সত্যি বলছি জ্ঞানে।
তাঁতী গেছে, কুমার গেছে,
কামার করছে ধুক্‌ধুক্,
Councilএর মেম্বর হ'তে
নেতার ফুলে উঠ্‌ছে বুক,
শক্তি চাই চিন্তা চাই
চাই আপনার জোর,
দেহি দেহি বলে আর
ফেলিস নারে লোর।

আমাদের

Energy ত বেতো ঘোড়া
আমরা এক্কা গাড়ী,
ওদের সঙ্গে পাল্লা দিতে
আমরা কিগো পারি ?
Ruskin পড়া, Plato পড়া
লম্বা টাইটেল ধারী,

Artএর কথায় রাধাকমল
দেখালে এলেম ভারী.
ইনি
Van Laar কি Angelo তাই
সমজান হুক্কর,
[এর] ভাষার যেন প্রতি অঙ্গে
বেড়াচ্ছে পুষ্কর।
ইচ্ছা করে আসাম হ'তে
কমল মধু আনি,
কমল সথায় করাই পান
ক্ষীরের সঙ্গে ছানি।
মুস্কিল আসান নবী মুস্কিল আসান
পড়ে শুনে যাদুবৃন্দে হতেছে পাষাণ।
শরতের কিরুরাণী রবির বিনোদা
জগতের কাব্যবনে যুগল মন্দার।
অশরীরী নৈরাশ্যেরে করিল শরীরী,
যে যে শিল্পী, মহামতি Rembrandt হতে
তাদের কৌশল, [কোন মতে] নহে নিন্দনীয়,
উভয়ের তুলি যেন কোন্ মন্ত্র বলে,
বিধাতার বর্ণপাত্র করিয়া পরশ,
আঁকিয়াছে দুইজনে যুগল রতন,
গ্রাম যদি ভেঙ্গে যায় ভেঙ্গে যাক্ গ্রাম,
নায়েগেরা জলোৎসব, তথাপি সুন্দর!
শ্রাবণের লীলাময়ী 'কিরণ তটিনী'
উপেন্দ্র হৃদয়ে, সিন্ধু ভাবিয়া যথন
ছুটে গেল আলিঙ্গিতে, হল অবজ্ঞাত,
প্রেম সে পেলনা কোথা, দয়িত তাহার,
গ্রন্থকীট, Metaphysic মন্ত্র পানে ভোর।
যুবতীর অতি তীব্র ভোগ লালসায়,
তার সেই নিদারুণ তপ্ত পিপাসায়,
একবিন্দু প্রেমবারি দিত যদি ঢেলে
হে সংযমী, "কিরণ" কি সংযমের ডোরে
আপনারে বন্ধনিতে পারিত না তবে?

পদপৃষ্ট ভুজঙ্গীর ফণা প্রসারণ
স্বভাবের দত্ত বৃত্তি—নিসর্গ সরল।
সান্ত এ জগতীতল, প্রেমের মানুষ,
হৃদয়ে ছুটাতে তার অনন্তে সে চায়,
উল্কা যদি হ'ত "কিরু" গগন-বিহারী,
চন্দ্র সূর্য্য, বধু আদি গ্রহগণে তবে,
ভয়ে অভিভূত করি উদ্ভ্রান্ত নৈরাশ্যে
ছুটিতে সে চিরদিন গগনের বুকে।
সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা করিবার তরে,
ঐ প্রবাসীর নেতা ধীরোদাত্ত রাম,
করিছেন ধীরভাবে গম্ভীর ক্রোকান;
ওর শিষ্য হ'তে চাও করিনা নিষেধ,
Realism নিয়ে ওরা করুন বসতি,
সাহিত্য যা Romanceরে কোলে টেনে লবে।

Realism
Independent বিপিনের বস্তুতন্ত্র ভাই,
লোহা পেটা হাতুড়ীর ঠক্ ঠক্ ধ্বনি।
ভাবমাথা উন্মাদনা কোবিদনয়নে
ইন্দ্র ধনু সম সুধা করে সদা দান;
Man lives on idea, ভাবের উচ্ছ্বাসে,
সব ভুলে মন তার দেয় সন্তরণ,
শুনিয়াছ লোক মুখে সমুদ্র মন্থন;
নিজ হৃদয়েরে ওই করিয়া মন্থিত,
বিনোদিনী সুধা মাথা তুলিয়া গরল,
মুক্ত হস্তে পাঠকেরে করিতেছে দান।
হৃদয় যেন গাইতে চায়
বেলুর মত গলাতে,
মজে যেন রইতে চায়
উদক বাষ্প কলাতে।
সাহিত্যটা যা খাঁটি জিনিষ
সরল প্রাণের কথা,
কান্তিময়ী পেলব ইহা
নব বসন্তের মাধবীলতা।

ওই গণিকা গণিকা সাপিনী
ওই গণিকা গণিকা নাগিনী,
নীতির নন্দন ওদের ক্রন্দন
শুনিতে করুন মানা,
প্রকৃত মানুষ মলিনসভায়
রবেনা হইয়া কাণা।
পাপ করেছ ডুবুক পাপে
কাছে যেতে ভয় কর,
এমনি তেজাল moral লইয়ে
ধর্ম্মবীর নাম ধর!
নবীন নবায়মান
কত্তে চাও এই প্রাণ,
শরতের সাবিত্রীরে কর বিলোকন।
কোথায় রসের খনি
শচীন্দ্র কমল মনি,
এ যে পোকরাজ আর গলিত কাঞ্চন.
এমন পরের তরে
যে নারীর অশ্রু ঝরে,
কুন্তী হ'তে এসাবিত্রী' নহে কি সুন্দর?
সেই ত সুন্দরতম
চিত্ত যার নিরুপম,
জীবন্ত করুণা যথা ছোট নিরন্তর,
ভোগেতে নাহিক তৃষা,
জানেনা বোঝেনা মৃষা,
সংযমে আবদ্ধ প্রেম উজ্জল কাঞ্চন।
ইচ্ছা করে কণ্ঠে তার,
দোলাইয়া পুষ্পহার,
চেয়ে থাকি ভক্তি ভরে সারাটি জীবন।
কারলাইল্‌কে কাত্ করা ওই,
রবি বাবুর 'কণিকা,'
তাজমহলের প্রাচীর গুলির,
রত্নময়ী লতিকা।

বীণার ভাষায় বীণার গান
ভাষা যদি থাকিত,
পরীর দেশের সম্‌জিয়ে ভাব
সর্ব্বচিত্ত নাচিত।

* * * *

Penal code গো Penal code,
তোর ভাষা কেমন আঁটা,
দোষের মধ্যে প্রতি অঙ্গে, *
সিয়াকুলের কাঁটা।
শুক বলে আমার ডিপ্‌টী
[ঐ] Penal code এর রাজা,
ডকের উপর খাড়া হসেই
পারেন দিতে সাজা।
শারী বলে আমার munsif,
অতি শান্ত ধীর।
নথির সঙ্গে নড়েন যখন
হারকিউলিশ বীর।
শুক বলে আমার ডিপটী,
T. A. আনেন যখন,
গৃহের রাণী স্মিতমুখে,
করেন আলাপন
কিছু করিতে চয়ন।
আরো শোন আমার ডিপ্‌টী
Subdivisionএর চাঁই।
পূজ্য তিনি মান্য তিনি
গণ্য সর্ব্ব ঠাঁই।
শারী বলে আমার munsif
রামের জিনিষ শ্যামকে দ্যান,
[আর] Uphold, uphold, Subjudice
বীরত্বের করেন গান।
সূতোবাচ—
শুন শুক শুন শারী কর অবধান,

* বঙ্গবাসী সম্পাদক যাহাকে মনে করিতেছেন, তিনি আমার লক্ষ্য ন'ন।

দোহাকার বিবাদের হ'ক অবসান,
পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যে ডিপুটী প্রধান।
Hobby horse'পরে এর সদা অবস্থান।
এঁর চোখে নাহি ভায় আলোর কলুষ,
বিশ্বে যেন কিছু নাই ব্যতীত কলুষ,
পদমর্য্যাদার গীতি শুনায় স্বপন,
বিনয়ের মলমলে গর্ব আচ্ছাদন।
Code থানি মহাঅস্ত্র বিধাতার দান,
পাপের বিশাল বুক হয় খানখান,
পুলিশ ডেপুটী নয়, ডেপুটী পুলিশ,
Logic মরিয়া যায় বিবাদে হরিষ,
কলিকালে তোষামোদ জন্মেছে বিস্তর,
[এরা] সাক্ষাতে ডিপুটীগান গাহে নিরন্তর।
Theology, geology যত লজি আছে,
নূতন কিছুই নহে এ প্রাণীর কাছে,
নীল, সাদা, পীত, রাঙা আছে বর্ণ নানা,
জেঁকো, ডেঁপো, ঢোকা, রোখা, তোম
তানা নানা,

আর নহে ক্রমে মাল হইতেছে কড়া
ভয় হয় পাছে হাতে কেহ দেয় দড়া।
নির্ভয়ে মুনসেফ চিত্র করি বিচিত্রিত
এ চিত্র আঁকিতে চিত্ত নাহি হয় ভীত।
নথি ঘাঁটা Maine পড়া বিতস্তি হৃদয়,
তবু তারে বলা যায় সাধু মহাশয়,
কর্পূর উপিয়া যায় পরশি পবনে,
[এর] বিবেক কর্পূর উপে কার্য্যের পেষণে,
Robbing Peter এই বাক্য জ্ঞানময়
যেই জপে, তার হয় মঙ্গল নিশ্চয়।
নাজিরের মনচোরা উঁচুদরের কামলা,
Often connives at the Violation
by his আমলা।

Blotting paper কালি চোষে,
Office চোষে কাকের তাই;
[হেথা] মশা, মাছি, টিকটিকিরও
ইহার হাতে রক্ষা নাই।
[ওরে] দেশটা হ'লকি হ'লকি হ'লকি,
Integrity কোন খানে,
ভরা কিস্তি ডুবছে যে ভাই
কর্ম্মনাশার মাঝখানে।
রামের পোলা কুশঃহ'য়েছিল
খেঁকীর বাচ্চা খেঁকী,
দস্তা দিয়ে গড়াও টাকা
নাম হবে তার মেকী।
ছুঁচোর গায়ে সুবাশ ঢেলে
দোষ লুকাব কত,
দেশের দশা ভাবতে ভাবতে
শির হয়ে যায় নত।
অনুরাগের তপ্তানলে
বার করিয়ে প্রেমের ক্বাথ,
বাপের বিয়ে দিচ্ছে ভীষ্ম
ভাই ভগ্নী ক'রে সাথ।
শুকনো প্রেমে ভেজা হাসি,
বুড়োর মুখে শোভেরে,
মন ভোমরা ঘুরে বেড়ায়;
খুদে বধূর লোভেরে।*
প্রেমের যেন কষ্টি-পাথর
কাঁচা বাগানের দীনেশে,
বাল্য বিয়ের গুণ গাহিল
বুড়ো প্রেমের আবেশে।
মুখের হাসি সবাই হাসে,
হাসতে চোখে কজন পারে?
বাল্য বিয়ের কালী কীর্ত্তন
বেশ গেয়েছিস্ আবার গারে।

* বঙ্গবাসী সম্পাদক মহাশয় যাহা ভাবিতেছেন, তাহা নহে।

গৌরী জানি ছিলে ভায়া
তখন কেমন ক'রে বল,
পূর্ব্ব রাগের দোলানিতে
উঠ্‌ত কেঁপে প্রাণ কমল ?
কত জলিয়ার প্রেম চণ্ডীদাস গান
শুনাইতে বালিকায় হ'য়ে প্রেমবান্।
অবাক নয়নে বালা চাহিয়া চাহিয়া
আলিসে বালিসে শেষে পড়িত ঢুলিয়া।
স্বপনে সে পুতুলের দিত যত্নে বিয়ে ;
ভাবিত সে দায়ীতার অকরুণ হিয়ে ;
পূর্ব্বরাগ আর রসোদগার ভাই
ওগুলো সব জল্পনা,
প্রেমটা ছিল ওষুধ খাওয়া,
ঠিক্ বল্‌ছি ভাই গল্প না।
কলাবৌ কলাবৌ কলাবৌ আছিল,
ঘোম্‌টা ছিল অৰ্দ্ধহাত,
অনেক সরিলে গল্প কর্ত্তো
'দিদি মায়ের পোয়ের ভাত।'
কঙ্কাবতী লতা আমার,
শুন্‌তে কত কাণ পেতে,
সরল প্রাণের হিল্লোল গীতি
শুনিয়া উঠ্‌তো প্রাণ মেতে।
Old fool—Old fool
আর কেন কর ভুল,
পুরাতন কথাগুলি তুলিয়ে ;
চুপ্ কর—পথ ছাড়।
ভস্মে পুরাতনে ঢালো
বিবেকেরে তোল সখা জাগিয়ে।
বৈরাগ্য ছেয়েছে দেশ,
স্বভাবে সবাই মেষ,
আত্মশক্তি নাহি খেলে পরাণে
মর্য্যাদা হ'তেছে চূর্ণ
পশুত্বে ঘিরিছে তূর্ণ
মানুষের বর্ণ নাহি বয়ানে।

শঙ্করের মত গুলো সব
দূরে ফেলো দিয়ে,
কর্ম্ম নিয়ে খেলা কর
(যদি) থাক্‌তে চাও জীয়ে।
জীবন নিয়ে বেঁচে যদি
থাক্‌তে চাও ভবে,
মরণটারে আপন ক'রে
নিতে হবে তবে।
মরণ ভয়ে জীবন যাদের
লুকায় গুহার মাঝে,
হায়রে তাদের কাঙ্গাল জীবন
বিজড়িত লাজে।
ভিক্ষার ঝুলি দাও দাও বুলি
লুটায়ে পড়ে ল্যাজ নাড়া
তবু কুম্ভকর্ণ নিদ্রামগ্ন
ক্রন্দনে নাহি দেয় সাড়া।
লাঠি ধ'রে যতদিন
ভবের হাটে চল্‌বি,
খিদের জ্বালায় জ্বলে পুড়ে
এমনি ভাবে মর্‌বি।
জীবনটারে জীইয়ে নিয়ে
খেলার মাঠে চল,
পদ ভরে কাঁপবে ধরা
কর্ব্বে টলমল।
Diplomacy—Diplomacy
তার মাঝেতে ন্যায়পরতা,
শুকিয়ে গেছে মুখের হাসি
তাইতে এমন সঙ্কুচিতা।
আমরা যাদের মি লউস্ বলি
দেখ্‌লে তাদের সজ্জ,
হাত নেড়ে নেড়ে, মুখ নেড়ে নেড়ে,
দেখালে কতই রঙ্গ।
Carsonএরই ভ্রাতৃভাবে
কুর্দ্দিনেতে স্বায় ঝরা,

বিশ্ব হ'তে লুপ্ত সুধা
মন গুলো সব বিষভরা।
সুখের জন্যে যে দেশেতে
মানুষ মানুষ খায়,
যে দেশেতে আবাল বৃদ্ধ
ম্যাখন্ পূজা চায়।
সেই দেশের idealism
বহুৎ বহুৎ আচ্ছী,
আর কাজ নাই ভেবেই রে বাপ
ভয়ে খাবি খাচ্চি।
Dyer Dyer—রং মেখেছে
নহেকো উহা কালীর বেথা,
দেড়শো বছর পরে ওহো
আমরা শিখ্লাম চরম শেখা।
চলহ সখা সবাই মেলি,
বিধির কাছে যাই,
গোঁসাই বলেন লীছার বিচার
বিধি-বিধানে নাই।
সুখের ঘরে রহগো শুয়ে
ঠাকুর জী—
কাণ কেটেছ বেশ করেছ
ভাবনা কি ?
মানুষ ছিলাম হাঁটায়ে বুকে
করে তুল্লে dodman,
Carsonএরই শক্তি থাক্‌লে
পেতে প্রভো শিরস্ত্রাণ।

শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী।

ব্রণ-বিজ্ঞান।

(ঢাকা সাহিত্য-পরিষদে পঠিত)

প্রদাহিত স্থানে পূঁজ উৎপন্ন হইয়া কোন গঠনাবলীর মধ্যে জমা হইলে তাহাকে ব্রণ বলে। পূঁজের চারিদিকে শৈল্মিক ঝিল্লির একটী আবরণ এবং তাহার চারিধারে সুস্থ মাংসাঙ্কুরের প্রাচীর বিদ্যমান থাকে।

ত্বক, মাংস, শিরা, স্নায়ু, অস্থি, সন্ধিকোষ ও মর্ম্ম, এই আট স্থানের দোষে এক বা পরস্পরের আশ্রয়ে ব্রণ জন্মিয়া থাকে। এই সব স্থানের মধ্যে ত্বক ভেদ করিয়া যে সব ব্রণ উৎপন্ন হয়, তাহা সুখসাধ্য ; অবশিষ্ট স্থানোৎপন্ন ব্রণ বিশেষতঃ যাহার আকার অস্বাভাবিক অর্থাৎ গোল নহে, তাহা কষ্টসাধ্য। ব্রণ দুই প্রকার—সদ্য ও পুরাতন। তন্মধ্যে পুরাতন ব্রণ পুরাতন প্রদাহ স্থানে বিস্তারিত বর্ণিত হইবে।

সদ্য-ব্রণ—সদ্য ব্রণ ছয় প্রকার, বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সান্নিপাতিক, রক্তজ ও আগন্তুক। ইহার মধ্যে বাতজ ব্রণ বিষমভাবে ও বিলম্বে কোন স্থানে সত্বর ও আগন্তুক ও রক্তজ ব্রণ পিত্তজ ব্রণ সদৃশ পাকিয়া থাকে।

লক্ষণ—বাতজ ব্রণে নানাপ্রকার উদ্বেগ উপস্থিত হয়, কিন্তু কোনটাই বেশী সময় স্থায়ী হয় না। সচরাচর ছেদন, ভেদন, তাড়ন, অকুঞ্চন, শেলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা, স্পর্শ শক্তির অভাব এবং ছাই, কপোত, অরুণ বা কৃষ্ণবর্ণ হয়।

পিত্তজ ব্রণ, নীল, পীত, হরিৎ, কৃষ্ণ, রক্ত, কপিল বা পিঙ্গল বর্ণ বিশিষ্ট হয় ; বিশেষতঃ ব্রণ পাকিবার সময়, শরীরে অগ্নি নিক্ষেপ করিয়াছে বলিয়া অনুমান হয়, এবং গলিয়া

গেলে ক্ষতে ক্ষারদগ্ধবৎ জ্বালা পোড়া বিদ্যমান থাকে।

কফজ ব্রণ—চুলকানীযুক্ত ও অল্প বেদনা বিশিষ্ট শীতল ও স্নিগ্ধ, শ্বেত ও পাণ্ডু বর্ণ, এবং স্তব্ধ ভাবযুক্ত। সান্নিপাতিক ব্রণে এই তিন প্রকার ব্রণের লক্ষণাবলি নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশিত হয়, এবং বর্ণ ও বেদনাদির হঠাৎ পরিবর্ত্তন হয়, ভয়ানক জালাপোড়া বিদ্যমান থাকে, রোগী অল্প সময়ের মধ্যে নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এই ব্রণ দেখিলেই সহজে অনুমান করা যায়।

রক্ত জন্য ব্রণে পিত্তজ ব্রণের লক্ষণাবলিই প্রকাশিত হইয়া থাকে।

স্রাব—ব্রণের আশ্রয় স্থানের মধ্যে এক ব্রণ উৎপন্ন হইলে, কাচা মাংসের গন্ধ বিশিষ্ট ঈষৎ পীতবর্ণ জলের মত পূঁজ নিঃসৃত হয়। মাংস মধ্যে ব্রণ জন্মিলে ঘৃতের ন্যায় ঘন শাদা পিছিল পূঁজ নিঃসৃত হয়। শিরাগত ব্রণ হইলে অস্ত্র করা মাত্রই অত্যন্ত রক্ত নিঃসৃত হইতে থাকে, অথবা জলনালীর জলনির্গমনের মতন লালা বা শ্লেষ্মা সদৃশ পিচ্ছিল কৃষ্ণবর্ণ পূঁজ ছিন্ন সূত্রের ন্যায় অতি সূক্ষধারে নির্গত হইতে থাকে। স্নায়ুগত ব্রণ হইলে স্নিগ্ধ ঘন রক্ত মিশ্রিত পূঁজ বাহির হয়। অস্থিগত ব্রণ হইলে অস্থি অসার হইয়া পড়ে, এবং ঝিনুক-ধোয়া জলের মত স্নিগ্ধ স্রাব বা রক্ত মজ্জার সহিত মিশ্রিত হইয়া বাহির হয়। সন্ধিগত ব্রণ ভাল রকম উত্থিত হয় না বা টিপিলে তাহা হইতে বিশেষ কোন স্রাব হয় না, কিন্তু গমন, আকুঞ্চন, প্রসারণ দ্বারা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কোষদেশগত ব্রণ হইলে তাহা হইতে রক্তসূত্র পুরীষ, পাতলা পূঁজ রস নিঃসৃত হয়। মর্ম্মদেশ-গত ব্রণ হইলে সেই মর্ম্ম যে জাতীয় স্রাবও সেই প্রকার হইয়া থাকে।

ইহাই স্রাবের সাধারণ নিয়ম, কিন্তু বাতাদি দোষের প্রকার ভেদে স্রাবেরও তার-তম্য হইয়া থাকে। বাতজ ব্রণ হইলে স্রাব কিছু ঠাণ্ডা ও কৃষ্ণবর্ণ হইবে। দধিমণ্ড, ক্ষার, জল বা মাংস ধৌত জলের ক্ষত স্রাবের বর্ণ হইবে।

পিত্তজন্য ব্রণ হইলে স্রাব গরম এবং গোমেদ, গোমূত্র, ছাই অথবা শাদা বর্ণ বিশিষ্ট, কষায় বা মধুর রসযুক্ত। কফ জন্য রস হইলে স্রাব শীতল এবং নবনীত মজ্জা, চাউলের গুঁড়া বা বরাহচর্ব্বি সদৃশ বর্ণ বিশিষ্ট হয়। কিন্তু কোন স্থলে হিরাকষ বা নারিকেল জল সদৃশ স্রাবও নিঃসৃত হইয়া থাকে।

রক্তজন্য বর্ণ হইলে পিত্তজ ব্রণবৎ স্রাব হয়, অধিকন্তু আমিষ গন্ধযুক্ত হইয়া থাকে। সান্নি-পাতিক ব্রণ হইলে স্রাব গরম এবং নানা বর্ণ বিশিষ্ট হয়, তবে কাঞ্জী, যকৃৎ, মুগের যুষ, কাকুড়ের রস সদৃশ বর্ণ বিশিষ্ট স্রাবই সচরাচর হইয়া থাকে।

সাধ্য, অসাধ্য, দোষ-দুষ্য ও স্থানের প্রকার ভেদে চিকিৎসাকালে এই সব ব্রণ চারি ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা সুখসাধ্য, কষ্টসাধ্য, অসাধ্য ও যাপ্য। যথাকালে প্রতিকার না হইলে সুখসাধ্য ব্রণও অসাধ্য হয়, অথবা রীতিমত চিকিৎসা হইলে অসাধ্য ব্রণও অনেক স্থলে আরাম হইয়া থাকে। রোগী যুবা, দৃঢ়, শরীর ক্লেশসহিষ্ণু ও বলবান হইলে হস্ত, পদ, ললাট, গণ্ড, স্কন্ধ, স্ফিক (পাছা) ওষ্ঠ, পৃষ্ঠ ও মুখ মধ্যে জাতব্রণ সুখসাধ্য।

রোগী বৃদ্ধ বা কৃশ, ভীরু, অল্পপ্রাণ হইলে এবং উপস্থ কর্ণ, কোষ, উদর, সন্ধি, চক্ষু, দন্ত, নাসিকা, অপাঙ্গ, জঠর, সেচনী, পার্শ্ব, কুক্ষি, বক্ষ, বগল স্তন ও অস্থিজাত ব্রণ কষ্টসাধ্য।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকেশবচন্দ্র দাস।

ভগবদ্গীতা

(খ) জ্ঞানযোগ *।

[১] জ্ঞান অনন্ত ও পরম পবিত্র জ্ঞানের ন্যায় পবিত্র বস্তু আর নাই (৪-৩৮)। যে জ্ঞান দ্বারা তুমি সকল প্রাণীকে তোমাতে অভিন্নরূপে দেখিতে পার এবং সকল প্রাণীই ঈশ্বরে অভিন্নরূপে অবস্থিত, ইহা জানিতে পার; পৃথক পৃথক সর্ব্বভূতে একই ঈশ্বর অবিভক্তরূপে বিরাজ করিতেছেন, ইহা বুঝিতে পার, তাহাই প্রকৃত জ্ঞান, বিশুদ্ধজ্ঞান (৪-৩৫||১৮-২০)। এই জ্ঞান অশেষ মঙ্গলের আকর। এই জ্ঞান মানুষে মনুষ্যত্ব প্রদান করে, চরিত্র গঠনে সহায়তা করে, ভেদাভেদ জ্ঞান দূর করে. আপন পরভাব বিদূরীত করে, হিংসা বিদ্বেষ অপসারিত করে। সমুদয় বসুধাকে আপন ও আত্মীয় করিয়া তুলে; লোকহিতে, দেশহিতে নিযুক্ত করে। তাই বলিয়া অন্য অনন্ত জ্ঞান উপেক্ষার বিষয় নহে। যতই জ্ঞানলাভ করিবে, ততই কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে পারিবে, ততই ইন্দ্রিয় সংযমের উপকারিতা বুঝিতে পারিবে, দেশ-হিতসাধনে রত হইতে পারিবে। বুঝিতে পারিবে, বুদ্ধি যার বল তার। শ্রেণী বিশেষের উন্নতিতে কোন দেশ উন্নত হয় নাই, হইবে না। এইজন্য সর্ব্বসাধারণের, স্ত্রীপুরুষ অভেদে, জাতি বর্ণ অবিচারে জ্ঞান আহরণ করা উচিত।†

[২] সমদর্শী হও। জ্ঞানীমাত্রেই সমদর্শী। একই ঈশ্বর সকলের মধ্যে অবিভক্তরূপে বিরাজ করিতেছেন (১৮-২০)। যিনি ঈশ্বরকে সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ দেখিয়া থাকেন (১৩-২৭)। সমদর্শী পুরুষ স্বীয় আত্মাকে সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বভূত স্বীয় আত্মায় দর্শন করেন (৬-২৯)। এই জ্ঞানই সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার জনক। জ্ঞানীগণ বিদ্যা ও বিনয় সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো হস্তি, কুকুর, চণ্ডাল —সকলকেই সমান জ্ঞান করেন (৫-১৮)। মৃত্তিকা, প্রস্তর, সুবর্ণে যাঁহার সমান দৃষ্টি; শত্রু মিত্র, সাধু ও অসাধুর প্রতি যাঁহার তুল্য ভাব, সকল প্রাণীর উপর যাঁহার সমভাব, তিনিই সংসার জয় করিয়াছেন, তাঁহার মন সতত ঈশ্বর সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে, এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ পুরুষ (৬-৮৯||৫-১৯)। এইরূপ মহাত্মা প্রিয়বস্তু লাভে উৎফুল্ল হন না; অপ্রিয় ঘটিলেও বিচলিত হন না (৫-২০)। তিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন না, কাহাকেও নীচ ও নিকৃষ্ট বলিয়া মনে করেন না। উর্দ্ধে উঠিলে যেমন উচ্চ নীচ পৃথিবী পৃষ্ঠ সব সমান দেখায়

---

* গীতার প্রথম ৬ অধ্যায় কর্ম্মযোগ, দ্বিতীয় ৬ অধ্যায় ভক্তিযোগ এবং শেষ ৬ অধ্যায় জ্ঞানযোগ। কিন্তু কর্ম্ম ও জ্ঞান নিত্য সম্বন্ধ বিশিষ্ট। এজন্য আমরা কর্ম্মযোগের পর জ্ঞানযোগ ও শেষে ভক্তি-যোগ ব্যাখ্যা করিতেছি।

† ইহারা সকলেই গীতা পাঠে ও শ্রবণে অধিকারী। গীতা মাহাত্ম্য ১০। বেদের রহস্য জ্ঞান। পূর্ব্বে বেদ জ্ঞানের ভাণ্ডার বলিয়া বিবেচিত হইত। এইজন্য চারিবর্ণই বেদ শ্রবণ করিতে পারিত। শান্তিপর্ব্ব ৩২৭ -৪৯।

ধর্ম্ম জীবনেও তেমনি যাঁহারা উর্দ্ধে উঠিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট বিভিন্ন ধর্ম্ম, বিভিন্নজাতি সকলই সমান জ্ঞান হয়।

[৩] বিশ্বপ্রেমে পূর্ণ হও। যিনি স্বীয় আত্মায় সমস্ত নরনারীকে দর্শন করেন এবং সমুদয় নরনারীতে স্বীয় আত্মা দেখেন, (৬-২৯), তিনি কি বিশ্বপ্রেমে, দেশ-প্রেমে মত্ত না হইয়া থাকিতে পারেন? ফলত সকলকেই আপনা হইতে অভেদ জ্ঞান করিবে (৫-৭)। সকলের সুখকে তোমার সুখ, সকলের দুঃখকে তোমার দুঃখ বলিয়া মনে করিবে (৬-৩২)। সকলকেই আপনার ন্যায় ভাল বাসিবে।* সমদর্শিতা হইতে ভ্রাতৃভাব, ভ্রাতৃভাব হইতে দেশ-প্রেম, দেশ প্রেম হইতে বিশ্বপ্রেম উৎপন্ন হইয়াছে। ঈশ্বর সকল নরনারীতেই সমভাবে বর্ত্তমান, এই সত্য শুধু জানিলে হইবে না, বুঝিলে হইবে না; জীবনে ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। সকল নরনারীই যেন অব্যক্ত ঈশ্বরের ব্যক্ত মূর্ত্তি, ইহা প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। তবেত অপরের ক্ষতি করিয়া নিজ কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে পরাঙ্মুখ হইবে। তবেত প্রেমে পূর্ণ হইতে পারিবে, সকলের হিতানুষ্ঠানে রত থাকিতে পারিবে।

[৪] তোমার নিজের সুখ দুঃখ দ্বারা তোমার কর্ত্তব্যকর্ম্ম স্থির করিতে চাহিতেছ, যদি সকলেই উহা করে, নিজ নিজ স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহা হইলে কি কোন সমাজ স্থায়ী হইতে পারে? কোন দেশ উন্নত হইতে পারে?

[৫] আবার, তুমি যাহাকে সুখ দুঃখ ভাবিতেছ, তাহা আদৌ সুখ দুঃখই নহে। আলস্য, নিদ্রা, ভ্রম ও প্রমাদ হইতে যে সুখ উৎপন্ন হয়, তাহা প্রকৃত সুখ নহে (১৮-৩৯)। বাহ্যপদার্থের সহিত ইন্দ্রিয়গণের সংযোগ হইলে যেমন শীত গ্রীষ্ম বোধ হয়; তেমনি রূপ, রস, স্পর্শাদি বাহ্য বিষয়ের সহিত চক্ষু, জিহ্বা ও ত্বকাদি ইন্দ্রিয়গণের সংযোগ হইলে সুখ দুঃখ অনুভূত হয়। অতএব শীত গ্রীষ্ম বোধের ন্যায়, বাহ্য বিষয় জনিত সুখ দুঃখ বোধও ক্ষণস্থায়ী (২-১৪)। রূপরসাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় ক্ষণস্থায়ী। কাযেই তাহারা ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে মনের মধ্যে যে সুখ দুঃখ উৎপন্ন করে, তাহাও ক্ষণস্থায়ী। সেই ক্ষণস্থায়ী ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয় অপসৃত হইলেই তজ্জনিত সুখেরও শেষ হয়, তখন দুঃখের উদয় হয়। তবেই ইন্দ্রিয় জনিত সুখ, কেবল দুঃখের কারণ মাত্র (৫-২২)। রূপ রসাদি বিষয়ে ইন্দ্রিয়গণ সংযুক্ত হইলে যে সুখবোধ হয়, তাহা প্রথমে অমৃততুল্য বোধ হয়, কিন্তু পরে বিষে পরিণত হয় (১৮-৩৮)। লোকে মোহ বা অজ্ঞানতা বশতই তাহাকে সুখ বলিয়া মনে করে, আর তাহার অনুসরণ করে। মন যদি ইন্দ্রিয়গণকে অনুকূল বা প্রতিকূল বিষয়ে প্রেরণ না করে, তাহা হইলে সুখদুঃখের বোধ আদৌ উৎপন্ন হইতেই পারেনা। অতএব এই অলীক দুঃখের ভয়ে কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে বিরত হইবে কেন? অসার সুখের স্বপ্ন দেখিয়াই বা অকর্ত্তব্য কার্য্য করিবে কেন? যিনি সুখ দুঃখকে সমান জ্ঞান করেন, তিনি কখনও মৃত্যুকে ভয় করেন না (২-১৫)।

[৬] দুঃখ জ্ঞানীকে বিচলিত করিতে পারে না। কারণ জ্ঞানীগণ বিচার বুদ্ধি দ্বারা, দুঃখ কি, দুঃখ কিরূপে উৎপন্ন হয় এবং কিরূপেই বা যায়, তাহা

* গীতা ৫-৭॥ শান্তিপর্ব্ব ৬৬—৩৬॥২৯৪—৩০॥ ৩২৬—২৯।

বুঝিতে পারেন এবং দুঃখ দূরের উপায় অবলম্বন করিতে পারেন। সুতরাং সহস্র সহস্র দুঃখের বিষয়, শত শত ভয়ের ব্যাপার একমাত্র অজ্ঞানীকেই উদ্বিগ্ন করে। মূর্খই ভয়ে কাতর হয়, দুঃখে অভিভূত হয়। মৃতের জন্য বা নষ্ট বিষয়ের জন্য দুঃখ করিলে, মৃত বা নষ্টজনিত যে দুঃখ, তদতিরিক্ত আর এক দুঃখকে আনয়ন করা হয়, এক দুঃখ দ্বারা অন্যদুঃখ বৃদ্ধি করা হয়। তাহাতে দুঃখের লাঘব হয় না, বৃদ্ধি হয়। **দুঃখের বিষয় চিন্তা না করাই দুঃখ দূরের একমাত্র উপায়।** তদ্ভিন্ন দুঃখ-দূরের আর উপায় নাই। দুঃখের কারণ উপস্থিত হইলে জ্ঞানীগণ জোর করিয়া মনকে অন্য বিষয়ে নিযুক্ত রাখেন, দুঃখ কিছুই করিতে পারেনা। সতত সৎচিন্তা, সদালাপ সৎসঙ্গ, সৎ গ্রন্থ পাঠ ও সৎকার্য্য সাধন যেমন চিত্তশুদ্ধির উপায়; তেমনি দুঃখ দূরেরও উপায় *।

[৭] সকলই চেষ্টার উপর নির্ভর করে। চেষ্টা দ্বারা দুঃখ নাশ হয়, চেষ্টা দ্বারা আত্মপ্রসাদ লাভ হয় (১৮-৩৬) অভ্যাস কর, চেষ্টা কর, 'মন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখ দুঃখে বিচলিত হইবেনা। অভ্যাস বশতঃই আমাদের মুখমণ্ডল শীতগ্রীষ্মাদি সুখদুঃখ অনুভব করে না। অভ্যাস করিলেই মনও সতত, সকল অবস্থায়, স্থির থাকিবে, কখনও বিচলিত হইবে না।

[৮] আত্মপ্রসাদই প্রকৃত সুখ। তাহা বাহিরের বিষয় সাপেক্ষ নহে, সুতরাং ক্ষণস্থায়ী নহে। তোমার চরিত্র—কর্ম্ম, জ্ঞান ভক্তি দ্বারা বিশুদ্ধ হইলে, মহোজ্জ্বল হইলে, তোমার হৃদয় কন্দর হইতে এক বিমল সুখের উৎস উত্থিত হইবে, তখন আত্মা দ্বারায় আত্মাতেই অনুপম আনন্দ অনুভব করিবে (২-৫৫)। তখন আত্মাতেই রতি, আত্মাতেই তৃপ্তি, আত্মাতেই আনন্দ হইবে (৩-১৭)। এই আত্মপ্রসাদলাভের চেষ্টা অগ্রে বিষতুল্য বোধ হয়, শেষে অমৃতবৎ জ্ঞান হয়। এই আত্মপ্রসাদ জনিত সুখই প্রকৃত সুখ (১৮-৩৭)। অভ্যাস দ্বারা এই সুখকে বৃদ্ধি করা যায় এবং দুঃখকে নাশ করা যায় (১৮-৩৬)। এই আত্মপ্রসাদ যাঁহার আছে; তিনি প্রিয়জন বিয়োগ ভয়ে বিষণ্ণ হন না, বিপদে বিচলিত হন না, পাপে প্রবৃত্ত হন না।

[৯] লোক কিরূপে পাপে প্রবৃত্ত হয়। জগতে যত বিষয় আছে, তাহারা পাঁচ ভাগে বিভক্ত। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ। আমরা চক্ষুদ্বারা রূপ, জিহ্বা দ্বারা রস, নাসিকা দ্বারা গন্ধ, কর্ণ দ্বারা শব্দ ও ত্বক দ্বারা স্পর্শ অনুভব করি। এই চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা, কর্ণও ত্বক আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়। ইহারা এবং মন, বুদ্ধিও আত্মা এই আটটী আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়। আমাদের যে কোন প্রকার জ্ঞান জন্মে, উহা তাহাদেরই সাহায্যে জন্মে। কোন একটী ইন্দ্রিয়, আর মন, বুদ্ধিও আত্মা এই চারিটী কোন এক বিষয়ে সমকালে বর্ত্তমান না থাকিলে, সেই বিষয়ে জ্ঞান জন্মিতে পারেনা। মন একটী ইন্দ্রিয়কে রূপ রসাদি তাহার নিজের বিষয়ে প্রেরণ করে। পরে সেই বিষয়ের বুদ্ধি বা

* অনেকে প্রত্যহ গীতা পাঠ করেন, গীতা পকেটে করিয়া বেড়ান, কিন্তু গীতার মর্ম্মানুসারে চরিত্র গঠন করেন না। আর অপরগণ গীতা পাঠ করেন না, কিন্তু গীতানুযায়ী চরিত্র গঠন করিয়া থাকেন। তাঁহারা পিতা পুত্র স্বামী প্রভৃতির মৃত্যুতে শোকে অধীর হন না, আবার স্বদেশের জন্য অকাতরে প্রাণ দান করেন। এ সম্বন্ধে মন্মথনাথ ঘোষ প্রণীত 'নব্যজাপান' দ্রষ্টব্য।

জ্ঞান আত্মায় উৎপন্ন হয়। এই জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ার পর, তাহা মনের মধ্যে যত প্রকার কুপ্রবৃত্তির উদয় করে, তাহারা ছয় ভাগে বিভক্ত। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য। তাহারা মানুষের ঘোর শত্রু বলিয়া বড় রিপু নামে পরিচিত। চক্ষু কর্ণাদির সাহায্যে রূপ, শব্দাদির বিষয় জ্ঞান আত্মায় উৎপন্ন হইলে যদি উহা অনুকূল হয়, তাহা হইলে তাহাতে সুখ বোধ হয়; যদি প্রতিকূল হয়, তাহা হইলে তাহা দুঃখ বোধ হয় (৩-৩৪)। যদি তাহাতে সুখ বোধ হয় তাহা হইলে রূপ শব্দাদি সেই বিষয় চিন্তা করিতে ইচ্ছা হয়। সেই চিন্তা হইতে সেই বিষয়ের আসক্তি জন্মে। আসক্তি হইতে সেই—রূপ শব্দাদি বিষয় ভোগ করিতে ইচ্ছা হয়। এই বিষয় ভোগের ইচ্ছাকে কাম বলে। এই কাম লোভকে উৎপন্ন করে। লোভ বাধা প্রাপ্ত হইলেই ক্রোধকে উৎপাদন করে। ক্রোধ হইলে মোহ বা অজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। মোহ হইলে কোন্‌টী কর্ত্তব্য, কোন্‌টী অকর্ত্তব্য, তাহার স্মৃতি নষ্ট হয়। স্মৃতি নষ্ট হইলেই বুদ্ধিনাশ হয়। তখন লোকে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া কুকার্য্যে রত হয়, পাপে প্রবৃত্ত হয় এবং নিজের সর্ব্বনাশ নিজেই করে (২-৬২।৬৩)।

[১০] পাপ হইতে পরিত্রাণের উপায় আছে। তাহা কি?

(১) প্রথমে কামকে সংযত করিবে। ধুম যেমন অগ্নিকে আবৃত করিয়া রাখে, ধুলি যেমন দর্পণকে ঢাকিয়া রাখে, কামও তেমনি জ্ঞানকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখে (৩-৩৮)। মনে ভোগ বাসনার উদয় হইলে, তাহা হিতাহিত জ্ঞানকে ঢাকিয়া ফেলে। লোকে ভোগবাসনায় বিচলিত হইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করে। এই কাম অতিশয় প্রবল রিপু (৩-৩৭)। তাহা লোকের ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে পরাজিত করিয়া, জ্ঞান হরণ করিয়া লোককে বিপথগামী করে (৩-৪০)। লোকে সুখভোগের লালসায় সকল প্রকার কুকার্য্যই করে। অতএব মনের মধ্যে যত প্রকার অবৈধ সুখভোগের বাসনা উদিত হইবে, সে সকলকে তখনই সংযত করিবে (২-৫৫)। সুখভোগের জন্য মনে যাহাই উদিত হইবে, তাহাই কদাচ করিবে না। কিরূপে এই কামকে বশীভূত করা যায়? (ক) রূপ রসাদি বিষয় ভোগজনিত সুখ প্রথমে অমৃত বলিয়া বোধ হয়। ইহাই মোহ। কিন্তু শেষে তাহা বিষ বলিয়া প্রমাণিত হয় (১৮—৩৮)। ইহাই জ্ঞান। সেজন্য সতত রূপ রসাদি বিষয়ের দোষ দর্শন করিবে। তাহা হইলে জ্ঞান প্রবল থাকিবে, মোহকে দমন করিয়া রাখিবে। ইহাই কামজয়ের সর্ব্বপ্রধান উপায় (৩—৪৩)। (খ) ইন্দ্রিয়গণ, মন ও বুদ্ধি বশীভূত থাকিলে কাম প্রবল হইতে পারে না (৩—৪০।৪১)। মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত রাখিতে হইবে। মনই ইন্দ্রিয়গণকে তাহাদের বিষয়ে প্রেরণ করে। মন বশে থাকিলে, চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণও বশে থাকে। যেই কুদৃশ্য চক্ষুর সম্মুখে পড়ে, সেই যদি মন চক্ষুকে অন্যদিকে লইতে পারে; তাহা হইলে বিপদ কাটিয়া যায়। এইরূপ মনের দ্বারা চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিতে পারিলে, তাহাদের বিষয় যে—রূপ ও শব্দাদি তাহাতে ইন্দ্রিয়গণ স্বেচ্ছামত বিচরণ করিতে পারে না, সুতরাং মনের মধ্যে কামক্রোধাদি ষড়রিপুকেও উৎপন্ন করিতে পারে না।

রিপুগণ এইরূপে উত্তেজিত না হইলে মানুষও কখনও অন্যায় কার্য্য করিতে পারে না। (গ) কাম ও বস্তু অনন্ত ও তাহা যতই ভোগ করা যায়, ততই নিত্য নূতন কাম্যবস্তু ভোগ করিতে বাসনা, ঘৃতাহুতি অনলের ন্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সে বাসনা কখনও পরিতৃপ্ত হয় না, সুতরাং সুখেরও সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। ইহা স্পষ্ট বুঝিলে কাম শান্ত হয়। নিবৃত্তিই কামজয়ের উপায়; নিবৃত্তিতেই তৃপ্তি, লোভে নহে, ভোগে নহে। (ঘ) কুদৃশ্য, কুসঙ্গীত, কুপাঠ্য, কুআলাপ, কুচিন্তা এককালে পরিত্যাগ করিবে। তাহারাই কামের সহায়। এইরূপে কামকে সংযত করিতে পারিলে তাহা আর লোভকে উৎপন্ন করিতে পারে না। লোভ না হইলে ক্রোধও হয় না। ক্রোধ না হইলে মোহও হয় না। মোহ না হইলে মদ মাৎসর্য্যও জন্মিতে পারে না। পাপের পথেও প্রবৃত্ত করিতে পারে না।

(২) কামের পর যদি লোভের উদয় হয়, তবে উহাকে দমন করিবে। কি উপায়ে লোভকে দমন করা যায়? (ক) সর্ব্বদা প্রলোভন হইতে দূরে থাকিবে। (খ) লোভের অন্ত নাই, যতই লোভের বশবর্ত্তী হওয়া যায়, ততই নিত্য নূতন লোভ আসিয়া জুটে, কিছুতেই তৃপ্তি হয় না। ইহা বুঝিলে লোভ দমন হয়। (গ) যত পার, তোমার অভাব কমাইতে চেষ্টা করিবে। অপরের দেখাদেখি বিলাস বৃদ্ধি করিবে না। (ঘ) লোভের বিষয় উপস্থিত হইলেই ভাবিবে, এই লোভে পড়িলে তোমার কি পরিণাম হইবে, লোভ পরিত্যাগ করিলেই বা কি উপকার হইবে। এইরূপ বিচার-বুদ্ধি থাকিলে লোভ প্রবল হইতে পারে না। (ঙ) লোভের দ্বারা যে সুখের উদয় হয়, তাহার আদি আছে, অন্ত আছে, সুতরাং ক্ষণস্থায়ী। তাহার শেষ হইলেই দুঃখের উদয় হয়। জ্ঞান-বলে ইহা হৃদয়ঙ্গম হইলে লোভ বিচলিত করিতে পারে না। (চ) প্রস্ফুটিত পদ্মফুল দেখিলে, যেই উহা তুলিতে লোভ হয়, সেই যদি মনে কর যে সেই পদ্মবনে সর্প আছে, কুম্ভীর আছে, তাহা হইলে সেই লোভ তখনই অদৃশ্য হয়। এমন লোভের বিষয় কি আছে, যাহার পশ্চাতে ভয়ঙ্কর বিপদ, বিষম দুঃখ লুকাইয়া নাই? মৎস্য যেমন খাদ্যের লোভে লৌহ বড়িশ গ্রাস করিয়া প্রাণ হারায়, মানুষও তেমনি লোভে পড়িয়া যাহা পায়, তাহাই গ্রাস করিয়া আজীবন দুঃখ পায়। (ছ) যখনই মনে লোভাদির উদয় হইবে, তখনই মনকে অন্য বিশুদ্ধ বিষয়ে লইয়া যাইবে। সৎচিন্তা, সদালাপ, সৎসংসর্গ, সৎগ্রন্থ পাঠ ও সৎকার্য্য লোভ দমনের উপায়। (জ) কখনও অলস ভাবে বসিয়া থাকিও না, কখনও মনকে শূন্য রাখিও না। সতত কার্য্য করিবে। কার্য্য না থাকিলে সৎচিন্তা করিবে। (ক) ঈশ্বরই সকল নরনারীতে বর্ত্তমান (১৮—২০)। ঈশ্বরই রমণীর সৌন্দর্য্য (১০—৩৪)। অতএব রমণীর মাধুর্য্য, ফুলের সৌন্দর্য্য, অপরের ঐশ্বর্য্য দেখিলে, সে সকলের মধ্যে ঈশ্বরকে দর্শন করিবে। (ঞ) তোমাতেও ঈশ্বর বর্ত্তমান। তুমিও ঈশ্বরের অংশ। তুমি নীচ নহ, নিকৃষ্ট নহ। তোমার দেহ ঈশ্বরের পবিত্র মন্দির। হৃদয়ে এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলে লোভাদি কোন রিপুই প্রবল হইতে পারে না।

৩। লোভের পর যদি ক্রোধের উদয় হয়, তবে তাহাকে শান্ত করিবে। (ক) ক্ষমা দ্বারা ক্রোধকে দমন

করিবে। (খ) ক্রোধের উত্তেজনাকারী বিষয় বা ব্যক্তি হউক সতত দূরে থাকিবে। (গ) ক্রোধ অন্তে স্বীয় দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। (ঘ) কাম, লোভ ও অহ-ঙ্কারকে দূরে রাখিতে পারিলে ক্রোধও দূরী-ভূত হয়। (ঙ) যাহাতে কোন কারণে ক্রোধের উদয় না হয়, সর্ব্বদা এইরূপ সতর্ক থাকিবে। ক্রোধ অতি প্রবল রিপু (৩—৩৭)। কাম, ক্রোধ ও লোভ, এই তিনটীই নরকের দ্বার, অধঃপতনের পথ। ইহাদিগকে পরি-ত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইলেই মানুষ উন্নতির পথে ধাবিত হয় (১৬—২১।২২)। যিনি দুর্জ্জেয় কাম ক্রোধের বেগ সম্বরণ করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত যোগী, প্রকৃত সুখী (৫—২৩)।

(৪) যদি ক্রোধের পর মোহ উপ-স্থিত হয়, তবে তাহাকে জ্ঞান দ্বারা দূর করিবে। মোহই সকল পাপের মূল। মোহ হইলেই লোকে ন্যায় অন্যায় নির্ণয় করিতে পারে না, কুকার্য্যকে আর কুকার্য্য বলিয়া বুঝিতে পারে না। তখন কুকার্য্য করিয়া বসে।

(৫) মদ বা অহঙ্কার অবশ্য পরিত্যাজ্য। আত্মপরীক্ষা ও আত্মদোষ দর্শন এবং গুণী-গণের গুণ হৃদয়ঙ্গম করা অহঙ্কার দূর করিবার উপায়।

(৬) মাৎসর্য্য বা পরশ্রীকাতরতা অহঙ্কার হইতে পুষ্টিলাভ করে, প্রেম হইতে বিলয় প্রাপ্ত হয়। যে মনে করে, আমিই সকল গুণের আধার,সেই অপরে কোন গুণ দেখিলে সহ্য করিতে পারে না, পরশ্রীতে কাতর হয়, ঈর্ষায় পূর্ণ হয়, পরনিন্দায় প্রবৃত্ত হয়। সে যদি সকলকে ভালবাসিতে পারে, তাহা হইলে তাহার মাৎসর্য্য দূর হইয়া যায়। কোন কুপ্রবৃত্তি দমন করিতে হইলে, তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত যে সৎপ্রবৃত্তি, তাহাকে বর্দ্ধিত করিবে। তাহা হইলে সেই সৎপ্রবৃত্তি কুপ্রবৃত্তিকে দমন করিয়া রাখিবে।

(৭) এই ষড়্‌রিপুর তাড়নায় মানুষ ভ্রান্ত হইতেছে, যাহা অকর্ত্তব্য তাহাই কর্ত্তব্য ভাবিয়া করিতেছে, আর দুঃখ দুর্দ্দশায় বিধ্বস্ত হইতেছে। যদিও দুর্দ্দমনীয় ইন্দ্রিয়গণ এমনই প্রবল যে বিবেকবান ব্যক্তির মনকেও বল-পূর্ব্বক পরাজিত করে (২—৬০), তথাপি তাঁহারা মনের দ্বারা, চেষ্টা দ্বারা, সাধনা দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া রাখেন (২—৬১) কখনও ইন্দ্রিয়গণের বশীভূত হন না। কূর্ম্ম যেমন তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শরীর মধ্যে সংযত করিয়া রাখে, তাঁহারাও তেমনি রূপ রসাদি বিষয় হইতে তাঁহাদের ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া রাখেন (২—৫৮)। দীর্ঘ উপবাসে বা কঠিন পীড়ায় যাঁহাদের শক্তি নষ্ট হয়, তাঁহাদের ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত হয় সত্য, কিন্তু তাঁহাদের মন বিষয় ভোগবাসনায় পূর্ণ থাকে। কিন্তু জ্ঞানীগণ, শ্রেষ্ঠ কি, কর্ত্তব্য কি, তাহা বুঝিয়া, সামর্থ্যসত্ত্বেও রূপরসাদি বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া রাখেন (২—৫৯)। অতএব রূপ, শব্দাদি বিষয় হইতে চক্ষু, কর্ণ-আদি ইন্দ্রিয়গণকে অবশ্য সংযত করিবে (২—৬৮)। যাহার মন বশীভূত নহে, ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত নহে, তাহার দুর্দ্দশার সীমা নাই। ঝটিকা সমুদ্র মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র নৌকাকে যেমন অনায়াসে উড়াইয়া লইয়া চলে, সেই-রূপ উচ্ছৃঙ্খল মন ও উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়গণ লোককেও এক প্রকার বিষয় ভোগ হইতে অন্য প্রকার বিষয় ভোগে উড়াইয়া লইয়া চলে ও বুদ্ধি হরণ করে (২—৬৭)। যাহার মন ও ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত নহে, তাহার বুদ্ধি

নাই; যাহার বুদ্ধি নাই, সে হিতাহিত চিন্তা করিতে পারে না। যে সে চিন্তা করিতে পারে না, তাহার শান্তি নাই; যাহার শান্তি নাই, তাহার সুখও নাই (২—৬৬)। নানা দিক্ দেশান্তর হইতে বহু নদ নদী আসিয়া সুগভীর সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইলেও, সমুদ্র যেমন স্থির ও শান্ত থাকে, সেইরূপ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণের মনের মধ্যে রূপরসাদি বিষয় প্রবিষ্ট হইলেও তাঁহাদিগকে বিচলিত করিতে পারে না। এইরূপ মহাত্মারাই প্রকৃত শান্তির অধিকারী। যিনি ভোগবাসনায় অস্থির, তিনি সে শান্তি কোথায় পাইবেন (২—৭০)? অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে, সর্ব্বাগ্রে আত্মা দ্বারা বুদ্ধিকে স্থির করিবে। পরে সেই বুদ্ধি বা জ্ঞানের দ্বারা হিতাহিত বিচার, বুদ্ধি দ্বারা মনকে সংযত করিবে। তৎপরে মনের দ্বারা চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিবে। তাহা হইলে ষড়রিপু বশীভূত হইবে। ষড়রিপু বশীভূত হইলে, পাপের প্রবৃত্তিও পলায়ন করিবে। আবার যদি কেহ পূর্ব্বে পাপে প্রবৃত্ত হইয়া শেষে জ্ঞানলাভ করিতে পারে, তাহা হইলে সেই জ্ঞানের সাহায্যে পূর্ব্বোক্ত উপায়ে ইন্দ্রিয়গণকে ও রিপুগণকে বশীভূত করিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারে।*

(৮) ইন্দ্রিয়গণকে একেবারে বিনষ্ট করিতে হইবে না, তাহা হইলে সংসার চলিতে পারে না, ঈশ্বরের সৃষ্টি ও সমাজ রক্ষা হয় না। মনকে বশীভূত করিয়া, ইন্দ্রিয়গণকে মনের অধীন করিয়া, অনাসক্তভাবে বিষয় ভোগ করিবে (২—৬৪)। ইন্দ্রিয়গণকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিয়া সৎপথে, মঙ্গলের পথে পরিচালিত করিয়া, সংসারে থাকিয়া বিষয় ভোগ করিবে। যে বিষয় মনকে উন্নত করে, দেশোপকারে নিযুক্ত করে, দেশের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করিতে প্রবৃত্ত করে, সে বিষয় অবশ্য ভোগ করিবে, সে বিষয়ে মনপ্রাণ অবশ্য অর্পণ করিবে। ক্ষমতা সত্ত্বেও যিনি তাহা না করেন, তিনি কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা জনিত অধর্ম্মে পতিত হন, পাপাচারীর পাপের ভাগী হন। কিন্তু সাবধান, মনে যেন বিকার প্রাপ্ত না হয়। মনকে স্থির, ধীর ও প্রশান্ত রাখিয়া, কাম ক্রোধের অতীত হইয়া, একমাত্র কর্ত্তব্য বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়া তাহা করিবে। কিন্তু কদাচ অবৈধ বিষয় ভোগ করিবেনা, অবৈধ উপায়েও নহে। যাহা অবনতির সহায়, অধঃপতনের কারণ, তাহা হইতে সকল সময়ে সর্ব্বতোভাবে দূরে থাকিবে।

এইরূপ জ্ঞানীই প্রকৃত জ্ঞান-যোগী। এইরূপ আদর্শ জীবন গঠন করিবার জন্য ভক্তিরও একান্ত আবশ্যক।

শ্রীবাঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী।

* কুরঙ্গ—মাতঙ্গ—পতঙ্গ—ভৃঙ্গ—মীনাঃ হতাঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ। এক প্রমাদী স কথং ন হন্যতে যঃ সেবতে পঞ্চভিরেব পঞ্চ? (গরুড় পুরাণ)। হরিণ ব্যাধের বংশীধ্বনিতে ভুলিয়া—একমাত্র কর্ণেন্দ্রিয়ের দাস হইয়া বিনষ্ট হয়। বন্য হস্তী পালিত হস্তিনীর শরীর স্পর্শ সুখে লোভ করিয়া একমাত্র ত্বগেন্দ্রিয়ের দাস হইয়া বন্দী হয়, মৃতপ্রায় হয়। পতঙ্গ অগ্নির সৌন্দর্য্যে ভুলিয়া একমাত্র চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দাস হইয়া পুড়িয়া মরে। ভৃঙ্গ পদ্মগন্ধে মুগ্ধ হইয়া একমাত্র নাসিকাইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া পদ্মে প্রবেশ করে, সন্ধ্যাকালে পদ্ম মুদিত হইয়া তাহাকে বন্দী ও বিনষ্ট করে। মৎস্য একমাত্র জিহ্বা ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া লৌহ বড়িসা গ্রাস করিয়া পঞ্চত্ব পায়। হায়, হরিণ, হস্তী, পতঙ্গ, ভৃঙ্গ ও মৎস্য এই পঞ্চ প্রাণী এক একটী ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া বিনষ্ট হয়, যে ব্যক্তি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দাস, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সেবায় রত, সে কেন না বিনষ্ট হইবে?

উত্তররামচরিতের দ্বিতীয়াঙ্ক।

দ্বিতীয়াঙ্কের বিষ্কম্ভকে বনদেবতা বাসন্তী ও অধ্বগবেশা আত্রেয়ীর মিলন। বাসন্তী সীতার প্রাণ-প্রিয়তমা সখী পঞ্চবটী বাসের বিশ্রম্ভসাক্ষী সহচারিণী। আত্রেয়ী পুরাণ ব্রহ্মবাদী বাল্মীকির শিষ্যা স্বয়ং ব্রহ্মচারিণী ব্রহ্মজ্ঞা নারী। বাসন্তী রসময়ী সত্ত্বগুণময়ী প্রবৃত্তি। আত্রেয়ী শান্তিময়ী সুকোমলা নিবৃত্তি। বাসন্তীকে দেখিলে মনে হয় যেন প্রকৃতিরাণীর জীবন্ত প্রতিমা মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দিয়াছে। আত্রেয়ীকে দেখিলে মনে হয় সংযত ব্রহ্মচারিনীর পবিত্র স্ত্রী আকৃতি ধরিয়া পৃথিবীতলে সঞ্চারিনী হইয়াছে।

উভয়ের মিলন বাস্তবিকই বড় সুন্দর। আত্রেয়ী বাল্মীকি আশ্রমের কথা, নবদূর্ব্বা দলশ্যাম যমজ শিশুর কথা পাড়িলেন। তাহাদের কৃষ্ণ ঈষদারক্ত নয়ন আরক্তিম পল্লবনিভ ওষ্ঠাধর, মৃণাল শুভ্র ললাট, ভ্রমর কৃষ্ণ কাকপক্ষ আর আজন্ম সিদ্ধ জৃম্ভকাস্ত্র বিজ্ঞান আমাদের মানসনেত্রে ফুটিয়া উঠিল। আত্রেয়ী উপনীত প্রদীপ্ত প্রজ্ঞ ক্ষত্রিয় কুমার দ্বয়ের সহিত আপনার সহাধ্যয়নযোগের প্রসঙ্গ তুলিলেন ; জানাইলেন যে সে অধ্যয়ন যোগ আর থাকে না। মহর্ষি রামায়ণ প্রণয়নেই ব্যস্ত রামায়ণের অধ্যাপনায় ও স্বয় শিক্ষায় মহর্ষির অতীব আগ্রহ এই দুইটী কারণে তথায় পাঠের বড়ই বিঘ্ন। তজ্জন্য আত্রেয়ী বাল্মীকি আশ্রম ত্যাগ করিয়া, কত বৃক্ষলতাসমাচ্ছন্ন বনজঙ্গল অতিক্রম করিয়া, কত গিরিনদী পার হইয়া অগস্ত্যের আশ্রম অভিমুখে যাত্রা করিতেছেন। পথিমধ্যে বনদেবতা বাসন্তীর সহিত সাক্ষাৎ।

আত্রেয়ীকে পথশ্রমে ক্লান্তা, রৌদ্রতাপে তাপিতা দেখিয়া বনদেবতা বাসন্তী ফল-কুসুমার্ঘ্যদ্বারা তাহার অর্চ্চনা করিলেন ; "এই বন যথেচ্ছ ভোগ করুন আজ আমার সুদিবস "এই বলিয়া সাদর সম্ভাষণ জানাইলেন। তরুচ্ছায়া আসন, স্বচ্ছবারি পাদ্য ফলমূল ভোজ্য, মধুর বাণী ভোজনদক্ষিণা রূপে নির্দ্দিষ্ট হইল ; বাসন্তীর এই আতিথেয়তা বিনয় মধুর নম্র ব্যবহার, স্বভাবতঃ কল্যাণময়ী প্রকৃতি, নিদাঘ ক্লান্তা আত্রেয়ীর নিকট তরুচ্ছায়া শীতল বারিও ফল মূল অপেক্ষা উপভোগ্য বোধ হইল। বাসন্তী স্নেহে মন্দাকিনী, পবিত্রতায় গোমুখী, মাধুর্য্যে অপরাজিতা সরমে বনযূথিকা। তার বর্ণ চম্পকের মত, তার আলাপ স্বর্গসঙ্গীতের মত, ব্যবহার অমৃতের মত। বাসন্তীর আত্রেয়ী সহ মিলনেও কথোপকথনে জানিতে পারা গেল—যমজ শিশু দুইটী সীতার, লবকুশ তাহাদের নাম, বাল্মীকি আশ্রমে তাহাদের শিক্ষা। আরও জানিতে পারা গেল—সীতা বিসর্জ্জন দিয়া সীতাবল্লভ রামচন্দ্র সীতারই স্বুবর্ণময়ী প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করিয়া তাহাকেই সহধর্ম্মচারিনীরূপে পার্শ্বে রাখিয়া অশ্ব মেধ যজ্ঞে ব্রতী হইয়াছেন। পরিশেষে ধূমপায়ী তপস্যারত শূদ্রমুনির তপশ্চরণ ফলে ব্রাহ্মণ-বালকের অকাল মৃত্যু, এই দৈববাণীর ফলে অযোধ্যাপতি তাহার অন্বেষণার্থ দণ্ডকারণ্যে সমাগত হইতেছেন ইহা জানাইয়া দিয়া আত্রেয়ী চলিয়া গেল।

দণ্ডধারীরূপে রামচন্দ্র পুষ্পক রথে আরোহণ করিয়া দণ্ডকারণ্যে সমাগত। সম্মুখে ধূমপ শূদ্র কুলতিলক শম্বুক মুনি তপস্যারত।

কি তার কঠোর তপস্যা? করুণাময় রামচন্দ্র সদয়োত্থিত খড়্গ হস্তে শাসনকর্ত্তৃরূপে দণ্ডায়মান। রামচন্দ্রের কুসুমসুকুমার উদারপ্রাণ দণ্ড দিতে চাহে না, দৃঢ়বদ্ধমুষ্টি হস্ত হইতে তরবারি আদৌ উঠিতে চাহে না। প্রাণ বলিতেছে, "যেন এ দণ্ড নহে; হত্যা।" প্রাণ যাহাই বলুক, এ কার্য্য করিতে তিনি বাধ্য। নিজের ধারণা ও বিবেচনার উপর কার্য্য করা রাজার পক্ষে সকল সময়ে সম্ভব নহে। সে অধিকার তাঁর কোথায়? তিনি রাজা, দেশের দণ্ডমুক্তের কর্ত্তা। প্রজা সাধারণের তিনিই যে প্রতিনিধি। শাস্ত্র দেশাচারের তিনিই যে রক্ষক। দেশের শাস্ত্র যাহা বলে, আচার যাহার পোষকতা করে, দৈববাণী যার সমর্থন করে—তাহার বিরুদ্ধে কার্য্য করিবার ক্ষমতা রাজার থাকিতে পারে না। নিজের বিবেক, নিজের সহানুভূতি, নিজের ধারণা, নিজের দুর্ব্বলতার জন্য প্রজার মুখের দিকে তাকাইবেন না? তাই করুণাময় জগৎপতি শম্বুকের সম্মুখে সদয়োত্থিত খড়্গ হইয়া বলিতেছেন—

"রে হস্ত দক্ষিণ! মৃতস্য শিশোর্দ্বিজস্য
জীবাতবে বিসৃজ শূদ্রমুনৌ কৃপাণম্।
রামস্য গাত্রমসি দুর্ব্বহগর্ভখিন্ন—
সীতাপ্রবাসনপটোঃ করুণা কুতস্তে?"

রে দক্ষিণ হস্ত, মৃত ব্রাহ্মণ বালকের প্রাণ রক্ষার জন্য এই শূদ্রমুনির উপর অস্ত্রক্ষেপ কর। তুমি রামের গাত্র, দুর্ব্বহগর্ভভারখিন্না সীতার নির্ব্বাসনে নিপুণ তোমার আবার করুণা কোথায়? সীতা বিসর্জ্জনের মত এই শম্বুকমুনি বধ করিতেও রামের প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছিল। সীতা বিসর্জ্জন যে বৃত্তির কার্য্য, শম্বূক বধও সেই একই বৃত্তির জন্য। দুইই কঠোর কর্ত্তব্যপালন। দুইই প্রজানুরঞ্জনের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন। দুইই লোকারাধনা ব্রতপালনের জন্য আত্মবলি। দুইটীর একটি স্থায়ী, অপরটী ক্ষণিক। দয়াল রামচন্দ্র কোনরূপে অস্ত্রাঘাত করিয়া (কথঞ্চিৎ প্রহৃত্য) গভীর মর্ম্ম বেদনায় বলিয়া উঠিলেন, "কৃতং রামসদৃশং কর্ম্ম অপি জীবেৎ স ব্রাহ্মণপুত্রঃ।" রামসদৃশ কার্য্যও করা হইল; এক্ষণে ব্রাহ্মণকুমার বাঁচিবে ত? এ অস্ত্রাঘাত শম্বূকের দেহের উপরই পড়িয়াছিল; কিন্তু রামচন্দ্রের পড়িল ব্যথা কাতর চিত্তের উপর।

এ স্থলে শূদ্রমুনির তপস্যার ফলে ব্রাহ্মণ বালকের অকালমৃত্যু, তাহার শিরশ্ছেদেই অকালমৃত্যুর নিবারণ—এই দৈববাণীর উপর অবশ্য রামচন্দ্রের বিশ্বাস থাকিতে পারে, কিন্তু এই নৃশংস কার্য্যের ফল এত শুভ—ইহা বিশ্বাস করিতে তাঁহার কোমলার্দ্র চিত্ত, উদারপ্রাণ প্রস্তুত ছিল না, তাহা বোঝা যায়।

শূদ্রমুনির পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল তপনোদয়ে কুজ্ঝটিকার মত, মুহূর্ত্তেই মিলাইয়া গেল। শম্বূকও তৎক্ষণাৎ দিব্যদেহ লাভ করিয়া রামচন্দ্রের সম্মুখে দেখা দিলেন। ব্রাহ্মণ-শিশুর জীবনলাভের সংবাদ দিয়া আপনার এই পরম সমৃদ্ধির পরিচয় দিয়া শম্বূক রামচন্দ্রের ব্যথিত ও সংশোয়িতচিত্ত শীতল ও আশ্বস্ত করিলেন। রামচন্দ্র শম্বূককে আপনার গভীর আনন্দ, প্রগাঢ় সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া আনন্দময় পবিত্র বৈরাজ লোকে গমন করিবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন। রামচন্দ্রের কৃপাই এই সমৃদ্ধির সাক্ষাৎ কারণ, শম্বূকের এ বিশ্বাস ছিল। এরূপ গভীর বিশ্বাস না থাকিলে কি শূদ্র শম্বূক এক জন্মেই মুক্ত হ'তে পারে? দেশের নিয়ম ও শাস্ত্রের আদেশের বিরুদ্ধে রাজদণ্ড উপেক্ষা করিয়া তপস্যারত হওয়ায় শম্বূকের

অসামান্য তপস্যানুরাগ ছিল জানিতে পারা যায়।

চিরপরিচিত দণ্ডকারণ্যের প্রতি রামের দৃষ্টি পতিত হইল। সেই প্রীতিবিশ্রম্ভ সাক্ষী ভূতপূর্ব্ব ঘরালয় জন্মস্থান দণ্ডকারণ্য। এক-দিকে স্নিগ্ধশ্যাম, অপরদিকে ভীষণ বিস্তার কর্কশ ভূমিভাগ। স্থানে স্থানে নির্ঝরের ঝঙ্কতরবে দিক্‌সমূহ মুখর! কোথায় পুণ্যক্ষেত্র আশ্রম, কোথাও গিরিনদী বন উপবন স্ফুট দৃশ্যমান।

উত্তররামচরিতের দ্বিতীয়াঙ্কের স্বাভাবিক প্রকৃতি বর্ণনায় ভবভূতির আশ্চর্য্য কবিত্ব-শক্তির বিকাশ। আদিরসে ভবভূতি কালি-দাসের নিম্নে হইতে পারেন, কিন্তু রৌদ্র, বীভৎস, বিস্ময় ও ভয়ানক রসে ভবভূতির স্থান কালিদাসের উর্দ্ধে—ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। "মধুরে কালিদাস, উৎকটে ভবভূতি" ইহা সূক্ষ্ম সমালোচকের বাণী।

উত্তররামচরিতে দ্বিতীয়াঙ্কের প্রকৃতি বর্ণনার সহিত রামচন্দ্রের মনোবৃত্তি যেন এক সুরে বাঁধা আছে। প্রাকৃতিক বর্ণনা ও রামচন্দ্রের মনোভাবের এই আশ্চর্য্য সাদৃশ্য বাস্তবিকই বড়ই উপভোগের জিনিষ। রামের মনোবৃত্তির ত্রিতন্ত্রীতে যখন যে সুর উঠিয়াছে, প্রকৃতি বর্ণনার তারে তারে সেই সুরের ঝঙ্কার শোনা গিয়াছে। রামের হৃদয়বীণায় যখন যে রাগিণী বাজা আবশ্যক হইয়াছে, প্রকৃতির যন্ত্রে ঠিক সেই রাগিণীর ঝঙ্কার ফুটিয়া উঠিয়াছে। রামের মনোবৃত্তিই বাহ্য-প্রকৃতির আকারে প্রতিভাসিত অথবা রামের মনোবৃত্তির রাগেই বাহ্যপ্রকৃতি অনুরঞ্জিত। রামের প্রকৃতি আর এই বাহ্যপ্রকৃতি যেন বিম্ব ও প্রতিবিম্বের মত পরস্পর সম্বন্ধ বিশিষ্ট। আমাদের দর্শনে* বলে, অন্তঃ প্রকৃতিই বাহ্য প্রকৃতির আকারে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। অথবা অন্তঃ প্রকৃতির সুস্পষ্ট ছায়াপাত বাহ্য-প্রকৃতির অবশ্যই পড়িতে দেখা যায়। চিন্তার এই দিক্ এ স্থলেও খাটিবে না কেন?

রামের প্রকৃতিই বাহ্যপ্রকৃতির আকারে অভিব্যক্ত, ইহা সূক্ষ্মচিন্তা। রামের প্রকৃতি আর বাহ্যপ্রকৃতি একভাবাপন্ন—ইহা সরল চিন্তা। রামের প্রকৃতির চিত্র আর গিরি নদী বন উপবনের চিত্র একই প্রকার। একই সুর, একই ঝঙ্কার, একই অর্থ।

স্নিগ্ধশ্যামাঃ ক্বচিদপরতো ভীষণা ভোগরুক্ষাঃ
স্থানে স্থানে মুখর ককুভো ঝাঙ্কৃতৈ নির্ঝরাণাং
এতে তী\[র্থা\]শ্রমগিরি সরিদ্‌গর্ত্তকান্তারমিশ্রাঃ
সন্দৃশ্যন্তে পরিচিতভুবো দণ্ডকারণ্যভাগাঃ ॥

রামের হৃদয়ের পানে তাকাও; দেখিবে, এক ধারে স্নিগ্ধ ও শ্যাম; কি সুন্দর, কি নয়নরঞ্জন দৃশ্য! অপর ধার ভীষণ বিস্তার, কর্কশ; কি কঠোর মর্ম্মন্তুদ ছবি। রামের হৃদয় স্বভাবতঃ শীতল ও রমণীয়; কিন্তু এক্ষণে স্বহস্তকৃত সীতা নির্ব্বাসন জন্য দুঃখ শোকে সে হৃদয় মরুভূমির মত ধূ ধূ করি-তেছে, যত দূর লক্ষ্য কর, কেবল তপ্ত বালুকারাশি এদিক ওদিক উড়িয়া বেড়াই-তেছে, জল নাই, বৃক্ষ, লতা, তৃণ, শৈবাল কিছু নাই। উঃ সে কি ভীষণ! মর্ম্মন্তুদ যাতনা সহিয়া সহিয়া রামের কোমল বক্ষ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছে, প্রস্তরের মত কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। উঃ সে কি রুক্ষ কর্কশ! একদিকে হৃদয়ে পুণ্যক্ষেত্রের স্বচ্ছ পবিত্রতা, আশ্রমের শান্তি বিরাজিত, অপর দিকে উত্তুঙ্গ শৈলশৃঙ্গের দৃঢ়তা আপনার পদে দণ্ডায়মান। হৃদয়ের মধ্য দিয়া প্রবাহিত ক্ষীণা প্রবাহিনী অস্ফুট কুলু কুলু নিনাদিতা।

কত গর্ত্ত গভীর ক্ষতের মত, কত দুঃখ কান্তারের মত অবস্থিত।

দণ্ডকারণ্য অভিশপ্ত ভূভাগ অথচ তাহা জনস্থানও বটে। রামচন্দ্রের হৃদয় সীতা নির্ব্বাসন দোষে অভিশপ্তবৎ অথচ কর্ত্তব্যপালনেও সংযমে আশ্রমবৎ। দণ্ডকারণ্যের একদিকে সর্ব্বভূতলোমহর্ষণ উন্মত্ত প্রচণ্ড শ্বাপদকুল। আর তাহাদের শ্রবণবিদারী গর্জ্জনে প্রকাণ্ড গিরিগহ্বর কি ভীতিপ্রদ! এমনই গিরিগহ্বর সমেত দীর্ঘ অরণ্যানী দক্ষিণ দিকে ব্যাপিয়া একটা স্বতন্ত্র পৃথিবীর মত অবস্থিত। রামের হৃদয়েও দেখ—সর্ব্ব লোক লোমহর্ষণ উন্মত্ত শোকের কি প্রচণ্ড কোলাহল! কি মর্ম্মন্তুদ হাহাকার ধ্বনি! ঐ কোলাহল, ঐ হাহাকার-পরিপূরিত অতলস্পর্শ যন্ত্রণার গহ্বর সমস্ত দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থিত।

নিষ্কূজস্তিমিতাঃ ক্বচিৎ ক্বচিদপি প্রোচ্চণ্ড
সত্ত্বস্বনা
স্বেচ্ছাসুপ্ত গভীর ঘোষভুজগ শ্বাস
প্রদীপ্তাগ্নয়ঃ।
সীমানঃ প্রদরোদরেষু বিলসৎ স্বল্পাম্ভসো যা স্বয়ং
তৃষ্যদ্ভিঃ প্রতিসূর্য্যকৈরজগরস্বেদ দ্রবঃ পীয়তে॥

দণ্ডকারণ্যের এক স্থান পক্ষিকূজনরহিত স্তিমিত ভাবাপন্ন, অপর স্থান প্রচণ্ড বনজন্তুর কোলাহলে মুখরিত। রামের হৃদয়ের এক পার্শ্ব নিঃশব্দমৌন, স্তিমিত, অপর পার্শ্ব যন্ত্রণার কোলাহলে শব্দিত। দণ্ডকারণ্যে স্বচ্ছন্দসুপ্ত বিস্তৃতফণ সর্পকুলের নিশ্বাস বায়ু যোগে অগ্নি হুহু করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে; রামের অন্তরেও মন্দীভূত সীতা বিরহবহ্নি দণ্ডকারণ্য দর্শনে জ্বলিয়া উঠিবার উপক্রম করিয়াছে। আলবালের এক কোণে অল্পমাত্র জল চিক চিক করিয়া শোভা পাইতেছে। কৃকলাসগুলি স্বচ্ছন্দ অবস্থিত অজগরের দেহনিস্যন্দ স্বেদবারি তৃষ্ণাভরে আকণ্ঠ পান করিয়া লইতেছে। রামের হৃদয়াভ্যন্তরে কর্ত্তব্যপালন ধর্ম্মের ও প্রজানুরঞ্জন ব্রতের স্বচ্ছসলিলধারা ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে। রামচন্দ্রের উত্তপ্ত স্বেদধারাও অন্তর্নিহিত শোকতাপের কৃকলাসগুলি মুহূর্ত্তেই নিঃশেষে পান করিয়া ফেলিতেছে।

তার পর রামচন্দ্র ভূতপূর্ব্ব খরালয়ে জনস্থান অনেকদিনের পর বাষ্পাবরুদ্ধনয়নের অশ্রু পতনোদ্গমের অন্তরালে দেখিয়া লইতে লাগিলেন। পূর্ব্বদৃষ্ট অতীত বৃত্তান্তগুলি প্রত্যক্ষের মত চিত্তে সুস্পষ্ট ভাসিয়া উঠিল, স্মৃতি অনুভবের আকারে দেখা দিল যে স্থানগুলি বৈদেহীর বড় প্রিয় ছিল, সেই স্থানগুলি রামচন্দ্রের কাছে আজ বড়ই কষ্টকর হইয়া উঠিল। পরম রমণীয় মধুস্যন্দী উপবনের শ্যামল যৌবনশ্রী রাক্ষসী মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দিল। সুখের সময়ে যার শোভায় শ্রান্ত মন হৃষ্ট, ক্ষুধিত ইন্দ্রিয় তৃপ্ত; পরিশ্রান্ত দেহ স্নিগ্ধ হইত; আজ দুঃখের সময়ে সেই শোভাই মনকে তিক্ত, ইন্দ্রিয়কে বিভ্রান্ত, দেহকে বিফল করিয়া ফেলিল। সেই ফল পুষ্পময় প্রমোদকানন, সেই ঘনবিন্যস্ত তরুশ্রেণী, সেই হংসমালাধ্যুষিত নদীতীর রামকে কোন অজ্ঞেয়ভাবে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিল। সেই প্রীতিবিশ্রম্ভ সাক্ষী শয়নীয় শিলাতল, সেই সীতাকরবর্দ্ধিত ময়ূরশিশুকরিপোত, হরিণশাবক রামের দেহ ইন্দ্রিয় কোথায় ভাসাইয়া লইয়া চলিল। মনে পড়িল, সেই সীতাসহ সুখকর ভ্রমণ, সীতাসহ সেই বিস্রব্ধ অবস্থান, সীতাসহ সেই অবিদিত গতযামা রাত্রি পোহান।

সেই কষ্টকর স্থানগুলি সীতার প্রিয়

স্মৃতিচিহ্নগুলি আর দেখার প্রয়োজন নাই। তাই শম্বুক "তদলমেভিদু্র্রাসদৈঃ" বলিয়া প্রশান্ত গম্ভীর মধ্যমারণ্যকের কথা পাড়িলেন। যার মদমত্ত প্রান্তভাগ ময়ূরের কণ্ঠচ্ছবির মত কোমল চিক্কণ; যার তরুতল নীলবহুলছায়ায় নিবিড় সুখস্পর্শ, যার ক্রোড়দেশ অসম্ভ্রান্ত বিবিধ মৃগকুলসঞ্চারে রমণীয়—সেই মধ্যমারণ্যকের দিকে রামের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই শম্বুক সীতাবিরহ দুঃখ প্রশমনের উপায় বলিয়া বুঝিল! রামের হৃদয় বর্ত্তমানে দুর্ব্বল, ব্যথাকাতর ও মোহসমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে, সে হৃদয়ে প্রশান্ত গম্ভীরভাব আনয়ন করিতে পারিলে অনেকটা সুখশান্তি লাভ হইতে পারে, শম্বুকের এই ধারণা জন্মিল।

রামের একদিক যেমন কুসুমের মত কোমল। অপরদিক্ তেমনই বজ্রের মত কঠোর ছিল। একদিকে নির্ঝরিণী কুলুকুলুরবে তরতরভাবে বহিয়া যাইতেছে, অপরদিকে দাবাগ্নি হু হু করিয়া প্রখরবেগে জ্বলিতেছে। নরপতি রামচন্দ্রে দৃঢ়তা, সংযম, চিত্তজয়, সহিষ্ণুতা ও কর্ত্তব্যপালন। সীতাপতি রামচন্দ্রে দুর্ব্বলতা, মোহ, অধৈর্য্য, যন্ত্রণা ও মর্ম্মন্তুদ ক্রন্দন।

মধ্যমারণ্যের বেতস লতা কুসুমসুরভিশীতল স্বচ্ছসলিলা প্রবাহিণীর স্ফীত তরঙ্গ রামের হৃদয়ে বহাইয়া, শিশিরকটুকষায় গজপ্রিয় শল্লকীর প্রসৃত গন্ধ রামের অন্তরে ছুটাইয়া শম্বুক অগস্ত্য আশ্রমে যাত্রা করিলেন।

শম্বুক চলিয়া গেল। রামের হৃদয়ে প্রবাহিণীর কুলুকুলুধ্বনি বড় বেশীক্ষণ শোনা গেল না, শল্লকীর সে শীতমধুর গন্ধ বেশী সময় সে অন্তরে স্থায়ী হইল না। রাম শোকমাত্র দ্বিতীয় হইয়া সে স্থানে রহিলেন।

তখন রাম সেই সেই পাহাড়ের উপর বেড়াইতে লাগিলেন, যেখানে সীতার পালিত পুত্র ময়ূরের দল আজিও তেমনই বেড়াইয়া বেড়ায়। সেই সেই বনস্থলীর উপর দিয়া যাইতে লাগিলেন—যে স্থানে সীতার সযত্নপোষিত মত্ত হরিণের দল আজিও সেই মত গর্ব্বিত পদক্ষেপে ছুটাছুটি করে। সেই আমঞ্জু বঞ্জুললতা—সেই অবিরলনীল নিচুল তরুশ্রেণী—সেই চিরপরিচিত কেতকসুরভি সরিৎতট রাম সস্পৃহলোচনে দেখিতে লাগিলেন। সেই প্রস্রবণগিরি—যাহা দূর হইতে মেঘমালার মত; সেই গোদাবরী নদী যাহা দাক্ষিণাত্যের সুবর্ণময়ী কাঞ্চীর মত; সেই উত্তুঙ্গশিখর—যাহা পরার্থে ত্যক্তজীবিত মহাত্মা জটায়ুর আবাসস্থল; সেই সকল স্থান রাম ভাল করিয়া দেখিয়া যাইতে লাগিলেন। সেই সুখে দুঃখে ঘেরা—সেই স্মৃতিরাগে রঞ্জিত করা—সেই শয়নে স্বপনে ভ্রমণে উপবেশনে নিত্যসঙ্গী বনস্থলী। রাম আপনার বর্ত্তমান অবস্থা ভুলিয়া গেলেন—অতীতের সুখস্বপ্নে বিভোর হইয়া আপনাকে ভুলিয়া গেলেন।

কি সুন্দর রমণীয় বনভাগ! আর কিবা সুন্দর গোদাবরীর জলে সেই বনভাগের শ্যামল তরুচ্ছায়ার প্রতিফলন! কে যেন সেই গোদাবরীর স্বচ্ছজলে শ্যামল তরুশ্রেণীর শ্রী বিছাইয়া দিয়া গিয়াছে। প্রতিফলিত ছায়াগুলি কোন ইন্দ্রজালিকের করস্পর্শে সত্যকারের তরুবীথিকা বলিয়াই বোধ হইতেছে। সেই তুলভাগের তরুশ্রেণীর পত্রান্তরালে প্রচ্ছন্ন পক্ষিকুঞ্জের কূজনইবা কি শ্রুতিসুভাগ! কে বলে বনভাগ জড়, মৌন ও নির্জ্জীব! যার অমন অস্ফুট শ্রুতিসুভাগ কলধ্বনি—সে কি জড়? যাহা হইতে অমন

সুস্বর সঙ্গীতের উদ্ভব—সে কি মৌন? যার প্রাণ স্পন্দন দুঃখিত; স্তিমিত প্রাণে সুখ ও চাঞ্চলতা আনিয়া দেয়, সে কি নির্জ্জীব?

সেই পঞ্চবটী—বহুদিনের বিবিধ বিস্রম্ভ-সাক্ষী, সেই বাসন্তী—সীতার প্রাণ প্রিয়তমা সখী বনের অধিদেবতা; রামের এই অবস্থা বিপর্য্যাসের কালে কিরূপে ইহাদিগের সহিত সম্ভাষণ করিবেন—রাম ভাবিয়াই আকুল। যাঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া একদিন নন্দনের অতুল সঙ্গীত উপভোগ করিয়াছিলেন, আজ এক সুরে শ্মশানের হরি হরি ধ্বনি কেমন করিয়া করিবেন?

রামের মর্ম্মস্থল কৃতকার্য্যের অনুশোচনায় বিদীর্ণ হইতেছিল। উত্তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস তাঁহার ক্ষীণ পঞ্জরগুলি ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিতেছিল। ইতস্ততঃ প্রস্মৃতগ্রস্ত কেশ-কলাপে পূর্ণচন্দ্রের মত মুখখানি মেঘে ঢাকা পড়িতেছিল; বোধ হইতেছিল, অন্তরের গভীরতম প্রদেশ হইতে উত্থিত যন্ত্রণার কালিমারাশি যেন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া আছে। রাম নিজের হৃদয়ের তলদেশে ব্যাকুল দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। বোধ হইল যেন চিরসন্তাপজ তীব্র বিষরস আজ অকস্মাৎ তাঁহার মর্ম্মস্থলে সঞ্চারিত হইয়া পড়িল; তীক্ষ্ণ শল্যখণ্ড হঠাৎ প্রবল বেগে দেহের ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া গেল; দৃঢ়রুদ্ধ-মুখ ব্রণ আজ মুহূর্ত্তের মধ্যেই ফাটিয়া উঠিল। ঘনীভূত শোক আজ তাঁহাকে বিবশ ও মূর্চ্ছিত করিয়া দিতে লাগিল।

পুরা যত্র স্রোতঃ পুলিনমধুনা তত্র সরিতাং
বিপর্য্যাসং যাতো ঘনবিরলভাবঃ
ক্ষিতিরুহাম্।
বহোর্দৃষ্টং কালাদপরমিব মন্যে বনমিদং
নিবেশঃ শৈলানাং তদিদমিতি বুদ্ধিং দ্রঢয়তি।

পূর্ব্বে যেখানে স্রোত বহিত,এখন সেখানে নদীর পুলিন দেখা যাইতেছে। বৃক্ষ সকলের ঘন সন্নিবেশ কোথাও বিরল, বিরলভাগ কোথাও নিবিড় হইয়া আসিয়াছে। বহুকাল পরে দৃষ্ট এই বন অপর বন বলিয়াই প্রতীত হইতেছে; কেবল পর্ব্বতের স্থির সন্নিবেশ দেখিয়াই বোঝা যাইতেছে যে, এই সেই বন। বাস্তবিক রামের অন্তঃপ্রকৃতি এখানে বাহ্য প্রকৃতি আকারে বিবর্ত্তিত হইয়াছে। রামের অন্তঃ প্রকৃতি আর এই বনস্থলীর দৃশ্য একই রূপ শোভা পাইতেছে। রামের অন্তরে যেখানে প্রণয়ের প্রবাহ ছুটিত, এখন সেখানে বিরহের চড়া পড়িয়াছে, যেখানে মিলনের সুখ রাগিণী বাজিত, এখন সেখানে কারুণ্যের শোক সঙ্গীত তান ছুটিতেছে। সুখ শোকে, মিলন বিরহে পরিণত। রামের সবই বিপর্য্যস্ত। রামকে আর চেনা যায় না, যেন সে রাম আর নাই। কেবল সৌম্য গম্ভীর অনুভাব সৌভাগ্য পর্ব্বতের মত অবি-চল আছে, তাই সেই রাম বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। লাবণ্যময়ী মুক্তাফল-তরলা ছায়া যেমন শকুন্তলার ক্ষীণপাণ্ডু দেহ ত্যাগ করে নাই, এই অনুভাব-সৌভাগ্য তদ্রূপ রামের বিপর্য্যস্ত দুর্ব্বল শরীর ছাড়িয়া যায় নাই।

রাম আর নয়ন মেলিয়া পঞ্চবটী দেখিতে পারেন না, পঞ্চবটী দর্শনে আর আপনাকে স্থির রাখিতে পারেন না, পঞ্চবটী ছাড়িতে পারিলে যেন তিনি আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচেন। তথাপি পঞ্চবটীর স্নেহ-চুম্বকের মত তাঁহার লৌহসম কঠোর হৃদয় এমনই আকৃষ্ট করিতেছে যে, ছাড়িয়া যাইতেও তিনি পারেন না। কি অব্যক্ত যাতনাময় আক-র্ষণের মোহে তিনি চালিত হইতেছেন, কি

অজ্ঞেয় দুঃখময় স্রোতের টানে তিনি ভাসিয়া যাইতেছেন। সীতার সহিত এতদিন নিজের গৃহের মত যেখানে আনন্দে দিন কাটিয়া গিয়াছিল, যাহার কথা লইয়া অযোধ্যায় কত রজনী সুখে দুঃখে পোহাইয়াছিল সেই পঞ্চবটীকে সম্ভাষণ না করিয়া অকৃতজ্ঞের মত চলিয়া যাইতেও রামের মন সরে না। কি সঙ্কটময় অবস্থা!

আজ তিনি যে পতিগত-প্রাণা সীতাকে ছিন্নগুচ্ছিন্না লতিকার মত সবলে আশ্রয়চ্যুতা করিয়া অরণ্যে নিক্ষেপ করিয়া আসিয়াছেন, আজ তিনি যে সীতার সেই মৃণালকল্প অঙ্গলতিকাকে হিংস্রশ্বাপদের মুখে তৃণগ্রাসের মত অবহেলায় ফেলিয়া দিয়াছেন, আজ তিনি যে বিশ্বস্তা গৃহ শকুন্তিকাকে ব্যাধের ছুরিকাঘাতে হত্যা করিয়া কসাইয়ের মত কার্য্য করিয়াছেন। কোন মুখে তিনি পঞ্চবটীর কাছে মুখ দেখাইবেন; ছায়ার মত অনুগামিনী স্বতঃ পবিত্রা জানকীর উপর সেই নিন্দিত নির্ব্বাসন-দণ্ড নিক্ষেপ করিয়া আজ তাহার কি উত্তর দিবেন? সীতার যে ভালবাসা রামের হৃদয় আলোকময় করিয়া দিত, পঞ্চবটীর তাবৎ প্রাণীতে ছড়াইয়া পড়িত, আজ তাহার এমন বিপরিণাম—এ কি বলিবার!

রামের হৃদয়-সাগরে মন্থন আরম্ভ হইল। এখনই যে হলাহল উঠিবে। উপায় কি? সে হলাহল হইতে রামের দেহ ইন্দ্রিয় মন প্রাণ কে রক্ষা করিবে? যে সঞ্জীবন মন্ত্র এই হলাহল নিবারণের উপায়, যে নীলকণ্ঠ এই বিষ জীর্ণ করিতে সক্ষম—তাহা কোথায়? কাজেই তখনই শম্বুক অগস্ত্যাশ্রম হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া মহর্ষি অগস্ত্য দেবের শুভাদেশ পুণ্যময় কবচের মত বহিয়া আনিলেন। স্নেহময়ী বৎসলা অগস্ত্য-পত্নী লোপামুদ্রা বিমানাবতরণের মাঙ্গল্য সম্ভার হস্তে লইয়া ঋষিবৃন্দের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছেন। যে অগস্ত্যদেবের একটী একটি গণ্ডুষে সপ্তসিন্ধু নিঃশেষে শুকাইয়া গিয়াছিল, যাঁহার একটী আদেশে বিন্ধ্যের গগনস্পর্শী শির চিরদিনের মত নত হইয়া পড়িয়াছিল, যাঁহার একটী অভিসম্পাতে ইন্দ্রত্বপদে সমাসীন নহুষকে সর্পরূপে ধরাতলে পতিত হইতে হইয়াছিল, সেই মহর্ষি অগস্ত্যদেবের আদেশ। রামচন্দ্রের মোহ, দুর্ব্বলতা অধৈর্য্য ও দুঃখ শোক সবই অপগত হইয়া গেল। "ভগবতি পঞ্চবটি গুরুজনের অনুরোধে এই অতিক্রম মার্জ্জনা করুন" বলিয়া অযোধ্যানাথ অগস্ত্য-আশ্রম অভিমুখে ফিরিবার উপক্রম করিলেন।

এইবার মায়ের কাছে সন্তানকে যাইতে হইবে, অগস্ত্যদেবের কল্যাণময় আশীর্ব্বাদ মাথায় পাতিয়া লইতে হইবে, পুণ্যপূত আশ্রমের মধ্যে রক্ষাকর্ত্তা রাজাকে প্রবেশ করিতে হইবে। কাজেই আপনাকে ভালরূপে সামলাইয়া লওয়া আবশ্যক। কোনরূপ দুঃখ শোক অধৈর্য্য দুর্ব্বলতা লইয়া প্রবেশ করা চলিবে না। তখন ক্রৌঞ্চাক্ষ গিরির মত স্ব মহিমোন্নত ও স্থির হইতে পারিলে তবেই আশ্রমে মায়ের ক্রোড়ে যাওয়া ঘটিবে। হইলও তাই। পেচককুলের ফুৎকার রবে ভীত বায়সকুল বংশগুচ্ছের মধ্যে মুখ লুকাইয়া মূক হইয়া রহিল। ময়ূরের কূজনরবে উদ্বেজিত সর্পকুল পুরাতন চন্দনতরুর কোটরে যাইয়া আশ্রয় লইল। এদিকেও সত্ত্বগুণের উদয়ে রজস্তমোভাব মিলাইয়া গেল। সংযমের বাতাসে শোকদুঃখের ধূলিকণা দূর আকাশের গায়ে উড়িয়া গেল। শান্তির আবির্ভাব, ভক্তির উদয়ে

অশান্তি ও সংসার মোহ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়া পড়িল। তখন রামচন্দ্রের ইক্ষাকু কুলপ্রদীপ অযোধ্যানাথের চিত্তকুহরে গোদাবরীর গদ গদ রবের মত আনন্দের প্রবাহের কলকল ধ্বনি শ্রুত হইল। সংযম ও মোহ, সহিষ্ণুতা ও দুঃখ, চিত্তবল ও দুর্ব্বলতার কিয়ৎকাল-ব্যাপী সংঘর্ষের ফলে এক অপূর্ব্ব তরঙ্গের উদ্ভব হইল। সেই শোক-কাতর প্রাণের মধ্যে দেখিতে দেখিতে পবিত্র সরিৎসঙ্গম দেখা দিল। রামচন্দ্রের অন্তঃ প্রকৃতি কি সুন্দর অভিব্যক্ত হইয়া পড়িল। অপূর্ব্ব সাদৃশ্য সার্থক হইয়া পড়িল।

রামচন্দ্র অগস্ত্যাশ্রমে যাত্রা করিলেন।

শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী।

বঙ্গে ব্রাহ্মণ।

মহারাজ আদিশূর অষ্টম শতাব্দীতে পালবংশীয় নৃপতি বিগ্রহ পালকে পরাস্ত করিয়া বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ করেন। মহারাজ আদিশূরের রাজত্বকালে বঙ্গে ব্রাহ্মণ আনয়ন যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা, সে বিষয়ে মতদ্বৈধতা নাই। এই স্মরণীয় ঘটনার সহিতই বঙ্গের সমগ্র ভাবী কালের উন্নতি ও সভ্যতা ঘনিষ্ঠরূপে বিজড়িত ছিল। মহারাজ আদিশূর বঙ্গে ব্রাহ্মণ আনয়ন না করিলে হয় ত বঙ্গদেশ আচারহীন ও মানসিক উৎকর্ষ-বিবর্জ্জিত বর্ব্বরতার লীলা-ভূমি হইয়া যাইত। এইরূপ ঘটনা বিশেষ দ্বারাই এক একটী জাতির বা এক একটী দেশের ভাবীগঠনের বীজ উপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া কোন ঘটনাই পৃথিবীকে অনাবিল মধু কিম্বা কেবলমাত্র বিষ প্রদান করে না। বঙ্গে ব্রাহ্মণ আনয়ন বঙ্গদেশকে জ্ঞান ও সভ্যতায় বিভূষিত করিয়াছে সত্য; তথাপি কোন কোন বিষয়ে দুই এক বিন্দু বিষও উদ্গীরণ করিতে বিরত হয় নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেই কথাটী প্রকট করিবার প্রয়াস মাত্র।

মহারাজ আদিশূর কান্যকুব্জ-রাজ-দুহিতা চন্দ্রমুখীকে বিবাহ করেন। মহারাণী চন্দ্রমুখী চান্দ্রায়ণ ব্রতের অনুষ্ঠান করেন। ব্রত কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ-গণ আহুত হইয়া মহারাণী সমীপে নীত হন।

নাম্না চন্দ্রমুখী নৃপেন্দ্র তিলক
শ্রীচন্দ্রকেতোঃ পুরা
সৎ পুণ্যাশ্রয় কান্যকুব্জ বসতেঃ
কন্যাচ পুণ্যার্থিনী।
পত্নী গাঢ়তম প্রতাপ নিবহখ্যাতাদি শূরস্য চ
ক্ষৌণীন্দ্রস্য বভূব সাপি চতুরা
চান্দ্রায়ণাচারিণী ॥
ও ত্রাদাবগতঃ কশ্চিৎ ব্রাহ্মণঃ স্বর্ণকৌশিকঃ।
ততঃ সমাহুত স্তত্র বিপ্রো রজত-কৌশিকঃ ॥
কৌণ্ডিল্য-কৌশিকঃ পশ্চাৎ ঘৃত-কৌশিক-
কৌশিকৌ।
এতে পঞ্চ সমায়াতাঃ পঞ্চ গোত্র ধরা নরাঃ ॥"

হতভাগ্য বঙ্গদেশে তখন বেদজ্ঞ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ ছিল না। মহারাণী এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ-কৃত দেবকার্য্যে প্রীতিলাভ করিতে পারিলেন না।

চন্দ্রমুখী উবাচ। গায়ত বেদং পূরয়তেদং
মন্ত্রতমগ্নিং আনয়ত।
বরুণাবাহণ পূর্ব্বকং কুম্ভাগতং
কুরুতাবনী দেবাঃ ॥
বিপ্রাঃ উচুঃ। বয়ং নৈব জানীমহে বেদ
বাণী মিদানী দ্বিজস্তোত্রবোন শ্রুতোহগ্নিঃ ।

এতচ্ছ্রুত্বা নরপতি র্যোষা বচনমবোচৎ
বহুতর রোষা।
ব্রাহ্মণ হানে দেশে বাসং কিমিহ করিষ্যে
পিতুরভিলাষঃ॥
—বারেন্দ্র-কুলপঞ্জী।

সুতরাং মহারাজ আদিশূর মহারাণীর ইচ্ছাক্রমে (১) তাঁহার পিত্রালয় কাণ্বকুব্জ হইতে শ্রীহর্ষ, ভট্টনারায়ণ, বেদগর্ভ, ছান্দড় ও দক্ষ নামক পাঁচজন বৈদবিৎ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। (খ্রীষ্টীয় ৭৭৯-৭৮২ অব্দে বিশ্বকোষ।)

আদিশূরঃ প্রশৃচ্ছ। কুত্র কুত্র স্থিতা বিপ্রা
বেদপারগসাগ্নিকাঃ।
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি কৃপয়া কথয় প্রভো॥
পুরোহিত উবাচ। কান্যকুব্জ স্থিতা বিপ্রা
সাগ্নিকা বেদপারগাঃ।
তস্মাৎ পঞ্চ সমানীয় যজ্ঞনিষ্পন্নতাং কুরু॥
—বংশীবদন-বিপ্রারত্ন।

এই পঞ্চ ব্রাহ্মণের নাম সম্বন্ধে এবং তাঁহাদের বঙ্গদেশে আগমনের কারণ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। (২)

উপরি উক্ত ব্রাহ্মণগণের আগমনের কারণ সম্বন্ধে কেহ বলেন, মহারাজ আদিশূর অপুত্রক ছিলেন, তাই পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিবার মানসে কাণ্বকুব্জ হইতে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন, গৌড়দেশে অতি বৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাই নিবারণের জন্য যজ্ঞ করেন। গৌড়দেশে অনাবৃষ্টিহেতু দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়ায় তাহার নিবারণকল্পে আদিশূর যজ্ঞ করিয়াছিলেন, এ কথাও কেহ কেহ বলিয়া থাকেন।

যাহা হউক, ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ সমাপনান্তে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিন্তু বেদহীন বঙ্গদেশে যাজনাদি ক্রিয়া করিয়াছেন বলিয়া কান্যকুব্জের ব্রাহ্মণ-সমাজে গৃহীত হইলেন না। উপায়ান্তর না দেখিয়া তাঁহারা পুনরায় বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসিলেন। মহারাজ আদিশূর হস্তে স্বর্গ পাইলেন; মহা সম্বর্দ্ধনা করিয়া তাঁহাদিগকে বঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই পঞ্চ ব্রাহ্মণই বঙ্গের ব্রাহ্মণগণের আদি পুরুষ। তাঁহারা এদেশে স্থায়ী আবাস নির্ম্মাণ করিয়া গঙ্গার পবিত্র তীরে শ্রুতি অধ্যয়ন এবং যোগাদি দ্বারা বঙ্গদেশকে ধন্য ও পবিত্র করিতে লাগিলেন। এইরূপে বাস করিতে করিতে বঙ্গদেশীয় প্রাচীন সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণের সহিত যৌন সম্বন্ধে সংবদ্ধ হইয়া পড়িলেন এবং এ দেশেও তাঁহাদের সন্তানসন্ততি

(১) ব্রিটনের হিদেনরাজ এলক্সাধিপতি খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী কেণ্টরাজ-দুহিতার পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহার উপাসনার জন্য শ্বশুরের রাজ্য হইতে ধর্ম্মযাজক আনিয়া গির্জ্জা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের প্রটেষ্টেণ্ট রাজগণ ক্যাথলিক রাজকুমারীগণের পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে আপন আপন মতে উপাসনা করিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন। মোগল বাদশাহগণও হিন্দু বেগমগণের হিন্দু আচার রক্ষার ব্যবস্থা করিতেন।

(২) দেবীবর ঘটকের মতে—
"ক্ষিতিশ স্তিথিমেধা চ বীতরাগঃ সুধানিধিঃ।
সৌভরিঃ পঞ্চ ধর্ম্মাত্মা স্বাগত গৌড়মণ্ডলম্॥"

সাধারণ কুলজ্ঞগণের মতে—
"নারায়ণস্থ শাণ্ডিল্যঃ সুষেণঃ কাশ্যপস্তথা।
বাৎস্যো ধরাধরো জ্ঞেয়ো ভরদ্বাজস্থ গৌতমঃ॥"

বারেন্দ্র কুলপঞ্জী মতে—
নারায়ণ, ধরাধর, সুষেণ, গৌতম এবং পরাশর।

কুলরাম গ্রন্থে বাচস্পতি মিশ্র বলেন—
"শাণ্ডিল্য গোত্রজঃ শ্রেষ্ঠঃ ভট্টনারায়ণঃ কবিঃ।
দক্ষোঽপি কাশ্যপ শ্রেষ্ঠঃ বাৎস শ্রেষ্ঠোঽপি
ছান্দড়ঃ।
ভারদ্বাজিক গোত্রেচ শ্রীহর্ষো-হর্ষ-বর্দ্ধনঃ।
বেদ-গর্ভোঽপি সাবর্ণে যথা বেদ প্রসিদ্ধকঃ।"

দ্বারা বংশ বৃদ্ধি হইতে লাগিল।(১) গৌড়-ব্রাহ্মণ।

মহারাজ আদিশূর পঞ্চবিপ্রকে সংসার-নিগড়ে বদ্ধ করিয়া স্বদেশের গৌরব বৃদ্ধি করিলেন সত্য। কিন্তু এই সকল ব্রাহ্মণের স্বদেশেও পত্নীপুত্র বর্ত্তমান ছিল। ব্রাহ্মণগণ অভিমানের মাথায় আঘাত পাইয়া স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পত্নীপুত্রের কথা ভাবিবার অবসর পান নাই। কিন্তু যখন একে একে এই পঞ্চ ব্রাহ্মণের কাজ হইল, তখন বঙ্গদেশীয় সন্তানগণ জ্যেষ্ঠ পুত্র না হওয়ায় পিতৃশ্রাদ্ধের অধিকারী হইতেন না। কান্যকুব্জবাসী সন্তানগণই পিতৃশ্রাদ্ধ নিষ্পন্ন করিতেন। ইহাতে এক নূতন বিপদের সৃষ্টি হইল। একেই কান্যকুব্জের সামাজিকগণ এ দেশাগত ব্রাহ্মণগণের প্রতি পূর্ব্ব ঘটনার জন্যই সাতিশয় ক্রুদ্ধ ছিলেন; তাহাতে সমাজচ্যুত পতিত পিতার শ্রাদ্ধ করায় তাঁহা-দের সন্তানগণকেও সমাজ হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইল। তাঁহারাও বঙ্গাধিপতির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। রাজা প্রথমাজাত-গণকে গঙ্গার পশ্চিমতীরে রাঢ়দেশে এবং শেষাগতগণকে গঙ্গার পূর্ব্বতীরে বারেন্দ্রভূমে যথাযোগ্য আশ্রয় প্রদান করিলেন। দেশ-ভেদে তাঁহারা রাঢ়ী ও বারেন্দ্র সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলেন। (গৌড় ব্রাহ্মণ) (২)

---

(১) তে পঞ্চ বিপ্রাঃ স্থবিধায় রাজ্ঞো যজ্ঞং
　　　　স্বদেশে গমনোৎসুকাশ্চ।
ধনেন মানেন চেতেন পূজিতা গতা যথাদেশ
　　　　মিতাশ্বযানৈঃ ॥

(২) ততস্তে এমশো বিপ্রাঃ পরলোকমুপাগমন্।
পুত্রা যে পূর্ব্বপক্ষীয়া কান্যকুব্জ নিবাসিনং।
জ্যেষ্ঠাঃ পিতৃমৃতিং শ্রুত্বা ক্রমাৎ শ্রাদ্ধে
　　　　কৃতঞ্চ তৈঃ।
গৌড়ংগতা মাগধবর্ত্মনা বোঽপ্যমাজ্য যাজ্যং
　　　　কৃতকস্তএব।
যদীচ্ছ্ তাস্মাক মুপক্তি ভোক্ত্যং তদা কুরুধ্বং
　　　　খলু পাপ নিস্পৃত্তিং ॥
দেশীয়ানাং বচঃ শ্রুত্বা তেন তেজস্বিনো দ্বিজাঃ
বেদবেদাঙ্গ বেত্তৃনাম্ পাপ স্পর্শ ন মাদৃশাম্ ॥
নাপি কিঞ্চিৎ করিষ্যামঃ প্রায়শ্চিত্তং দ্বিজাবয়ং।

*　　*　　*　　*

তত স্তেজস্বিনঃ ক্রুদ্ধা ভট্টনারায়ণাদয়ঃ।
পুনর্গতা গৌড়দেশমাদিশূর নৃপান্তিকম্ ॥

*　　*　　*　　*

ততো রাজা সুসন্মত্র্য মন্ত্রিভিশ্চ দিগান্তরে।
গত্বাং ন ব্রাহ্মণোদ্দেশং কৃতাঞ্জলি রজযত ॥

শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিতা যে যে ব্রাহ্মণাগ্রামবাসিনঃ।
ন ভুক্তং ন গৃহীতং তদন্নং দানঞ্চতৈ দ্বিজৈঃ ॥
ততোঽব মানিতাঃ বিপ্রাঃ সদারাঃ সহ
　　　　পুত্রকাঃ।
আগতা গৌড়দেশেঽস্মিন্ন্ পায় মুপলক্ষিতাঃ ॥
ততস্তে পূজিতা রাজ্ঞা নিবস্তং প্রার্থিতা
　　　　স্তথা।
রাঢ়ায়াং ভ্রাতরো যত্র নিবসন্তি সুহৃজ্জলৈঃ
বাচ্যে নিশম্য নৃপতে রূচুস্তে দ্বিজশত্তমা।
বসামো নৈব রাঢ়ায়াং বৈমাত্র ভ্রাতৃভিঃ
　　　　সহ।
শ্রুত্বৈতন্নৃপতিঃ প্রাহঃ রাজধানী সমীপতা ॥
বারেন্দ্রাখ্যে সুশস্যাঢ্যে দেশে বসথ সুব্রতাঃ
গ্রামাং স্তত্র প্রদাস্যামি শস্যযুক্তান্
　　　　মনোহরাণ ॥
ততস্তে ত্ববলং স্তত্র পুত্র দারাদিভি র্যুতাঃ।
বৈমাত্র ভ্রাতর স্তেষাং রাঢ়দেশ নিবাসিনঃ।
মাতুলাশ্রয় বাসাশ্চ মাতুলাশ্রয় বৰ্দ্ধিতাঃ।
মাতুলৈঃ রূপনীতাস্ত্ব ছান্দগা সম্ভবত্তথা।
স্থনীতাশ্চৈব বিদ্যাংশঃ গৌড়রাজনমস্কৃতাঃ ॥
রাঢ়ায়াং সুখমাসীরন্ পুত্রদারাদিভি র্যুতাং।
স পত্নী বিদ্বেষ বশাৎ পরস্পরং লোকত্র
　　　　বাসঃ নচ ভক্ষ্যভোজ্যং।
বিভাগ মাসাস্ত তথা বিবর্দ্ধিতাঃ
　　　　পুত্রাদিভির্ব্বদ্ধস্থতা যথার্যয়ঃ ॥

পবিত্রীকৃত মেতদ্ধিপ্রাগালভ্য কুলং মম।
কিয়ৎকালং দ্বিজাগ্র্যাণাং ভবতাং সঙ্গতো মম
শ্রুতাধ্যয়ন যোগাচ্চ দেশ যাতু পবিত্রতাম্।
গঙ্গায়ানাতিদূরেস্মিন্ প্রদেশে বহু ধান্যকে॥
বসন্ত বিপ্রমুখ্যাশ্চ ভবন্তঃ সূর্য্য-সন্নিভাঃ।
উপায়তঃ কালতশ্চ বিবাদে শীথিলে তদা॥
যদিচ্ছথ স্বদেশায় গমনং যাস্যথ ধ্রুবম্॥
রুরুচে বিপ্রমুখেভ্যো নৃপতেঃ সুমৃতঃ বচঃ।
স্থিতেষু তেষু বিপ্রেষু রাজা পুনরমন্ত্রয়ৎ॥
যে সপ্তশতিকা বিপ্রা রাঢ়দেশ নিবাসিনঃ।
ছান্দগা ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞা নীতি-মন্ত্রবিশারদাঃ॥
এভ্যঃ কন্যাঃ প্রদাস্যন্তু বিপ্র মুখ্যেভ্য এব তে।
এতেষাং নিগড়স্তেন ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥
যদি প্রজাঃ প্রজায়েরন্ ভবেন্মম কীর্ত্তিরক্ষয়া।
কান্যকুব্জ দ্বিজাগ্র্যাণাং বংশঃ অস্মিন্ স্থাপিতে ময়া॥

নৃপাজ্ঞয়া দত্তুস্তেভ্যঃ কন্যা সপ্তশতী দ্বিজাঃ।
রাঢ়ায়াং বহু ধান্যায়াং শ্বশুরালয়ে সন্নিধৌ।
নিবাশঃ রুরুচে তেভ্যঃ সমাদৃত্য সুহৃজ্জনৈঃ॥
সদৃশান্ জনয়ামাণুস্তাণু পুত্রান্ কুমারিকাঃ।
তেজস্বিনো গুণবতো দীপো দীপান্তরং যথা॥

কিন্তু প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এমত স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, ব্রাহ্মণগণ প্রথমেই সস্ত্রীক বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন।

কোলাঞ্চ দেশতঃ পঞ্চবিপ্রা জ্ঞান তপো যুক্তাঃ
মহারাজাদি শূরেণ সমানীতাঃ॥

সপত্নীকাঃ হরিমিশ্র।

সস্ত্রীকান্ শাস্ত্রসংযুক্তান্ আনীতান্ গামমান্ দ্বিজন্।
পঞ্চ গোত্র সমুৎপন্নান্ পূজয়েচ্চ যথাবিধি॥

রাঢ়ীয় ঘটকগণের প্রমাণ।

সদারাশ্চ সপুত্রাশ্চ সগুণাশ্চ সম ভ্রতাঃ

বারেন্দ্র কুলপঞ্জী।

সস্ত্রীকাঃ পুত্রযুক্তাঃ পরিজন সহিতাঃ সাগ্নয়ঃ

কান্তি মন্তঃ।

বাচস্পতি মিশ্র।

পঞ্চ ব্রাহ্মণ পুনরায় সস্ত্রীক স্বদেশে ফিরিয়া গেলে তথায় প্রত্যাখ্যাত হন। সুতরাং বঙ্গদেশে আসিয়া মহারাজ আদিশূরের আশ্রয়ে বরেন্দ্রভূমে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের পুত্র কন্যা জন্মিলে পরস্পর আদান-প্রদান করিবার জন্য সংসার ও পরিবারের বিস্তার ঘটিতে লাগিল। কিন্তু মগধাধিপতি ধর্ম্মপাল পাটলিপুত্রে অধিষ্ঠিত হইয়া গৌড়-সিংহাসন হরণ করিলেন। বারেন্দ্রভূমে পালরাজ্যের অধিকার বিস্তৃত হইলে আদিশূর-তনয় হৃতরাজ্য ভূশূর রাঢ় দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তথায় রাজধানী স্থাপন করিলেন। এই সময়ে গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বারেন্দ্রভূমে বৌদ্ধ-প্রতাপের অধীন হইয়া থাকিতে যাঁহারা অনিচ্ছুক হইবেন, তাঁহারা ভূশূরের অনুগামী হইলেন। তাঁহারাই রাঢ়ী সংজ্ঞা লাভ করিলেন এবং যাঁহারা পূর্ব্ববাস বারেন্দ্রভূম পরিত্যাগ করিলেন না, তাঁহারা বারেন্দ্র আখ্যা পাইলেন।

ভূশূরেণচ রাজ্ঞাপি শ্রীজয়ন্ত সুতেন চ।
নাম্নাপি দেশ ভেদৈস্ত রাঢ়ী বারেন্দ্র সাংশতী॥

বংশীবদন বিদ্যারত্ন।

এইরূপে বহুবৎসর গত হইল। এতদ্দেশীয় প্রাচীন সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণের নিকট নবাগতগণ কন্যা গ্রহণ করিতেন, কিন্তু কদাচিৎ তাঁহাদিগকে কন্যা সম্প্রদান করিতেন। কণৌজীগণের সহিত যাঁহারা কথিতরূপ যৌন সম্বন্ধে বদ্ধ হইতেন, তাঁহারা আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিতেন। এবম্বিধ দানাদান স্থাপনের জন্য কণৌজীগণের প্রতিপত্তি বাড়িতে লাগিল। কিন্তু এরূপ ব্যবস্থা বঙ্গীয়

সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণকে উচ্চাসনে তুলিতে থাকিলেও, অন্যদিক দিয়া তাহাদের এক মহা অনিষ্ট সাধন করিতেছিল। কণৌজীগণ বিবাহের জন্য যেমন স্বজাতীয় কন্যা পাইতেছিলেন, তেমনি বঙ্গীয়গণও কুল, মান ও শীলের প্রলোভনে নিজ নিজ কন্যাগণকে কণৌজীগণের হস্তে সমর্পণ করিয়া গৌরব অনুভব করিতেছিলেন। প্রাচীনকাল হইতেই ভারতে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। সুতরাং কণৌজীগণ বহু বিবাহে আদৌ কুণ্ঠিত ছিলেন না। ওদিকে কিন্তু বঙ্গীয় সপ্তশতীগণ পাত্রীর অভাবে চিরজীবন অবিবাহিত থাকিয়া নির্ব্বংশ হইতেছিলেন। আর যাঁহারা কনৌজীগণের সংশ্রবে আসিতে পারিতেন না, তাঁহারা বাঙ্গালায় পতিতের পর্য্যায়ে পড়িয়া যাইতেন। বিশেষতঃ দেখা যায় যে, সভ্যতায় নিম্ন স্তরে কন্যা অপেক্ষা পুত্রের সংখ্যা অধিক। সে কারণ সপ্তশতী কুলে যে কন্যার অনটন ছিল, তাহা বোধাতীত নহে।

পূর্ব্বোক্ত কণৌজী বঙ্গীয়ে যে যৌন সম্বন্ধ, তাহাকে এক প্রকার অসবর্ণ বিবাহ বলা যাইতে পারে। যদিও ভারতে অসবর্ণ বিবাহ অপ্রচলিত ছিল না, তথাপি অনুমান হয়, তাহা সভ্যতার পরিণতির সহিত ধীরে ধীরে তিরোধান করিতেছিল। ভারতের প্রচলিত অসবর্ণ বিবাহে উচ্চবর্ণ অধস্তন বর্ণের কন্যা গ্রহণ করিতেন, কিন্তু আপনাদের কন্যা কখনই নিম্ন বর্ণের হস্তে সমর্পণ করিতেন না। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় কন্যা বিবাহ করিলেও, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ কন্যা গ্রহণে সম্পূর্ণ অসমর্থ। অসবর্ণ বিবাহে সম্বন্ধ বর্ণগন পরস্পর সমান অধিকার ও সমান আচার লাভ না করিতে পারিলে, তাহা জাতীয় স্থায়িত্বের পক্ষে বড়ই অনিষ্টকর। নিম্নবর্ণ উক্ত বিবাহে আপনাদিগকে সম্মানিত ও বর্দ্ধিত-গৌরব মনে করিলেও, তাঁহাদের জাতীয় দুর্ব্বলতা বৃদ্ধিই পাইয়া থাকে। কাজেই স্থায়িত্বের সংঘর্ষে তাহারা টিকিতে পারে না। এ ক্ষেত্রে একের পক্ষে (অর্থাৎ এক বর্ণের পক্ষে) শক্তি সঞ্চয়দ্বারা স্থায়িত্বের নবীকরণ সম্ভব হয় সত্য; কিন্তু অপরের পক্ষে লাভের অঙ্ক সম্পূর্ণ শূন্য। বোধ হয়, এই প্রচ্ছন্ন অনিষ্টের বিষয় অবগত হইয়াই পরবর্ত্তীকালের সামাজিকগণ ইহার উচ্ছেদ সাধন করিয়াছিলেন।

আদিশূরের রাজত্বকাল হইতে বল্লাল সেনের সময় পর্য্যন্ত প্রায় ৩৫০ বৎসর কাল ধরিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ আভ্যন্তরিণ সমাজসংস্কার চলিতেছিল। এ সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে রাঢ়ী বারেন্দ্রের মধ্যে বিশেষ কোন বিভেদ ছিল বলিয়া মনে হয় না। তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্য পরবর্ত্তীকালের ঘটনা। এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণগণের সহিত কণৌজাগতগণের যৌন সম্বন্ধ চলিতে চলিতে ব্রাহ্মণগণ যেন কথঞ্চিৎ নিষ্প্রভ হইয়া পড়িতেছিলেন। রাঢ় দেশীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বহুল দুর্নীতির লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছিল।

কুবিবাহৈঃ ক্রিয়ালোপৈর্ব্বেদানধ্যয়নেন চ।
কুলান্য কুলতাং যান্তি ব্রাহ্মণাতিক্রমেন বৈ॥
অনৃতাৎ পারদার্য্যাচ্চ তথাঽভক্ষ্যস্য ভক্ষণাৎ।
অশ্রোত্র ধর্ম্মাচরণাৎ ক্ষিপ্রং পশ্যতি বৈ কুলম্॥
কূর্ম্মপুরাণ।

কুকর্ম্মের অবজ্ঞা ও সৎকর্ম্মের পুরস্কার দ্বারা সমাজের দোষ সংশোধন করা আবশ্যক বিবেচনায় ভূশূর-তনয় মহারাজ ক্ষিতিশূর বা ধরাশূর স্বীয় রাজ্যের রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কৌলীন্য মর্য্যাদা সংস্থাপন করিলেন। এবং কুলীনগণকে ৫৬ খানি গ্রাম প্রদান করিলেন।

"ক্ষিতিশূরেণ রাজ্ঞাপি ভূশূরন্য সুতেন চ।
ক্রিয়ন্তে গাঞি সং জ্ঞানি তেষাং স্থান
বিনির্ণয়াৎ॥"

বংশীবদন বিদ্যারত্ন।

বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণগণের মধ্যে তখনও কোন কুলমর্য্যাদাবিধি প্রদত্ত হয় নাই। শূর বংশীয় শেষ রাজা অযুশূর অপুত্রক অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিলে বিজয় সেন গৌড় বিজয় করেন। এই বিজয় সেনের পুত্রই প্রথিত-যশা বল্লালসেন।

সেন বংশীয় মহারাজ বল্লালসেন রাজ্যের এবং সমাজের উন্নতি-সাধনে মনোযোগী ছিলেন। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর রাঢ়ীয় সমাজের ন্যায় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজেও প্রভূত দোষ দেখিতে পাইলেন। সুতরাং সমাজকে সাধুজন-সম্মত আকার প্রদানে যত্নশীল হইলেন। (১১১৯ খ্রীষ্টাব্দ)। তিনি গণনায় রাঢ় ও বারেন্দ্রভূমে যথাক্রমে ৭৫০ ও ৩৫০ জন ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু মহারাজ বারেন্দ্রবাসী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ৫০ জন মগধে, ৬০ জন ভোট দেশে, ৬০ জন রভঙ্গ দেশে, ৪০ উৎকলে এবং ৪০ জন মোড়ঙ্গ দেশে প্রেরণ করিয়া মাত্র ১০০ জনকে বারেন্দ্র ভূমে রাখিলেন। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণকে কেন বিদেশে প্রেরণ করেন নাই, তাহার কোন সন্তোষজনক প্রমাণ নাই। তবে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের কৌলীন্য যে বল্লালের কীর্ত্তি নহে, একথা সত্য। (১)

বল্লালসেন ১০০ ব্রাহ্মণকে প্রথমতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন—কুলীন ও শ্রোত্রীয়।

জন্মনা ব্রাহ্মণঃজ্ঞেয় সংস্কারৈঃ দ্বিজ উচ্যতে।
বিদ্যয়া যাতি বিপ্রত্বং ত্রিভিঃ শ্রোত্রীয় লক্ষণম্॥

১০০ জন ব্রাহ্মণের মধ্যে ৮ জন কুলীন, ৮ জন সিদ্ধ শ্রোত্রীয় এবং অবশিষ্ট ৮৪ জন কষ্ট শ্রোত্রীয়। বারেন্দ্রকুলে যে ১০০ ঘর গাঞী দৃষ্টিগোচর হয়, তাহার অধিকাংশই এই সময়ে হইয়াছিল। তবে কেহ কেহ পরেও গাঞী হইয়াছিলেন

বিপ্রান্ একশত গৃহ বারেন্দ্রান্ গাঞি
সংযুক্তান্।
কৃত্বা বল্লাল সেনেন চক্র গুণ বিচারণম্॥

লঘুভারত।

তখন নয়টী গুণ থাকা কুলীন পদবীলাভের যোগ্যতা বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। যাহার এই নয়টি গুণ ছিল, তিনিই কুলীন, এই রাজসম্মান এবং সমাজ সম্মানলাভ করিতেন।

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠাতীর্থ দর্শনম।
নিষ্ঠাশক্তিঃ (১) তপো দানং নবধা
কুললক্ষনম্॥

এ রাজ-সম্মান সাধারণ রাজ-সম্মান নহে। বর্ত্তমান সময়ের Knighthood বা Raibahadurship হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। আবহমানকাল হইতেই ভারতে কোন ব্যক্তিগত উপাধি বা সম্মান প্রদত্ত হইলে তাহা বংশানুগতি হইয়া দাঁড়াইত। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল।

---

(১) রাঢ়ী কুলজ্ঞগণের মধ্যে "শান্তি" স্থলে "আবৃত্তি" পাঠ প্রচলিত।

(১) বরেন্দ্রেতু তদা সার্দ্ধ ত্রিশতাগ্র
প্রজন্মণাম্।
রাঢ়ায়াঞ্চ দ্বিজাশ্চাসন্ সার্দ্ধাস্তোধিশতানিচ॥
বারেন্দ্রবাসি বিপ্রাণাং মধ্যে চৈক শত দ্বিজাঃ।
বরেন্দ্রে রক্ষিতা রাজ্ঞা সদাচার পরায়ণাঃ॥
দ্বিশতাধিক পঞ্চাশৎ বারেন্দ্রাণাম্ দ্বিজন্মনাম।
পঞ্চাশৎ মগধে ষষ্টি র্ভোটে ষষ্টিঃ রভঙ্গকে॥
চত্বারিংশৎ উৎকলেচ মৌড়ঙ্গে হপি তথাঙ্কবাঃ।
দত্তা নৃপতিনা হর্ষং বল্লালেন মহাত্মনা॥

বরেন্দ্রকুলপঞ্জী।

অবশ্যই প্রথম প্রথম গুণ বিচার দ্বারাই কৌলীন্য বিচার হইত। কিন্তু কালক্রমে এ সম্মান বংশ বিশেষের উপর স্থায়ীভাবে সম্বদ্ধ হইয়া গেল। যাহা হোক, এই কৌলীন্য-প্রথা পরবর্ত্তী কালের যাবতীয় উন্নতি বা অবনতির সোপান স্বরূপ হইয়াছিল। বল্লালের কুল-বন্ধনের বহুবর্ষ পর রাঢ়ীকুলে দেবীবর ঘটক এবং বারেন্দ্রকুলে উদয়ণাচার্য্য ভাদুড়ীর (১) আবির্ভাব হয়। পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট নবগুণ যখন সম্পূর্ণ তিরোধান করিয়াছিলেন, তখন গুণহীন কৌলীন্যের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য দেবীবর মেল বন্ধন করিলেন এবং উদয়ণ করণ প্রথার প্রচার করিলেন।

প্রতিভাশালী উদয়ণাচার্য্য ভাদুড়ী স্বয়ং কুলীন ছিলেন। তখন কুলীন শ্রোত্রীদের মধ্যে বিবাহের আদানপ্রদানে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা ছিলনা। শ্রোত্রীয়গণও কুলীন কন্যা গ্রহণ করিতে পারিতেন। কিন্তু উদয়ণ ভাদুড়ী কুলীনের সামাজিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধির মানসে কতকগুলি নিয়ম প্রচলিত করেন। "গুণহীনে কৌলীন্যং কথং সংস্থাপ্যতে" এই কার্য্যে উদয়ণ তিনজন প্রসিদ্ধ শ্রোত্রীয়ের সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন। উদয়ণের সামাজিক নিয়মে শ্রোত্রীয়ের পক্ষে কুলীন কন্যা গ্রহণ সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ হয়। কুলীনেরও শ্রোত্রীয় কন্যা গ্রহণে যথেষ্ট প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হয়।

উদয়ণের নিয়মগুলির মধ্যে প্রথম, যাহারা কুলীন সমাজে থাকিবার অভিলাষী, তাহাদিগকে পরস্পর একটী করিয়া কুলজ করণ করিতে হইবে। অর্থাৎ কন্যা বা ভগিনীগণকে পিতার মৃত্যুর পর কুলীনঘরে বিবাহ দিয়া করণ করিতে হইবে। জ্যেষ্ঠ পুত্রই এই করণের অধিকারী এবং পিতা বর্ত্তমানে এ করণ হইতে পারে না। দ্বিতীয়, পরিবর্ত্ত মর্য্যাদা-কুলীনগণের বিবাহকালীন একটী আদানপ্রদান বিষয়ক করণ করিতে হইত। স্বগোত্রে এই করণ হইতে পারেনা এবং কন্যা বা ভগিনী না থাকিলেও এ করণ প্রথা চলিতে পারেনা। পূর্ব্বে এই নিয়মের অধীনে যাঁহাদের কন্যা বা ভগিনী না থাকিত, তাঁহাদের ভাগ্যে পত্নীলাভ ঘটিয়া উঠিত না। এই নিয়মের কঠোরতা অবলোকন করিয়া তাহেরপুরের রাজা কংশনারায়ণ কুশময় পাত্র বা কন্যার সহিত প্রকৃত পাত্র কন্যার করণ করিবার নিয়ম প্রচলিত করেন।

---

(১) উদয়ণাচার্য্য ভাদুড়ী ১১৭৬ খ্রীষ্টাব্দে কুলবন্ধন করেন। এই উদয়ণাচার্য্যই প্রসিদ্ধ কুসুমাঞ্জলী নামক গ্রন্থ প্রণেতা। তাঁহার পিতা বৃহস্পতি আচার্য্য বৌদ্ধগণের সহিত বিচারে পরাস্ত হইয়া প্রাণ-ত্যাগ করেন। তৎদৃষ্টে উদয়ণ বৌদ্ধ আচার্য্যগণের সহিত তুমুল বিচারে প্রবৃত্ত হন এবং অবশেষে বৌদ্ধযুক্তি সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন করিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশ করেন এবং পিত্রাবমাননার প্রতিশোধ লয়েন।

বেদজ্ঞো ব্রহ্মনিষ্ঠঃস আচার্য্যপদমাপ্তবান্।
বৌদ্ধাচার্য্যা জিমণিনা বিচার রণ মূর্দ্ধনি॥
বিজিতোঽবমানিতশ্চ বনং গত্বা মমারচ।
বৃহস্পতিসুতঃ শ্রীমান্ ভুবি বিখ্যাত মঙ্গলঃ॥
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় বৌদ্ধ বিধ্বংশ হেতবে।
খ্যাত উদয়ণাচার্য্যো বভূব শঙ্করা যথা॥
সন্দেশ পিতৃনাশস্য তথাপিতৃপরাভবম্।
বৌদ্ধনাং বিজয়ঞ্চৈব শ্রুত্বা জজ্ঞান মন্যুনা॥
ওতঃ কালেন কিয়তা বৌদ্ধান জিত্বা বিচারতঃ।
ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশায় চকার কুসুমাঞ্জলীম॥
স এব উদয়ণাচার্য্যো বৌদ্ধ বিধ্বংশ কৌতকী।

তৃতীয়,পূর্ব্বপ্রচলিত নিয়মানুসারে কুলীনগণ শ্রোত্রীয়ের কন্যা গ্রহণ করিতে পারিত। কিন্তু উদয়ণ-প্রবর্ত্তিত নিয়মে কোন কুলীন শ্রোত্রীয়ের কন্যা বিবাহ করিলে তাঁহাকে সেই সঙ্গে একটী করিয়া কুলীন কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে হইবে। আর শ্রোত্রীয়ের পক্ষে কুলীনের কন্যা গ্রহণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হইল।

এই নিয়ম তিনটীর মাত্র দ্বিতীয়টী পূর্ব্বরূপ শোধিত আকারে এখনও বর্ত্তমান আছে। অপর দুইটী বিলুপ্ত হইয়াছে।

কারণ ব্যতীত কোন কার্য্যই নিষ্পন্ন হয় না। পৃথিবীর অন্যান্য জাতির ন্যায় আমাদের হিন্দুসমাজেও যথেষ্ট দোষগুণ আছে। ইহার কোনটীই অকারণে উদ্ভূত হয় নাই। উদণাচার্য্য প্রণীত কুলীন বিষয়ক নিয়মগুলি শনৈঃআগত ধ্বংসের মুখ হইতে কুলীনকে রক্ষা করিয়াছে। হয়ত তিনি ঐ নিয়মগুলি প্রবর্ত্তিত না করিলে বাঙ্গালার মাটী হইতে কুলীন শ্রোত্রিয়ের পার্থক্য এতদিন উঠিয়া যাইত? সকল ব্রাহ্মণই এক সাম্যের পর্য্যায়ে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। প্রথমে নিয়ম দুইটীর দ্বারা কুলীনগণের পার্থক্য চিরদিনের জন্য দৃঢ় হইয়াছিল এবং ভবিষ্যতের যত "পঠি",মত না ও "থাক" গঠনের ক্ষেত্র রচিত হইয়াছিল। কুলীনগণ ইচ্ছা করেন নাই, কেহই এমত ইচ্ছা করে না যে, তাঁহাদের এতদিনের সাধনার সম্মান নষ্ট হইয়া যাইবে। আর তাঁহারা সমস্ত ব্রাহ্মণের সহিত মিশিয়া এক হইয়া যাইবেন। দ্বিতীয়তঃ যাঁহারা যথার্থ গুণসম্পন্ন নিষ্ঠাবান কুলীন, তাঁহারা আচারহীন কুলীন বা শ্রোত্রীয়গণকে আপন পর্য্যায়ে স্থান দিবেন কেন? যাঁহারা স্খলিতপচার, তাঁহারা উন্নতির চেষ্টা করুন, সর্ব্বসম্মতি ক্রমে সমাজে গৃহীত হইবেন; কিন্তু অমিতাচারী হইলে তিনি সমাজের সম্মানের অধিকারী হইবেন কেন? মানুষের দোষ স্বভাবগত; সতর্কতা অবলম্বন না করিয়া বাস করিলে কত প্রকার প্রবৃত্তি বিকৃতি, চরিত্রহানি প্রভৃতি দোষ আসিয়া সাধুগণ-আচরিত পথ হইতে মানুষকে স্খলিত করে। কিন্তু সমাজ বিনা আপত্তিতে তাহা সহ্য করিবে কেন? যাহারা আপন ত্রুটী স্বীকার করিয়া শোধরাইবার চেষ্টা করে, সমাজ অবশ্যই তাহাদিগকে আশ্রয় দিবে। অভিমানের তাড়নায় অনেকেই এরূপ ত্রুটি স্বীকারের হীনতায় সম্মত হয় না। তাহাদের দল প্রবল হইলে তাহারা স্বতন্ত্র সমাজ বাঁধিবেনা কেন? এইরূপে বারেন্দ্র কুলীনের "পঠি" "থাক" ও "মতে"র সৃষ্টি হইয়াছে। বারেন্দ্রকুলে কাপোৎপত্তিও এই প্রকারে ঘটিয়াছিল।

উদয়ণের নিয়ম কুলীন সন্তানগণের বিবাহ কার্য্য অপেক্ষাকৃত সহজ এবং সুসাধ্য করিয়া তুলিয়াছিল। কন্যার পিতা কন্যার বিবাহ দিতেছে. কিন্তু বরের পিতার কন্যা থাকিলে আবার কাহার দ্বারস্থ হইবে? সুতরাং উভয় পক্ষই যদি এক অনুষ্ঠানে দুইটী বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন, তাহাতে

কুল্লুক ভট্টমাশ্রিত্য ভট্টাখ্যং ময়ূরং তথা॥
মঙ্গলো সেতি বিখ্যাতং শ্রোত্রিয়ং শুদ্ধ বংশজম্।
কুল গৌরব রক্ষার্থং কৃতবান্ কুলীনেষু চ।
করণং পরিবর্ত্তঞ্চ তিলকং শ্রোত্রীয়েষু চ॥
ভাদুড়ী বংশাবলী।

মন্বর্থ মুক্তাবলী প্রণেতা কুল্লুক ভট্ট, ময়ূর ভট্ট এবং মঙ্গল ওঝা, এই তিনজন ব্যক্তি উদয়ণের সহায়তাকারী ছিলেন।

ক্ষতি কি? এ নিয়মে পুত্র কন্যার বিবাহের চিন্তায় মানুষকে বিবশ এবং অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলে না। কেহই কাহারও নিকট দাসের ন্যায় অপরাধী হইয়া থাকে না। বাধ্যতা ও সৌজন্য দ্বারা উভয় পক্ষ সমানভাবে বদ্ধ। কিন্তু ইহাতে যে অসুবিধা ছিল, তাহা রাজা কংসনারায়ণ কুশময় কন্যা ও পাত্রের করণ প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়া দূর করিয়াছিলেন।

তৃতীয় নিয়মটীই সংস্কারক প্রবরের প্রতিভার বিশেষ পরিচয় প্রদান করেন। ব্রাহ্মণগণ যখন সর্ব্বপ্রথম বঙ্গদেশে আগমন করেন, সেই সময় হইতেই এদেশীয় ব্রাহ্মণগণ কন্যা গ্রহণ করিতেন। বল্লালসেনের সময় কুলীন শ্রোত্রীয় শ্রেণী ভাগ হইলেও শ্রোত্রীয় কন্যা কুলীন পাত্রের বিবাহ যোগ্যা ছিল। এ প্রথায় হস্তক্ষেপ না হয়, অথচ কুলীনকুলের ভাবী অনিষ্টের কোন আশঙ্কা না থাকে—এই উদ্দেশ্যেই নিয়মটী প্রচলিত করা হইয়াছিল। শ্রোত্রীয়গণ চিরানুসৃত নিয়মে কুলীনে কন্যা সম্প্রদান দ্বারা ধন্য হইয়া "সিদ্ধি" লাভ করেন এবং কন্যাদায়ের চিন্তাকে অপেক্ষাকৃত লঘু জ্ঞান করেন। কারণ এরূপ করিলে আর তাহাদের পাত্রাভাব থাকিবে না। কিন্তু অপরদিকে কুলীনগণের এক বিপদের সম্ভাবনা। সকল পাত্রই শ্রোত্রীয়ের গৃহে বিবাহ করিলে কুলীনগণের নিজ কন্যার বিবাহের উপায় কি? তাই উদায়ণাচার্য্য এখানে একটী কৌশল অবলম্বন করিলেন; তিনি ব্যবস্থা করিলেন যে, প্রত্যেক শ্রোত্রীয় কন্যা-গ্রহণকারীকে এক একটী কুলীনের কন্যাকে বিবাহ করিতে হইবে। এই নিয়মে কুলীনগণ উপস্থিত পাত্রাভাবজনিত কন্যাদায়ের সমস্যা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন বটে; কিন্তু এক সময়ে যে 'বহুবিবাহ' বঙ্গদেশ উৎসন্ন করিতে বসিয়াছিল, তাহার অঙ্কুর এখানেই সূচিত হয়। খ্রীষ্টীয় সভ্যতার প্রভাবে ও কালমাহাত্ম্যে বঙ্গের 'বহুবিবাহ' প্রশমিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কুলীনের কন্যা বিবাহে বিড়ম্বনার আর অবধি নাই। বাধ্যতামূলক বিবাহ উঠিয়া গিয়াছে, কাজেই উদয়ণের আকাঙ্ক্ষা বাস্তব আকার পরিগ্রহ করিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, এ নিয়মটীর যে অন্য উদ্দেশ্য ছিল না, তাহা নহে। পত্নীর প্রভাবেই সংসার গঠিত হয়। শ্রোত্রীয়ের কন্যা কুলীন-গৃহে আসিবে; কুলীনের চিরশ্লাঘ্য আচার নীতি নষ্ট করিয়া ফেলিবে। যদি কুলীন সপত্নী থাকে, সেরূপ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। কুলীনের মেয়ে সে যে 'বড় ঘরের' মেয়ে, তাহার প্রভাবে শ্রোত্রীয়ের মেয়ে মাথা তুলিতে পারিবে না। সুতরাং শ্রোত্রীয়ের কন্যা কুলীন সংসারে প্রবেশহেতু যে আচারহীনতা, তাহা এইরূপে নিবারিত হইবে; কুলীনের যে শীলমান, তাহাই স্থায়ীভাবে থাকিবে। উদয়ণ একথাও ভাবিয়া থাকিবেন।

এখানেই শ্রোত্রীয়গণ একটু প্রবঞ্চিত হইলেন। তাঁহারা আপনার সামাজিক দীনতা নিবন্ধন উদয়ণ-প্রবর্ত্তিত নিয়মের দোষানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন নাই। সে কারণ তাঁহারা "তিলকধারণের" অধিকার পাইয়াই তুষ্ট ছিলেন এবং উদয়ণকে বরং সহায়তা করিয়াছিলেন। শ্রোত্রীয়ের মধ্যেও অসংখ্য প্রতিভাশালী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, কেহই উদয়ণ-প্রবর্ত্তিত নিয়মের প্রচ্ছন্নবিষ অনুভব করিতে পারেন নাই। নচেৎ এই নির্ব্রাহ্মণকর নিয়মের প্রতিকূলে কেহ না কেহ অবশ্যই দণ্ডায়মান হইতেন। মমতাহীন অসুবর্ণ

বিবাহ যে অনিষ্টকর, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এই কারণেই শ্রোত্রীয় কুমারের জন্য ব্রাহ্মণ সমাজে চিরকালই পাত্রীর অভাব অনুভূত হইয়া আসিতেছে। বহু শ্রোত্রীয় শুধু পাত্রীর অভাবে চিরজীবন অবিবাহিত থাকিয়া চরিত্রহীন জীবনযাপন করিয়াছে, এবং পরিশেষে নির্ব্বংশ হইয়া পৃথিবীর সহিত সমস্ত সম্বন্ধ চুকাইয়া চলিয়া গিয়াছে। শ্রোত্রীয়গণের মধ্যে একান্ত অসহায় এবং দরিদ্রের কন্যাই শ্রোত্রীয়ের গৃহে গমন করিত; আবার সঙ্গতশালী শ্রোত্রীয়কে বরপণের পরিবর্ত্তে কন্যা ক্রয় করিতে হইত। অসমর্থ পক্ষে নির্ব্বংশই দেশাচার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ৯২ জন শ্রোত্রীয়ের বংশধর ৮০০ শত বৎসরের বৃদ্ধিতেও ৮ জন কুলীনের সন্তানের সমান হইবে কিনা সন্দেহ। এই ত উদয়নের সমাজ-সংস্কার।

বর্ত্তমানে পণ-প্রথার বিরুদ্ধে যে সমরায়োজন চলিতেছে; অসবর্ণ ক্ষমতাহীন ব্রাহ্মণবিবাহই এ পণ-প্রথার কারণ। কুলীণের উক্তরূপ সমাদরই বঙ্গের ব্রাহ্মণ-সমাজে পণ-প্রথার সৃষ্টি করিয়াছে। এবং এই পণপ্রথা যে বর্ত্তমানে অসম্ভব পরিণতি লাভ করিয়াছে, কুলীণের তথা উদয়নের নিয়মই তাহার একমাত্র কারণ। শ্রোত্রীয়ের কন্যা হীন গৃহের কন্যা—"ছোটলোকের মেয়ে" এবং এই ছোটলোকের মেয়েরা ননদ শাশুড়ীর ঘর করিতে আসে। মানুষের জীবনে ভুল, প্রমাদ, আবাল্য ত্রুটি বড় একটা বেশী আশ্চর্য্যের কথা নয়। বালিকা-বধূ একটা ভুল প্রমাদ করিল, তাহাতে সে আবার ছোটলোকের মেয়ে! তাহার আর মার্জ্জনা কোথায়? ঠিক এইরূপ স্থলেই ননদ-শাশুড়ী-গঞ্জনা সমাজে প্রবেশ লাভ করিল। তেলে জলে মিশ খাওয়ান' বড়ই কঠিন কথা। এ ক্ষেত্রে ননদিনীকে 'রায়বাঘিনী' এবং শাশুড়ীকে 'বৌকাটকী' হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। জনকজননীর হৃদয় কন্যার নিপীড়ন দর্শনে বিগলিত হইল না কেন? প্রতিকারের অন্য উপায় নাই। 'পণ' 'তত্ত্ব' 'ননদ পেটিকা' দিয়া শাশুড়ী ননদের মন গলাইয়া দিলে যদি কন্যার দুঃখের ও যন্ত্রণার লাঘব হয়। কণৌজীগণ বঙ্গদেশে আসিলেন; বঙ্গদেশের কন্যা গ্রহণ করিলেন। কোথায় হিন্দুস্থান আর কোথায় বঙ্গদেশ? একের আচার অন্যের মনঃপুত হইবে কেন? জননী ভগিনী স্ত্রী বুদ্ধির বশীভূত। তাহারা আপনাদের অনুরূপ আচার, ব্যবহার বসন ভূষণ, কথাবার্ত্তা না দেখিলে নবাগতার প্রতি সন্তুষ্ট হইবে কেন? শ্বশুর শাশুড়ী প্রভৃতি দশ জনের সংসার। পুত্রকে সংসারে থাকিতে হইলে পুত্রবধূকেও সমস্ত পীড়ন ও অসুবিধা সহ্য করিতে হইবে। বাঙ্গালার সংসারে ননদ শাশুড়ীর গঞ্জনায় কথা যে একটা প্রবাদ বাক্যের মত আছে, তাহা বোধ হয় এইরূপে সৃষ্ট হয়। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা প্রাপ্ত ও স্বাধীনচেতা ইংরাজগণ পর্য্যন্ত যদি ভারতবর্ষীয়গণের পাণিগ্রহণ করে, তবে তাহাদের নিগ্রহের পরিসীমা থাকেনা এবং সন্তানগণকে ফিরিঙ্গি আখ্যা প্রাপ্ত হইতে হয়, তখন বঙ্গে প্রথমাগত ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও এরূপ ঘটিলে, তাহাতে বিচিত্রতার কিছুই নাই।

অনুমান হয়, আমাদের দেশে অষ্টমে গৌরীদানের ব্যবস্থা থাকিলেও উদয়নের বাধ্যতা-মূলক বিবাহ-নীতিই বাল্য বিবাহকে সংক্রামক করিয়া তুলিয়াছিল। পুণ্যের প্রত্যাশা অপেক্ষা বাধ্যতাই বাল্যবিবাহের সহায়তা করে। তাই আমরা প্রথমেই

লোকমান্য বালগঙ্গাধর টিলক।

U. RAY & SONS. CALCUTTA
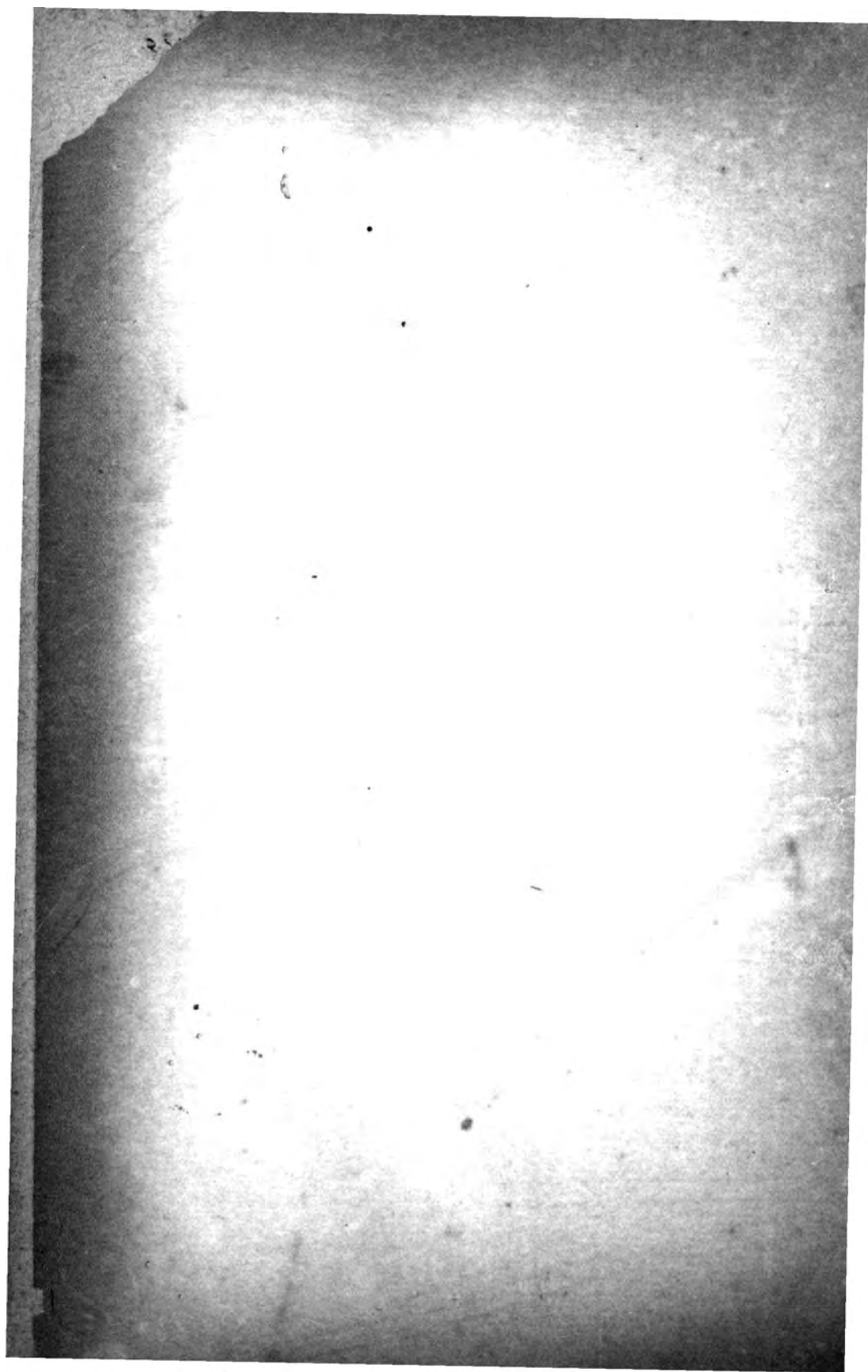
উল্লেখ করিয়াছি যে, কোন কার্য্যই অনাবিল মধু বা কেবলমাত্র বিষ প্রদান করেনা। "বিদ্বদ্ভিঃ সেবিতঃ সদ্ভি নিত্যমদ্বেষ রাগিভিঃ"। ব্রাহ্মণগণের পথ অনুসরণ করিয়া অপর সকল হিন্দুগণও চলিয়াছিল এবং চলিতেছে। সুতরাং ব্রাহ্মণ-সমাজের ধ্বংসের তরঙ্গ অন্য সমাজেও পূর্ণভাবে প্রবেশ করিয়াছিল এবং তাহারাও সে সকল ফলভোগ করিয়াছে। আমরা কৌলীন্যের দোষোদ্ঘাটন অজুহাতে অসবর্ণ বিবাহের গুণকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হই নাই। কিন্তু মনুষ্যত্বহীনকরী অঘটন-ঘটন-পটীয়সী সমাজনীতি কোন মতেই সমর্থিত হইতে পারে না। অধিকাংশ সমাজ যে নীতি অবলম্বন করে, সেই নীতিই দেশময় হইয়া যায়। আজ এই সামাজিক অবসাদ এবং জাতীয় সঙ্কটের দিনে আমাদের বর্ণস্কুদ্রত্ব হইতে মুক্ত হইয়া উদারতার সঞ্জীবন বায়ুসেবন করা প্রয়োজন। প্যাটেল মহোদয় যদি অসবর্ণ বিবাহের আইনের পরিবর্ত্তে সবর্ণ বিবাহের একটী আইন প্রণয়নের চেষ্টা করিতেন, তবে দেশের সময়োচিত অভাব মোচন হইত।

বাঙ্গালায় বেদ ছিলনা, মহারাজ আদিশূর বাঙ্গালায় মানবের সেই চিরবরেণ্য বেদ-ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য প্রাণপাত করিয়া গেলেন, আর বাঙ্গালা লাভ করিল এক অভিনব সামগ্রী। এডাম (Adam) জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিলেন, আর পাইলেন, অজ্ঞানতা ও "জন্মজরা ব্যাধি মৃত্যু হাহাকার।" বাঙ্গালায় কাব্য, ব্যাকরণ, স্মৃতি, ন্যায়, মীমাংসার স্থান হইয়াছে, কিন্তু স্থানের অকুলন হইল শুধু স্বয়ম্ভব বেদ-ব্রহ্মের। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব বেদের শেষ আশারও অবসান করিয়াছেন। স্থিতিশীল হিন্দু মূলে ভুল করিয়া বেদের বদলে "বিনয় বিন্তা" লাভ করিয়া 'টাক্‌ডুবাডুব' বাজাইলেন। কিন্তু তাহাও আবার কোথায় মিলাইয়া গেল। সংশ্রাদ্ধ ধরিয়া আমরা কেবলই "পঠির" পর "পঠি" বাঁধিয়া এবং "মতের" কোদালী দিয়া "থাকের" পর "থাক" কাটিয়া মুক্তির স্বর্ণ সোপান রচনা করিতেছি—কিন্তু মুক্তি কোথায়?

শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র চৌধুরী।

অকৃত্রিম দেশ-নায়ক মহাত্মা বালগঙ্গাধর তিলক।

জন্ম—২৩শে জুলাই, ১৮৫৬ খ্রীঃ।

মৃত্যু—৩১শে জুলাই, শনিবার, ১৯২০, ১৫ই শ্রাবণ, ১৩২৭।

ম্যাট্‌সিনির জীবনী-লেখক লিখিয়াছেন—

"I have said that it had been his intention not to enter Rome; that he desired to see her no more, rather than to see her profaned by monarchy."

* * * *

"His desire to accomplish this induced him to cross the Alps at a season extremely dangerous to one of health so frail. He was seized with acute pleurisy; of which he died at Pisa on the 10th of March 1872." "His last words were of his country, as ye yielded up a life that had been governed by what he himself has called "the sacred, inexorable, dominant idea of

duty," a life which was the type of "the one, pure, sacred, and efficacious virtue, sacrifice; halo that crowns and sanctifies the human soul."

His body was carried across the Appenines to Genoa in a species of triumphal procession, and eighty thousand of his countrymen followed the remains of him whom, but a few months before, while the noble heart still beat warm with love towards them, they had allowed to be arbitrarily imprisoned by the King who unworthily wears the crown of that Italy, which, but for Mazzini, would have remained "a mere geographical expression"

* * * *

"Here, symbolised, is the history of Mazzini; the history of the Martyrs of humanity from the days of Jessus to our own."

ম্যাট্‌সিনির সংক্ষিপ্ত জীবনী-লেখকের উপরোক্ত কথাগুলি এমন এক পুণ্যশ্লোক মহাত্মার প্রতি প্রযুজ্য, যাহার তুলনা এই ভারতে আর কুত্রাপি মেলে নাই। তিনি এদেশের অমর-সন্তান লোকমান্য মহাত্মা বালগঙ্গাধর তিলক। বিগত ৩১শে জুলাই, শনিবার, ১৯২০, ১৫ই শ্রাবণ, ১৩২৭, রাত্রি, ১২টা ৪০ মিনিটের সময় দেহ রক্ষা করিয়া তিনি ভারতবর্ষের প্রাণে মহা শোকপ্রবাহ প্রবাহিত করিয়াছেন। তাঁহার তুলনা, এই ভারতে, কেবল তিনিই।

২৩শে জুলাই তিলকের জন্ম দিন ছিল। গত ২৩শে জুলাই শুক্রবার তিনি ৬৬ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন, সেইদিনে তাঁহার জন্মোৎসব সম্পাদন করিবার জন্য তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে কোলেবা লইয়া গিয়াছিলেন। উৎসবান্তে তিনি বোম্বাই পৌছিয়া সর্দ্দার-গৃহ নামক হোটেলে গমন করেন এবং জ্বর রোগে আক্রান্ত হন। বোম্বাইর সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ তাঁহার দেহ পরীক্ষা করিয়া বলেন, তাঁহার নিমোনিয়া হইয়াছে, হৃদযন্ত্রও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। গত পূর্ব্ব সোমবার ২৬শে জুলাই রোগাক্রমণের তৃতীয় দিনেই চিকিৎসকগণ বলেন, শ্বাসযন্ত্রের সমুদয় স্থানে শ্লেষ্মা জন্মিয়াছে, জীবনের আশা নাই। শুক্রবার দিন তাঁহার অবস্থা একটু ভাল হইল। তিনি সংজ্ঞাশূন্য ও ঘোর বিকারগ্রস্ত হইয়াছিলেন, সেদিন একটুকু জ্ঞান হইল। রাত্রিতেও নিদ্রা হইল। শনিবার প্রাতে তারযোগে এই সংবাদ প্রেরিত হইল, তিলকের জীবনের আশা হইয়াছে। কিন্তু নির্ব্বাণের পূর্ব্বে দীপ যেমন প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে, তিলকের অবস্থাও সেইরূপ হইয়াছিল। শনিবার অপরাহ্নে নানা দুর্লক্ষণ দেখা দিল। রাত্রি ৯টার সময় তিনি ক্রমে অবসন্ন হইতে লাগিলেন, রাত্রি ১২টা ৪৫ মিনিটের সময় তাঁহার অমর আত্মা নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া অনন্তধামে চলিয়া গেল।

গ্যারিবল্ডি, ম্যাট্‌সিনির মৃতদেহের প্রতি ইতালীর জনসাধারণ যে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিল, মহাত্মা তিলকের প্রতিও ভারতের নরনারী সে প্রকার সম্মানপ্রদর্শন করিয়া "বীরপূজার" মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন বলিয়া আমরা মহা গৌরব অনুভব করিতেছি। মহাত্মা শিবনাথের মৃতদেহের প্রতি ব্রাহ্মসমাজের নরনারী যে সম্মান দেখাইতে পারেন নাই, এবং বিদ্যাসাগরের প্রতি কলিকাতার নরনারী যে কৃতজ্ঞতা দেখাইতে পারেন নাই, তিলকের প্রতি সে সম্মান

প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়া বাস্তবিকই আমরা গৌরবে স্ফীত হইয়াছি। ক্ষুদ্র-চেতা ষ্টেটস্‌-ম্যান-সম্পাদক যে বিষই উদ্গীরণ করুন না কেন, ম্যাজিষ্ট্রেট বা দাসত্ব-গৌরবমণ্ডিত কোন কোন স্কুলের হেড মাষ্টার ও কলেজের প্রিন্সিপালগণ তিলক-শ্রাদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য ছাত্রদের প্রতি কঠোর বিধান করিলেও, মহাত্মা তিলক এদেশের এমন একজন অমর সন্তান, যাঁহাকে পরিম্লান করিতে কেহই সমর্থ হইবে না। উনবিংশ শতাব্দীর অত্যাচারিত ইতালীর ম্যাট্‌সিনি বিংশ শতাব্দীর ভারতের নিষ্পেষিত তিলকে পুনরুত্থিত হইয়াছিলেন। ধন্য জীবন, ধন্য স্বার্থত্যাগ, ধন্য দেশানুরাগ। তিলক স্বার্থত্যাগ ও দেশানুরাগের অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ।

তাঁহার দেশানুরাগে কুটিলতা ছিল না তাঁহার মতে জটিলতা ছিল না, তাঁহার আচার ব্যবহারে আবিলতা ছিল না। তিনি সদা উজ্জ্বল, সদা সরল, সদা অকপট দেশনায়ক ছিলেন।

দেশের সেবা করিতে করিতে তাঁহাকে যে কি কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহা অল্পবিস্তর পরিমাণে সকলেই জানেন, আমরা সংক্ষেপে "সঞ্জীবনী" হইতে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

ম্যাট্‌সিনির ন্যায় বাল্য হইতেই স্বদেশানুরাগে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, আজীবন তাহারই সেবা করিয়াছিলেন, ভয়ভ্রূকুটিতে কখনও লক্ষ্যচ্যুত হন নাই। অষ্ট্রিয়া যেমন ম্যাটসিনের ভয়ে কম্পিত, তিলকের ভয়েও তেমনি গভর্ণমেণ্ট বিচলিত হইতেন। বুঝি বা সেইজন্যই তাঁহাকে "Father of unrest বলা হইয়াছে।

"দুর্জ্জয় শক্তি লইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, পৃথিবী সে শক্তির বেগ সহিতে না পারিয়া তাঁহাকে নিষ্পেষিত করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াছে। ভারতে লাঞ্ছিত লোকের সংখ্যা কম নহে, কিন্তু তিলকের মত লাঞ্ছনা আর কাহারও সহিতে হয় নাই।

১৮৮০ কি ৮১ খ্রীঃ মিঃ আগরকর প্রমিঃ তিলক মহারাষ্ট্রী ভাষায় "কেশরী" ও ইংরেজী ভাষায় "মারহাট্টা" নামক সংবাদ পত্র প্রকাশ করেন। মিঃ চিপলঙ্কার নামক একজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার 'আর্য্য-ভূষণ' নামক এক মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেই যন্ত্রে ঐ দুই সংবাদ পত্র মুদ্রিত হইত। সংবাদ পত্রের তিনজন পরিচালকই যুবক, তিনজনই স্বদেশপ্রেমিক, তিনজনই নির্ভীক। সে সময়ে কোলহাপুরের মহারাজা শিবাজিরাও নাবালক। কোলহাপুর রাজ্য গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীন, মিঃ বার্ডে নামক এক ব্যক্তি গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ঐ রাজ্যের কারবারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি মহারাজের সহিত দুর্ব্ব্যবহার করিতেন। কেশরী ও মারহাট্টায় কারবারীর দুষ্ক্রিয়ার তীব্র সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। কারবারী মানহানির মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। মোকদ্দমা শেষ হইবার পূর্ব্বেই চিপলঙ্কার ধরাধাম হইতে প্রস্থান করেন। তিলক ও আগরকরের ৪ মাসের জন্য বিনাশ্রমে কারাদণ্ড হয়। তিলকের বয়স তখন ২৫ কি ২৬ বৎসর। এই বয়সেই কারাবাসের ক্লেশ ভোগ করিতে আরম্ভ করেন।

ইহার ১৬ বৎসর পর তাঁর দ্বিতীয়বার কারাদণ্ড হয়। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মারহাট্টাদের প্রাণহীন জীবনে সঞ্জীবনী শক্তির সঞ্চার করিবার জন্য শিবাজি উৎসব আরম্ভ করেন। শিবাজি রায়গড়ে যেদিন রাজ উপাধি গ্রহণ

করেন, সেই দিনই উৎসব আরম্ভ হয়। উৎসবের সময় প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা, হৃদয়-উন্মাদক সঙ্গীত হইয়াছিল—সহস্র লোকের প্রাণে জাতীয় ভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল। ১৩ই জুন উৎসব হইল, ১৮ই জুন উৎসবের বিবরণ ও সঙ্গীত কেশরীতিতে প্রকাশিত হয়। তখন বোম্বাই ও পুণাতে প্লেগ আরম্ভ হওয়ায় প্লেগাক্রান্ত নরনারীকে আটকখানায় বদ্ধ করিয়া রাখা হইতেছে, সর্ব্বত্র মহা ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছে। র‍্যাণ্ড ও লেফ্‌টেনাণ্ট আয়ার্ষ্ট প্লেগ সংক্রান্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। ২২শে জুন কোন ব্যক্তি তাঁহাদিগকে হত্যা করে। গভর্ণমেণ্টের মনে এই ধারণা হইল যে, কেশরীতে যে সঙ্গীত ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা পাঠ করিয়া কোন ব্যক্তি র‍্যাণ্ড ও আয়ার্ষ্টকে হত্যা করিতে প্রবুদ্ধ হইয়াছিল। মিঃ তিলকের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মোকদ্দমা উপস্থিত করা হয়। তিলক রাজদ্রোহের অপরাধে দেড় বৎসরের জন্য কারাগারে গমন করেন। সেই সময় বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি কয়েক সহস্র টাকা সংগ্রহ করিয়া কলিকাতার ব্যারিষ্টার মিঃ পিউকে তিলকের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য বোম্বাই পাঠাইয়াছিলেন। কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে বিলাতে আপীল হইয়াছিল, কিন্তু আপীলে কোন ফল হইল না। তখন ভারতবন্ধু অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার ও উইলিয়ম হণ্টার জীবিত ছিলেন। তাঁহারা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নিকট দয়া ভিক্ষা করিয়া এক দরখাস্ত প্রেরণ করেন। মহারাণীর দয়ায় ১৮৯৮ খ্রীঃ ৬ই সেপ্টেম্বর প্রায় এক বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করিয়া তিলক মুক্তিলাভ করেন। তিলক যখন জেল হইতে বহির্গত হইলেন, তখন তাঁহার বয়স ৪২ বৎসর, এক বৎসরকাল কারাক্লেশ ভোগ করাতে তাঁহাকে ৫০ বৎসের বৃদ্ধ বলিয়া মনে হইয়াছিল।

তৃতীয়বার তাঁহার কেন কারাদণ্ড হইয়াছিল, এখন তাহাই বলিতেছি। পুণাতে শ্রী বাবা মহারাজ নামক এক ধনী ও বনিয়াদি সর্দ্দার ছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে মিঃ তিলককে তাঁহার সম্পত্তির একজিকিউটারের পদে নিযুক্ত করেন। বাবা মহারাজের মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী তাই মহারাজ তিলকের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেন যে, তিনি তাঁহার অর্থ তসরূপ করিয়াছেন।

১৯০১ খ্রীঃ তিলকের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা আরম্ভ হয়, জেলার জজ মিঃ এষ্টন জাল, জুয়াচুরি, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রভৃতির জন্য তিলককে ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ক্লেমেণ্টসের বিচারে তিলকের আঠার মাসের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। সেসন জজ মিঃ লুকাস বলেন, তিলক কোন অসদুপায় অবলম্বন করেন নাই, তবু তিনি দণ্ড রহিত করিলেন না, কেবল ১৮ মাসের স্থলে ৬ মাসের কারাদণ্ডের হুকুম দিলেন। হাইকোর্টে আপীল হইল, আপীলের ফলে তিলক মুক্তি পাইলেন। মুক্তি পাইলেন বটে, কিন্তু প্রায় ৪ বৎসরকাল দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমার দুশ্চিন্তায় তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল।

ইহার পর ৪ বৎসর কাটিয়া গেল। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গে ভীষণ আন্দোলন হইতেছিল। বোমার আঘাতে মজঃফরপুরের দুইজন ইংরেজ মহিলা প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। খুদিরাম বসুর তজ্জন্য ফাঁসী হয়। কেশরীতে সেই সময় কতগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। গবর্ণমেণ্টের ধারণা হইল যে, কেশরী

বোমা মারার সমর্থন করিতেছেন। তিলক ধৃত হইলেন। ১৩ই জুলাই হাইকোর্টে তাঁহার মোকদ্দমা আরম্ভ হয়। তিলক উকীল ব্যারিষ্টার নিযুক্ত না করিয়া স্বয়ং আত্মপক্ষ সমর্থন করেন। তিনি ক্রমান্বয়ে ২১ ঘণ্টা কাল আপনার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিয়া বক্তৃতা করেন। অষ্টমদিনে জজ মিঃ দাবর জুরীকে মোকদ্দমার তত্ত্ব বুঝাইয়া দেন। ৭ জন ইংরেজ ও ২ জন পার্শী জুরীর আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহাদের ৭ জন তিলককে দোষী সাব্যস্ত করিলেন। পার্শী জজ মিঃ দাবর তিলকের ৬ বৎসরের দ্বীপান্তর বাসদণ্ড ও ১০০০ টাকা জরিমানা করিলেন। গবর্ণমেণ্ট দয়া করিয়া দ্বীপান্তর বাসদণ্ডের পরিবর্ত্তে ৬ বৎসর কাল তাঁহাকে ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত মান্দালয়ের কারাগারে আবদ্ধ রাখিতে হুকুম দিলেন, জরিমানা মাপ হইল। তিনি বিনা শ্রমে কারাদণ্ড ভোগ করিতে লাগিলেন। সুদীর্ঘ ৬ বৎসরের কারাবাসান্তে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে তিলক স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন।

তিলক ক্রমে ৪ বার দণ্ডিত হইলেন, তবু তাঁহার নিগ্রহের অন্ত হইল না। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নানা স্থানে গমন করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট ঐ বক্তৃতাগুলি রাজদ্রোহ উত্তেজক বলিয়া মনে করিলেন। পুনার ম্যাজিষ্টেট জুলাই মাসে তিলকের উপর এই পরোয়ানা জারী করিলেন,—তুমি তোমার সচ্চরিত্রতার জন্য জামীন দিবে না কেন, তাহার কারণ দর্শিত। তিনি পরোয়ানা জারী করিলেন, তিনিই জজরূপে এই হুকুম দিলেন যে তিলককে ৪০ হাজার টাকা জামীন স্বরূপ জমা দিতে হইবে! তিলক ৪০ হাজার টাকা জমা দিলেন। হাইকোর্ট এই নির্দ্ধারণ করিলেন, তিলকের বক্তৃতাগুলি রাজদ্রোহকর নয়। সুতরাং জমার টাকা তিলক ফিরাইয়া পাইলেন। হাইকোর্টের বিচারে তিনি নিষ্কৃতি পাইলেন বটে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে নির্দ্দোষ মনে করিলেন না।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসেই গবর্ণমেণ্ট ভারত-রক্ষা-আইনের বিধান অনুসারে তাঁহার উপর এই পরোয়ানা জারী করিলেন যে,তিনি পঞ্জাব ও দিল্লী যাইতে পারিবেন না। যে দিন এই পরোয়ানা জারী করা হয়, সে দিন তাঁহার একষষ্টিতম জন্মোৎসব ছিল। সে দিন এক দিকে গবর্ণমেণ্টের নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হইল, অপর দিকে তাঁহার বন্ধু বান্ধব তাঁহাকে এক লক্ষ টাকা ও অভিনন্দন পত্র প্রদান করিলেন।

অতঃপর ষষ্ঠ লাঞ্ছনার কথা বলিয়া তাঁহার জীবনের দুঃখের কাহিনী শেষ করিতেছি।

সার ভেলেটাইন চিরল লণ্ডনের টাইমস্ সংবাদ পত্রের একজন প্রসিদ্ধ লেখক। তিনি এমন ক্ষমতাশালী, যখন ভারতবর্ষে আইসেন, তখনই বড় লাট ছোট লাটদের বাড়ীতে অবস্থিতি করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া থাকেন। সার ভেলেণ্টাইন তাঁহার একখানি পুস্তকে তিলককে রাজদ্রোহী বলিয়া গালি দিয়াছিলেন। তিলক তাঁহার বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের আদালতে মান হানির নালীস করিয়াছিলেন। এই মোকদ্দমা চালাইবার জন্য তিনি ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। এই মোকদ্দমার জন্য তাঁহার প্রায় ৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছিল,কিন্তু পরিণাম ফল কি হইয়াছিল? সার ভেলণ্টাইন কোন অপরাধ করেন নাই, ইহাই সাব্যস্ত হইয়াছিল।"

স্বদেশ-সেবার জন্য এমন নির্য্যাতন

এদেশে আর কেহ সহ্য করিয়াছেন বলিয়া আমরা শুনি নাই। যেমন মাটসিনি, তেমনিই তিনি দেশের জন্য জীবনটাকে তিল তিল করিয়া বলি দিয়া দিয়াছেন। তাঁহাকে ফিরাইবার জন্য কত চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু তিনি অন্যান্য নেতাদের ন্যায় শত প্রলোভনেও ফিরেন নাই। ফিরিয়া দাঁড়াইলে আজ তিনি লাট-গিরির সম্মান ও কত উপাধি পাইতেন, কিন্তু তিনি দরিদ্র দেশের দরিদ্রদিগের ভাগ্যের সহিত আপন ভাগ্য সংযুক্ত করিয়া আজীবন কেবল নির্য্যাতন সহ্য করিয়াই গিয়াছেন। নব-রাজতন্ত্রে আত্মসমর্পণ করিতে অনিচ্ছুক, ম্যাটসিনি প্লুরিসিতে জীবন পরিত্যাগ করিলেন; নব-রাজতন্ত্র-নিয়ম-নিগড়ে আবদ্ধ হইতে অনিচ্ছুক তিলক নিমোনিয়া রোগে প্রাণত্যাগ করিলেন। যেমন বাল্যে প্রেমের দীক্ষায়, যৌবনে ও প্রৌঢ়ে নির্য্যাতনে ও আত্মসমর্পণে, তেমনি শেষ জীবনে উভয়ের তিরোধানের মধ্যে সাদৃশ দেখিয়া আমরা বিহ্বল হইয়াছি। তাঁহাকে দমন করিতে দেশের কতকত কুলাঙ্গার চরদিগকেও নিযুক্ত করা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি শেষ দিন পর্য্যন্ত আপন লক্ষ্য পরিত্যাগ করেন নাই। এই জন্যই ভারতের লোকেরা তাঁহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছিল। এরূপ ভালবাসা এদেশে আর কেহ পাইয়াছেন বলিয়া শুনি নাই। তিনি ইংরাজি ভাষায় অগাধ পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু তাহার খাতিরে স্বধর্ম্ম ও নিষ্ঠা পরিত্যাগ করেন নাই, তিনি উকীল হইয়াও অর্থলোলুপতার বশবর্ত্তী হইয়া ঐ ব্যবসা করেন নাই। তিনি ভারতীয় দর্শনাদি ও পাশ্চাত্য বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াও তাহাকেই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য করেন নাই। তিনি সুবক্তা ছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহাকেও জীবনের একমাত্র ব্রত করেন নাই। ম্যাটসিনির ন্যায় কলম তাঁহার হাতে ছিল এক দুর্জ্জয় শক্তি, যাহা তাঁহাকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী করিয়াছিল। তাঁহার কলম অগ্নিবর্ষণ করিত সকলকে তাহা দগ্ধ করিত, কিন্তু তাহাও তদীয় জীবনের একমাত্র বিশেষত্ব নয়। তিনি ধর্ম্মের নিগূঢ় প্রদেশে অন্তঃপ্রবেশ করিয়া এক দুর্জ্জয় চরিত্র-শক্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই যেন ইন্দ্রজিৎ-দস্যু-বধের এদেশে কারণ হইয়াছে। ভেলেণ্টাইন চিরোল ইংলণ্ডের যে রাজতন্ত্রের প্রকট মূর্ত্তি, তাহা তিলক না বুঝিয়াই বিচারপ্রার্থী হইয়া ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন! ভেলেণ্টাইন বা ম্যাজিষ্ট্রেট ইমাম্ব যল বা ষ্টেটস্ম্যানের এত অন্তর্জ্জালা কেন, শুনিতে চাও কি? তাঁহারা এ দেশের ইন্দ্রজিতের প্রতিনিধি। এরূপ প্রতিনিধি এদেশবাসীদের মধ্যেও অনেক আছে। লক্ষ্মণের সংযমপূত গম্ভীর সাধনা যেমন এদেশে মেঘনাধকে বিনষ্ট করিয়াছিল, তেমনি কত দস্যু তিলকের সংযমে জর্জ্জরিত হইয়াছে। ঐ শক্তির নিকট সহস্র সহস্র মেঘনাথ-বধ হইবেই হইবে।

বোম্বের কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি এক সময় কলিকাতার কোন একজন বক্তার কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "শুনিয়াছি, বাঙ্গালীরা বেশ বক্তৃতা বলিতে পারে, কিন্তু কাজের বেলায় তাঁহারা কিছুই নয়।" এক বিদ্যাসাগরকে বাদ দিলে, একালে, রামমোহন রায়ের পরে, কলিকাতায় কথা ও কাজের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছেন, এমন দ্বিতীয় ব্যক্তি দেখা যায় না। বোম্বের রানাডে, দাদা ভাই নরোজি, গোখলে, মেটা, পরাঞ্জপে, তাতা প্রভৃতির তুলনা দিতে পারি, বাক্সর্ব্বস্ব বাঙ্গালায় এরূপ লোক দেখি না। গবর্ণমেণ্ট নিরপেক্ষ

হইয়া আজীবন বাঙ্গালী নেতা আপন সাধনা-পথে চলিতে পারিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত বাঙ্গালায় বড় বিরল। ধুঞ্চি মাথায় দিয়া সাহেব সাজা সোজা, চুরুট মুখে দিয়া ফিরিঙ্গি হওয়া সহজ, অপিচ অসংখ্য উপাধি পুচ্ছে বাঁধিয়া ময়ূরের ন্যায় শোভিত হওয়াও সহজ, কিন্তু জেনেরেল বুথের ন্যায় আজীবন লক্ষ্য পথে চলা, বা ম্যাটসিনির ন্যায় আজীবন দেশের জন্য কষ্ট, নির্ব্বাসন ও নির্য্যাতন সহ্য করা তত সহজ নয়। এইজন্যই মহাত্মা তিলক এদেশে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহাই ধর্ম্ম, তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাই বেদবেদান্ত, তিনি যে পথে চলিয়াছেন, তাহাই নীতি। তাঁহার দেশ-সেবা তাঁহার ধর্ম্ম, তাঁহার রাজনীতি তাঁহার ধর্ম্ম, তিনি যাহা করিতেন, ধর্ম্মানুপ্রাণনেই করিতেন। ধর্ম্ম ভিন্ন তিনি কিছুই জানিতেন না। তদীয় চরিত্রের অমানুষিক শক্তির তেজে এক শ্রেণীর লোকের বদন ঝলসিয়া গিয়াছিল, তাই তাহাদের এত অন্তর্জ্বালা। তাঁহার সমতুল্য শক্তি এদেশে আর কাহারও নাই।

তাঁহাকে লোকেরা আদর করিয়া "তিলক মহারাজ" বলিয়া ডাকিত। তাহা শুধু গীতার ভাষ্য বা আরটিক প্রদেশের গভীর গবেষণাময় তত্ত্বনিরূপণের জন্য নয়, তাহা কেবল, তাঁহার প্রতিভা বা বুদ্ধির প্রাখর্য্যের জন্য নয়। তাহা তদীয় বিশেষত্বময়, আত্মত্যাগময় এমন এক জিনিস, তাহা মানুষকে স্বতঃই রাজ উপাধিতে ভূষিত করে। মহাত্মা রামমোহন রায় স্ব-উত্থিত রাজা, খ্রীষ্ট স্ব-উত্থিত মহারাজা, শ্রীচৈতন্য স্ব-উত্থিত মহারাজা। তিনি স্বদেশের সেবার সময় আপনাকে ভুলিয়া যাইতেন, নিজের যশ মানের কুহক তাঁহার চরিত্রের ত্রিসীমায় পৌছিতে পারিত না, তিনি আত্মত্যাগী সংযমপূত মহাতেজেই এদেশের মহারাজা। তাঁহার ন্যায় অকৃত্রিম স্বদেশ-নেতা আর নাই। এই মহারাজা নাম-করণেই এই নেতৃত্বের পরিচায়ক। সত্যই তিনি মানব-প্রাণে আপনার প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে আমরা গণতন্ত্রের রাজার রাজা মহারাজা বলিয়া কোটি কোটি প্রণাম করিতেছি। বোম্বে নরোজি-মেটা-গোখলে-তিলক-পরাঞ্জপে রূপ দেশানুরাগের প্রোজ্জল পঞ্চপ্রদীপ লইয়া চিরদিন নব্য-ভারতের উদ্বোধনের আরতি করিতে থাক, তোমাকেও আমরা কোটি কোটি প্রণাম করিতেছি। ধন্য তিলক, ধন্য বোম্বে, ধন্য মারহাট্টা-জাতি।

জীবন-কথা।

"১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুলাই বোম্বাই প্রদেশের রত্নগিরিতে বালগঙ্গাধর তিলকের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা গঙ্গাধর রামচন্দ্র তিলক প্রথমে স্থানীয় স্কুলের শিক্ষক ছিলেন; পরে তিনি পুণার শিক্ষা বিভাগের ডেপুটি-ইন্স্পেক্টর হইয়াছিলেন। ১৮৭২ খ্রীঃ ম্যাট্রি-কুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিলক পুণার ডেকান কলেজে প্রবেশ করেন। ১৮৭৭ সালে তিনি সেখান হইতে অনার্স লইয়া বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৭৯ খ্রীঃ তিনি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের পরী-ক্ষায় উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

কিছুতেই সরকারী চাকুরী গ্রহণ করিবেন না সঙ্কল্প করিয়া বালগঙ্গাধর তিলক কতিপয় বন্ধুর সহিত মিলিয়া ১৮৮০ খ্রীঃ ২রা জানুয়ারি পুনায় 'নিউইংলিশ ইস্কুল নামে এক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। সঙ্গে সঙ্গে "কেশরী" এবং

"মারহাট্টা" নামক সংবাদপত্রও তাঁহাদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়।

"কেশরী" এবং "মারহাট্টা" উভয় পত্রেই কোলাপুরের রাজার প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনা বাহির হইয়াছিল। কোলাপুর রাজ্যের কারবারী এজন্য মাণহানির মোকদ্দমা রুজু করেন। বিচারে তিলকের এবং তাঁহার সহযোগী আগরকরের চারি মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড বিহিত হয়। এই বিচার ও দণ্ডের ফলে, দণ্ডিত দুইজনের প্রতি দেশের লোকের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি বাড়িয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের কার্য্যোদ্দম আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

এই সময়ে সহবাস-সম্মতি আইন লইয়া মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়। তিলক এই আইনের বিরুদ্ধে ঘোর আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। প্রজার সামাজিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ব্যাপারে বিদেশী গবরমেণ্ট আইন বাঁধিয়া দিবেন, তিনি ইহার ঘোর বিরোধী। এই সময়েই তিনি বিদ্যালয়ে আইন পড়াইবার জন্য একটী বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। হাইকোর্টের ও জেলা কোর্টের উকীল তৈয়ারী করাই উদ্দেশ্য।

১৮৯৬ এবং ১৮৯৭ খ্রীঃ মহারাষ্ট্র দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ ও প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয়। দুর্ভিক্ষের এমন তীব্রতা এদেশে আর কখনও অনুভূত হয় নাই। তিলক এই পীড়িত প্রজাপুঞ্জের প্রাণরক্ষার জন্য তাঁহার স্বাভাবিক উৎসাহ ও উদ্যম লইয়া আত্ম-নিয়োগ করেন। তিনি গবরমেণ্টকে দুর্ভিক্ষ আইন অনুসারে যথাবিহিত ব্যবস্থা করিতে বলেন এবং পুনায় সুলভ খাদ্যশস্যের দোকান খুলিয়া দেন। প্লেগে আক্রান্ত রোগীদের সেবা-শুশ্রূষার জন্য একটী প্লেগ-হিন্দু-হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি রোগীদের কাছে কাছে থাকিয়া তাহাদের তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন। তাহারই যত্নে সেবার অনেক লোক রক্ষা পাইয়াছিল। প্লেগ প্রতিষেধের জন্য গবরমেণ্ট যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহার অসুবিধার কথা তিলক লেখালেখি করিয়া কর্তৃপক্ষের কর্ণগোচর করিয়াছিলেন।

১৮৯৭ খ্রীঃ ১৫ই জুন তারিখের "কেশরী" পত্রে শিবাজী উৎসব সম্বন্ধে এক বিবরণ প্রকাশিত হয়। ২২শে জুন কে বা কাহারা মিঃ র‍্যাণ্ডকে এবং লেফটেনাণ্ট আয়ার্ষ্টকে খুন করে। গবরমেণ্ট সন্দেহ করেন,—এই হত্যাকাণ্ডের সহিত 'কেশরী'র ঐ প্রবন্ধের একটা সম্বন্ধ আছে। এই সন্দেহক্রমেই গবরমেণ্ট তিলককে গ্রেপ্তার করিতে হুকুম দেন। যথাকালে হাইকোর্টে বিচার আরম্ভ হয়। বহুকষ্টে তিলক জামিনে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। পাঁচজন ইউরোপীয়, একজন ইহুদী, দুইজন হিন্দু এবং একজন পার্শী জুরি লইয়া জজ এই মোকদ্দমার বিচার করিয়াছিলেন। ছয় জন ইউরোপীয় তাঁহাকে দোষী এবং তিন জন ভারতীয় তাঁহাকে নির্দ্দোষ বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। ফলে, তিলকের রাজদ্রোহের অপরাধে দেড় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। প্রিভিকাউন্সিলে ইহার বিরুদ্ধে আপীল হইয়াছিল। মিঃ এস্কুইথ তিলকের পক্ষে এই মোকদ্দমা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে কোন ফল হয় নাই। পরে, প্রফেসর ম্যাক্সমুলার এবং উইলিয়ম হণ্টার তিলক একজন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন পণ্ডিত বলিয়া তাঁহার প্রতি করুণা করিবার জন্য মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নিকট আবেদন করেন। অনেক লেখালেখির পরে, গবর্ণমেণ্টের

বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিয়া, লিখিয়া কিম্বা কোন কাজ করিয়া অসন্তোষ উৎপাদন করিবেন না, এইরূপ সর্ত্তে সম্মতি জানাইয়া তিলক অব্যাহতি পাইয়াছিলেন।

রাজদ্রোহের দায় হইতে নিষ্কৃতি লাভের পরেও তিলক স্বচ্ছন্দ হইতে পারেন নাই। ইহার পরেই তিনি তাই-মহারাজের মোকদ্দমায় পড়েন। তাই-মহারাজের স্বামী তিলকের বন্ধু ছিলেন। তিনি এক উইল করিয়া তিলককে তাঁহার একজিকিউটার করিয়া যান। তিলক বিশেষ যত্নের সহিত কাজ করিয়া তাঁহার বন্ধুর বিশৃঙ্খল সম্পত্তির শৃঙ্খলা-সাধনে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু তাঁহার শত্রুরা তাই-মহারাজকে বুঝাইয়া দেয় যে, তিলক যাহা করিতেছেন, তাহা তাই মহারাজের স্বার্থের প্রতিকূল। ফলে, পুনারজেলা-জজ মিঃ এষ্টনের আদালতে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ২৯শে জুলাই মোকদ্দমা রুজু হয়। ১৯০৪খ্রীষ্টাব্দে মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত এই মোকদ্দমা চলিয়াছিল। দীর্ঘকাল বিচারের পর স্পেসাল মাজিষ্টর মিঃ ক্লেমেন্টস্ তিলককে দোষী সিদ্ধান্ত করিয়া তাঁহার আঠার মাস কঠোর কারাদণ্ডের আদেশ করেন। সেসন জজের নিকট আপীলে দণ্ড কমিয়া ছয় মাস হয়। হাইকোর্টে পুনরায় আপীল হইয়াছিল। হাইকোর্টের বিচারে তিলক নির্দ্দোষ বলিয়া বেকসুর খালাস পান।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে আর একবার তিলক মোকদ্দমায় জড়িত হন। মজঃফরপুরে বোমা বিভ্রাটের ফলে দুইজন ইংরেজ-রমণী নিহত হইয়াছিল। চারিদিকে মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়। এদেশী এবং এংলো ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রসমূহ বিপ্লববাদীদের নিন্দা করিয়া প্রবন্ধ লিখিতে থাকেন। এদেশী সংবাদপত্র সমূহ বলেন,—দমন-নীতি প্রয়োগ করা আর উচিত নহে; কিন্তু এংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্র সমূহ দমন-নীতিই প্রয়োগ করিতে গবরমেণ্টকে উপদেশ দেন। এই সময়ে তিলকের "কেশরী" সংবাদপত্রে এই রাজদ্রোহিতা সম্বন্ধে ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সব প্রবন্ধে নির্ভীকভাবে সকল অবস্থার আলোচনা করিয়া বলা হইয়াছিল,—বোমা ব্যবহার খুবই খারাপ বটে, কিন্তু গবরমেণ্ট দমন নীতি অনুসরণ করিয়া অবস্থাটী আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছেন। এখন দমন-নীতি পরিত্যাগ করিয়া গবরমেণ্টের প্রজাদিগকে বিশেষ সুবিধা দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু গবরমেণ্টের ধারণা হয়,—এই সব প্রবন্ধে বোমা ব্যবহারের সমর্থন করা হইয়াছে। ফলে,হঠাৎ তিলক গ্রেপ্তার হন। তাঁহাকে জেলে রাখা হয়। তিলক ঐ সব প্রবন্ধের লেখক নহেন, তথাপি তিনি সাহসিকতার সহিত ইহার সকল দায়িত্ব স্বীকার করেন। তাঁহাকে কিছুতেই জামিনে খালাস দেওয়া হয় নাই। ইহাতে জেলে থাকার কষ্ট ত হইয়াছিলই, তাহা ছাড়া তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য প্রস্তুত হইতেও পারেন নাই। ১৩ই জুলাই হাইকোর্টে বিচার আরম্ভ হয়। সাতজন ইউরোপীয় এবং দুইজন পার্শী জুরি লইয়া জজ বিচারে বসেন। প্রবন্ধগুলি মহারাষ্ট্রভাষায় লিখিত, জজ এবং জুরি উভয়েই ইহার কিছুই বুঝেন না। তিলক নিজেই নিজের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন; মোকদ্দমার তৃতীয় দিনে অপরাহ্ণে তিনি বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করেন; অষ্টম দিনের অর্দ্ধেক সময় পর্য্যন্ত তাঁহার বক্তৃতা চলিয়াছিল। তিলক জেলের মধ্যে থাকিয়া প্রস্তুত হইবার পক্ষে কোনরূপ সুবিধা পান নাই। তথাপি তিনি যে ভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন, তাহা বস্তুতই তাঁহার অসা-

ধারণ শক্তির পরিচায়ক। এডভোকেট জেনারেল মিঃ ব্রান্সন সেইদিন ইহার উত্তরে পাল্টা-বক্তৃতা করেন, তিনি শ্লেষের ভাষায় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা একেবারে সৌজন্য-বর্জ্জিত; কিন্তু তিলক কখনও সৌজন্য ত্যাগ করেন নাই। মিঃ ব্রান্সন ৫টা পর্য্যন্ত বক্তৃতা করেন। জজ বলেন,—রাত্রি পর্য্যন্ত এজলাস করিয়া এই দিনই মোকদ্দমা শেষ করিতে হইবে। পরলোকগত মিঃ ডাভার জজ ছিলেন। তিনিও তিলকের প্রতিকূল ভাবে মোকদ্দমা গুছাইয়া দেন। রাত্রি ৮টার সময় জুরিবা পরামর্শ করিতে উঠেন। রাত্রি ৯টা ২০ মিনিটের সময় তাঁহারা ফিরিয়া আসিয়া বলেন,—সাতজনের মতে তিলক দোষী; দুইজনের মতে নির্দ্দোষ। তিলকের ছয় বৎসর দ্বীপান্তর এবং এক হাজার টাকা জরিমানার আদেশ হয়। তিলকের দণ্ড হইয়াছে শুনিয়া বোম্বাইর লোকেরা ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল। দোকান পাট বন্ধ হয়, মজুরেরা কাজ কর্ম্ম বন্ধ করে; কোথাও কোথাও দাঙ্গাহাঙ্গামাও হইয়াছিল। কিন্তু তিলক নিজে নিরুৎসাহ হন নাই! জুরিদের মন্তব্য শুনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন,—"আমার একমাত্র বক্তব্য এই যে, জুরিদের সিদ্ধান্ত শুনিয়াও আমি বলিতেছি, আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধ। সকলেরই উপরওয়ালা একজন আছেন, তাঁহার নির্দ্দেশেই সকল কাজ হইয়া থাকে। তাঁহার ইচ্ছায় হয়ত এমন হইতে পারে যে আমি স্বাধীন থাকিলে আমার গৃহীত এই কাজ যতটা সাফল্য লাভ করিত, আমার নির্য্যাতনে তাহার অপেক্ষা অধিক সাফল্য লাভ করিবে।" তিলক ছয় বৎসর কাল মান্দালয় জেলে আবদ্ধ ছিলেন। এই জেলে অবস্থান কালে তিনি বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে গীতা পাঠ করিতেন। ১৯১৪ খ্রীঃ তিলক অব্যাহতি লাভ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসেন। মহারাষ্ট্রের জন-সাধারণ এই সময় বহুদিনের পর গৃহ-প্রত্যাগত পিতার সম্মুখে পুত্রের মত তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছিল।

১৯১৬ খ্রীঃ মে এবং জুন মাসে তিলক বোম্বাই প্রদেশের নানা স্থানে ঘুরিয়া বড় বড় সভায় মারাঠী ভাষায় বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করেন। স্বায়ত্ত-শাসন-সমস্যাই এই সব বক্তৃতার মূল বিষয়। এই সময় জন-সাধারণের উপর তিলকের প্রভূত প্রভুত্বের পরিচয় পাইয়া কর্ত্তৃপক্ষ বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা তিলকের নিকট হইতে ভালভাবে থাকিবার জন্য ৪০০০০, চল্লিশ হাজার টাকার জামিন লইবেন স্থির করেন। তিলকের উপর ঐ মর্ম্মে নোটিশ জারি হয়। পুণার মাজিষ্টর ঐ নোটিশ জারি করিয়াছিলেন এবং এক পুরাতন পদ্ধতিক্রমে নিজেই জজের অধিকার লইয়া নিজের হুকুম বাহাল রাখিয়াছিলেন। বোম্বাই হাইকোর্টে আপীল হয়। এবারও বোম্বাই হাইকোর্ট বৃটিশ ন্যায়-বিচারের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন। জজেরা সিদ্ধান্ত করেন,—তিলকের বক্তৃতা যতই তীব্র হউক, তাহা বর্ত্তমান স্বায়ত্ত-শাসনপদ্ধতির সমালোচনা ব্যতীত আর কিছুই নহে; ইহা গবরমেণ্টের সমালোচনা আদৌ নহে। তাঁহারা আরও বলেন যে, তিলক একস্থানেও বৃটিশ গবরমেণ্টকে আক্রমণ করেন নাই, বৃটিশ সংশ্রব রাখারও প্রতিবাদ করেন নাই, সুতরাং তাঁহার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ হইতে পারে না। জজেরা এই প্রসঙ্গে স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, বক্তৃতার দুই এক স্থানের

দুই একটা কথা ধরিয়া বিচার করিলে ঠিক হইবে না; সমগ্র বক্তৃতা এক করিয়া পড়িয়া দেখিতে হইবে, তাহার ভাববত কোন দোষ আছে কিনা। ফলে, তিলককে জামিনের টাকা ফেরৎ দেওয়া হয়।

আইনের আমলে আমলা-তন্ত্র তখন অন্য উপায়ে তাঁহাকে আটক করিতে চেষ্টা করে। হাইকোর্ট হইতে রেহাই লাভের সঙ্গে সঙ্গেই ভারত-রক্ষা-আইন অনুসারে তিলকের উপর পঞ্জাব ও দিল্লী প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। তবে, মিঃ মণ্টেগুর সহিত তিলক যখন দেখা করিতে চাহেন, তখন তাঁহাকে ভারত-গবরমেণ্ট দিল্লী প্রবেশে অনুমতি দিয়াছিলেন।

যেদিন পুণার ম্যাজিষ্টর উল্লিখিত নোটিশ জারি করেন, সেই দিন তিলকের ৬১ বাৎসরিক জন্মোৎসব উপলক্ষে বিশেষ সমারোহের আয়োজন হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রের জনসাধারণ এই দিন তাঁহাকে একলক্ষ টাকা দিয়া অভিনন্দিত করে।" বঙ্গবাসী।

দক্ষিণ-ভ্রমণ।

(১০৭ পৃষ্ঠার পর)

রামেশ্বর ষ্টেসন ছাড়িয়াই পাম্বাম ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। পূর্ব্বদিবসে যে বন্ধুটী আমার লগেজ ইত্যাদি লইয়া পাণ্ডার গৃহে রাখিয়া আসিয়াছিলেন, দেখিলাম, তিনি ষ্টেসনে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি আমাকে যে প্রকার সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিলাম। গাড়ী ছাড়িয়াই সমুদ্রের পুলের উপর উঠিল। গত কল্য সাধ মিটাইয়া সমুদ্রের ও তদুপরিস্থ পুলের শোভা দেখিতে পাই নাই, সেইজন্য অদ্য ভাল করিয়া দেখিব মনে করিয়া পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আজও সাধ মিটাইয়া দেখিতে পারিলামনা। দেখিতে না দেখিতে গাড়ী সমুদ্রের অপরপারে উপস্থিত হইল। মনে ভাবিলাম, হায় রে! এ জীবনে আর কখন এই দৃশ্য দেখিতে পাইব না, কিন্তু ইহার শোভা দেখিয়া একটুও সাধ মিটিল না। এসংসারে এই প্রকারেই কোন সাধ মিটে নাই। সেই জন্যই কবি বলিয়াছেন "সাধ কখন মিটে না ভাই সাধে পড়ুক বাজ।" বাল্যকালে কত সাধ করিয়াছিলাম, যৌবনে সংসার ধর্ম্ম করিয়া মনের সাধ মিটাইব, কিন্তু তাহা ঘটে নাই। যৌবনে সংসার-ধর্ম্ম পাতাইয়া বসিতে না বসিতে স্ত্রীপুত্র লইয়া কত খেজালত ভোগ করিলাম। একদিনের জন্যও শান্তি পাইলাম না, নিজেরও স্ত্রীপুত্রদের পেটের চিন্তায় অস্থির হইয়া কত কষ্টই না ভোগ করিলাম। তৎপর সন্তানগুলি একটু বড় হইতে না হইতে সহধর্ম্মিণী ত্যাগ করিয়া গেলেন। যে খেজালতগুলি দুই জনে খাটিয়াও মিটাইতে পারিতাম না, তাহা নিজের স্কন্ধে পতিত হওয়ায় কত যে কষ্ট পাইলাম, তাহার ইয়ত্বা নাই। এখনও কিন্তু সাধ মিটাইবার আশা ত্যাগ করিতে পারিলাম না, মনে করিলাম, সন্তানগুলি বড় হইয়া রোজগার করিতে শিখিলে আমি সাধ পুরাইব, তাহাদের স্ত্রীপুত্র লইয়া মনের সাধে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিব, কিন্তু তাহাও ঘটিল না। এক এক জন এক এক প্রকৃতি ধারণ করিতে

লাগিল। তাহাদিগকে লইয়া সংসারে শান্তিতে থাকিতে পারিব, এরূপ আশা ছাড়িয়া দিয়া নিজে কষ্ট ত্যাগ করিয়া ভজন সাধন করিবার জন্য স্থির সংকল্প করিলাম। সুবিধাও বেশ ঘটিল, কিন্তু ভজন সাধন একটুও হইল না। নির্জ্জনে বসিয়া ভগবানের নাম জপ করিতে করিতে পুত্র-কন্যাদিগের ভাবনাই ভাবিতে থাকি। জপ ছাড়িয়া ভগবানের রূপ ধ্যান করিতে গিয়া দেখিতে পাই যে, হৃদয়কন্দরে ভগবানকে বসাইব, তথায় পুত্র কন্যাগণ বসিয়া রহিয়াছে, ভগবানের রূপ কোথায় চলিয়া গিয়াছে। বাহিরে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সাধকের ভাণ করিয়া সন্তানদিগকে ধ্যান করিতেছি। এই বৃদ্ধ বয়সেও তাহাদের চিন্তা ত্যাগ করিতে পারিলাম না। বহুকাল হইতে যে সাধ করিয়া আসিতেছিলাম, তাহা আর মিটিল না। এখন মনে হয়, সংসারে সকলের মধ্যে থাকিয়া ভজন সাধন করিলে বোধ হয় সাধ মিটিত। অনেক বন্ধুগণ ও গুরুজন এই প্রকার উপদেশ দিয়া থাকেন। কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়, তাহা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। সংসারে নানা প্রকার অশান্তির মধ্যে থাকিতে হয়। সংসারে থাকিলেই ঝগড়া, হিংসা দ্বেষ, মামলা মকর্দ্দমা ইত্যাদিতে জড়িত হইতে হয়। যে কঠিন মন একটী বস্তুতে স্থির রাখিতে অক্ষম, তাহা এতগুলি বিষয়ে জড়িত রাখিয়া ভগবানের প্রতি দৃষ্টি রাখা আমার পক্ষে অত্যন্ত অসম্ভব। তাই সদা সর্ব্বদাই ভাবি, কি করিব, কোথায় যাইব। আর ত দিন বাকী নাই। শাস্ত্র গ্রন্থাদিতে পাঠ করিয়া থাকি, এই জীবনে যাহাদের আত্মজ্ঞান জন্মিল না, তাহারা নিতান্তই হতভাগ্য। এমন বুঝিতে পারিতেছি, ভগবানের কৃপা না হইলে কাহারও কোন সাধ মিটে না।

ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখিতে বসিয়া, খেয়াল বশতঃ অপ্রাসঙ্গিক কয়েকটী কথা লিখিলাম। ভরসা করি, পাঠকগণ বিরক্ত না হইয়া আমাকে ক্ষমা করিবেন।

আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীতে অনেকগুলি ভদ্র লোক ছিলাম—প্রত্যেক কামরায় তিনজন থাকিবার নিয়ম, কিন্তু একটী কামরাতে দুই-জন বিশিষ্ট মাদ্রাজি ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন। তাঁহাদের আকৃতি প্রকৃতি এবং বেশভূষা দেখিয়া বোধ হইল, তাঁহারা বিশেষ ধনী লোক। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ সামান্য বেতনভোগী একজন ফিরিঙ্গির নিকটও তাঁহাদের বসিবার ক্ষমতাও নাই। একটী ষ্টেশনে একজন ফিরিঙ্গি—বোধ হইল Traffic Inspector or Audit Inspector হইবেন, গাড়ীর নিকট আসিয়া বসিবার স্থান না পাইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। উচ্চ বেতনের কর্ম্মচারী হইলে অবশ্যই প্রথম শ্রেণীতে যাইতেন। কিন্তু তথায় না যাইয়া সঙ্গীয় চাপরাশীকে ঐ ভদ্রলোক দুইটীকে নামাইয়া দিতে হুকুম করিলেন। হুকুম তামিল হইল, ভদ্রলোক দুইটী বিনা বাক্য-ব্যয়ে নামিয়া অন্য কামরায় গমন করিলেন। সাহেব গাড়ীতে উঠিয়া শয়ন করিলেন। ভদ্রলোক দুইটীর নিরীহ ব্যবহার দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। এক আধ ঘণ্টার জন্য গাড়ীতে উঠিয়া একটু বসিবার স্থানের জন্য সাহেবের সঙ্গে বিবাদ করিয়া নিজের দুঃখ কষ্ট নিজে আনয়ন করাটা একেবারেই সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। গাড়ী সাহেবদের, দেশ সাহেবদের, শাসনও তাহাদের, সুতরাং বিনা বাক্যব্যয়ে নামিয়া যাওয়াই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। এই ব্যাপারটী চক্ষে দেখিয়া কবির কথা মনে পড়িল,—

"নিজবাস ভূমে পরবাসী হ'লে"
"পরদাস খতে নিজ নাম দিলে"

দেশের অবস্থা, নিজেদের পরাধীনতা ইত্যাদি মনে মনে আলোচনা করিতে করিতে মাদুরা পৌছিলাম। এই স্থানটী ভ্রমণকারীর পক্ষে বিশেষ দর্শনীয়—বেলা প্রায় দুইটার সময় তথায় নামিলাম। আমার সঙ্গে কেহ নাই, তথায় অন্য কোন সহযাত্রীও পাইলাম না, সুতরাং দ্বিতীয় শ্রেণীর বিশ্রাম-গৃহে উপস্থিত হইলাম। তথায় নিজের লগেজ ইত্যাদি রক্ষা করিয়া একাই সহর দেখিতে যাইবার মতলব করিতেছি, এমন সময় একজন যুবক আসিয়া ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি আমার Guide হইতে পারেন কিনা। মনে ভাবিলাম, অপরিচিত স্থানে, অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে বাহির হইলে হয় ত বিপদও ঘটিতে পারে। আবার ভাবিলাম, বিপদই বা কিসের ? যে জন্য পথে, ঘাটে লোকের বিপদ ঘটে, সেই বিপদের কারণ অর্থ আমার নিকট নাই, সুতরাং সাহস করিয়া যুবকের সঙ্গে বাহির হইলাম।

তিনি প্রথমেই আমাকে রাজবাটী দেখা-ইতে লইয়া চলিলেন। এই স্থানকে পূর্ব্বে পাণ্ডরাজ্য বলিত। পাণ্ডরাজ বংশের জনৈক রাজা ত্রিরমুলি এই রাজবাটী নির্ম্মাণ করেন। ইহা দর্শন করিয়া বড়ই আনন্দ পাইলাম, এ প্রকার সুন্দর অট্টালিকা এদেশে আর নাই. সমস্ত গৃহটী খিলান দ্বারা প্রস্তুত, বীম বরগা কাষ্ঠের কোন কার্য্য আদৌ নাই। সমস্ত বাড়ীটী সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। বাহিরে বিস্তৃত আঙ্গিনায় পূর্ব্বে নাকি অষ্ট প্রহর নৃত্য গীত হইত এবং দ্বিতলের বহুবিধ সুন্দর সুন্দর গৃহে উপবেশন করিয়া রাজা এবং রমণীগণ উহা দর্শন শ্রবণ করিতেন। এক্ষণে এই স্থানে ইংরেজের কাছারী বসিতেছে। সুতরাং বহুকাল পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইলেও নিয়মিত ভাবে মেরামত থাকায় পুরাতন বলিয়া বোধ হয় না।

ভিতরে অন্দর মহল। রাণীগণ এই স্থানে থাকিতেন। ইহার আঙ্গিনাটী একটী পুকুরের মত। Guide মহাশয় বলিলেন, এই স্থানটী জল দ্বারা পূর্ণ থাকিত এবং রমণীগণ তথায় মনের সুখে অবগাহন ও জলক্রীড়া করিতেন। রাণীদিগের বাসগৃহগুলি এক্ষণে কাছারীর আফিসে পরিণত হইয়াছে। রাজা ত্রিরমুলি এই অট্টালিকাটী ১৬২৩-১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রস্তুত করেন। Guide মহাশয় বলিলেন, তিনি নাকি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, সেই জন্য প্রজাগণ বিদ্রোহী হইয়া তাহাকে রাজ্যচ্যুত করেন। এই বিষয়টী কোন ইতিহাসে আছে কিনা জ্ঞাত নহি।

মাদুরা সহরকে পূর্ব্বে বীরনারায়ণপুর ও পাণ্ডরাজ্যের রাজধানী বলিত। এই স্থানেই সন্ন্যাসীপ্রবর যমুনাচার্য্য জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি নাথমুনির পৌত্র। বাল্যকালে পিতৃ বিয়োগ হওয়ায় পিতামহ কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, পরে পাণ্ডরাজের সভাপণ্ডিত দিগ্বিজয়ী কোনাহলকে পরাস্ত করিয়া অর্দ্ধ রাজ্য প্রাপ্ত হন। রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধিসহকারে হঠাৎ বৈরাগ্য উপস্থিত হওয়ায় সমস্ত ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এ বিষয়ে পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, তিনি শ্রীরামানুজের গুরুগণের মধ্যে প্রধান ছিলেন।

রাজবাটী দর্শন করিয়া প্রায় ১॥ মাইল দূরে একটী পুষ্করিণী দেখিতে গেলাম। এই পুষ্করিণীর চারিদিকে পাথর দিয়া বাঁধান।

মধ্য গৃহে একটী দ্বীপের উপর সুন্দর একটী মন্দির ও নানাবিধ বৃক্ষশোভিত বাগান আছে। পুষ্করিণীটী দীর্ঘ প্রস্থেও বেশ বড়, কিন্তু জল ভাল নহে। ইহার জল পান করা ত দূরের কথা, অন্যান্য কার্য্যেও ব্যবহার হইতে পারে না। তথায় হস্ত পদ প্রক্ষালন করিয়া মীনাক্ষীদেবীর মন্দির দেখিতে রওনা হইলাম। মন্দিরের সদর দরজায় উপস্থিত হইলাম। তথায় বাজার বসিয়াছে এবং নানাবিধ দ্রব্য বিক্রয় হইতেছে। গাইড মহাশয়ের উপদেশ মত তথায় পূজা উপকরণ দ্রব্যগুলি ক্রয় করিলাম। সে সমস্ত বেশী কিছুই নহে. একটী নারিকেল, একটু কর্পূর, ফুল, চন্দন, সিঁন্দুর প্রভৃতি। গাইড মহাশয় তাঁমিল ভাষায় আর একজনকে ডাকিয়া সঙ্গে লইলেন। একজন আমার আগে আগে চলিতে লাগিলেন,অন্যজন পিছনে থাকিলেন। মন্দিরের ভিতর একটী ছোট গ্রাম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। একটী পুষ্করিণী দেখিলাম, গাইড মহাশয় বলিলেন. এই পুষ্করিণীতে অবগাহন করিলে শত জন্মের পাপ নাশ হয়। আমি ইতিপূর্ব্বেই রামেশ্বর কোটিতীর্থে স্নান করিয়া কোটি জন্মের পাপ ধৌত করিয়া আসিয়াছি। সেই স্থান হইতে সবে মাত্র আট দিন আসিয়াছি, সুতরাং এই অত্যল্প সময়ের মধ্যে আমার এত পাপ সঞ্চয় হয় নাই, যাহাতে আমার এই দুর্গন্ধময় জলে স্নান করিয়া পাপ নাশ করিতে হইবে। পুষ্করিণী অতিক্রম করিয়া একটী ভয়ানক অন্ধকারময় স্থানে উপস্থিত হইলাম। এই স্থানে আসিবা-মাত্র গাইড মহাশয় আমার হস্তধারণ করি-লেন এবং আমি ভয়ে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলাম। আমার হঠাৎ মনে হইল, ইহারা দুইজনে এক্ষণে আমাকে কষ্ট দিয়া যথাসর্ব্বস্ব গ্রহণ করিবে, সেইজন্য অন্ধকারময় স্থানে লইয়া আসিয়াছে। যথাসর্ব্বস্বের মধ্যে আমার হাতে মোট তিনটী টাকা ছিল। মনে হইল, সমস্তই উহাদিগকে ফেলিয়া দিয়া এক্ষণে ফিরিয়া যাওয়াই সঙ্গত। কিন্তু ফিরিয়াই বা উহাদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাই কৈ? আমি অত্যন্ত ভীত হইয়া গাইডকে বলিলাম, "আমার ঠাকুর দেখিবার প্রয়োজন নাই, আমাকে ফিরাইয়া লইয়া চল। আমার বড়ই ভয় হইতেছে।" আমার মনের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া তিনি অভয় প্রদান করিয়া বলিলেন, "এই স্থানটী অত্যন্ত অন্ধকার এবং আপনার অপরিচিত, পাছে আপনি পড়িয়া যান, এই জন্য হাত ধরিয়াছি। আপনার প্রতি আমরা কোন প্রকার অত্যাচার করিব না, আপনি নির্ভয়ে চলুন, ঐ সম্মুখে মীনাক্ষীদেবী দর্শন করুন।" তাহার কথায় বুঝিলাম, আমার ভয় নাই, সুতরাং তাহার হস্ত ধারণ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। দুই তিনটী প্রকোষ্ঠ পার হইয়া এবং নাটমন্দিরের মধ্য দিয়া দেবীর সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। সেই স্থানটীও ঘোর অন্ধকার, কিন্তু অনেকগুলি দীপ জ্বলিতেছে, সুতরাং দেবীকে দেখিতে কষ্ট হইল না। পরে বুঝিলাম, সঙ্গে যে লোকটীকে আনিয়াছে, সেই ঐ স্থানের পুরোহিত। আমার হস্ত হইতে পূজার দ্রব্য-গুলি গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা তামিল ভাষায় পূজা সমাধা করিয়া দক্ষিণা প্রার্থনা করিলেন। আমি কিঞ্চিৎ প্রদান করিলে তিনি ভগবৎ পাদুকা চিহ্নিত মুকুট শঠকোপা আমার মস্তকে ধারণ করিলেন এবং নারিকেল প্রসাদ দিলেন। শক্ত নারিকেলটী আমার ন্যায় দন্তবিহীন লোকের পক্ষে নিতান্তই অকিঞ্চিৎ-কর। সুতরাং উহার সমস্তটাই গাইড মহাশয় গ্রহণ করিলেন।

এখন আমার ভয় সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়াছে। মন্দিরের মধ্যে অন্যান্য স্থান দেখাইবার জন্য গাইডকে অনুরোধ করিলাম. তিনি নানা স্থান দেখাইয়া অবশেষে একটী স্থানে উপস্থিত করিলেন, দেখিলাম, তথায় অনেক স্ত্রীপুরুষের জনতা হইয়াছে। তাহার মধ্যে ৪।৫টী অল্প বয়স্কা ঘোর কৃষ্ণবর্ণা স্ত্রীলোক উপবেশন করিয়া ক্রমাগত মস্তক ঢুলাই তেছে। মস্তকের আলুলায়িত দীর্ঘ কেশগুলি চারিদিকে হেলিয়া দুলিয়া ক্রীড়া করিতেছে, তামিল ভাষায় কি কথা হইতেছে, তাহা অবশ্যই বুঝিতে পারিলাম না। চতুর্দ্দিকে পুরুষ লোকের সংখ্যাই বেশী, তাহারা ঐ সমস্ত স্ত্রীলোকের কথা শুনিয়া মধ্যে মধ্যে উচ্চহাস্য করিতেছে। গাইডকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, পূর্ব্বোক্ত মন্দিরাভ্যন্তরস্থ পুষ্করিণীতে অবগাহনের পর ঐ সমস্ত স্ত্রীলোকের উপর দেবীর আবির্ভাব হইয়াছে। নিকটস্থ পুরুষগণ নানা প্রকার প্রশ্ন করিতেছে এবং উত্তর শ্রবণ করিয়া উচ্চ হাস্য করিতেছে। অনেক পুরুষলোকও উক্ত পুষ্করিণীতে অবগাহন করিতেছে, কিন্তু মজা এই যে, তাহাদের উপর দেবীর আবির্ভাব হয় না। এই যে দেবীর আবির্ভাব বা বারনামা, ইহা কিন্তু ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। সংকীর্ত্তন স্থলে বা কালী পূজা ও শিবপূজা স্থলে প্রায়ই এই প্রকার ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন স্থলে ইহাও দেখিয়াছি, কোন কোন স্ত্রীলোক বা পুরুষ লোকের উপর বার মাসই প্রতি সপ্তাহে এই প্রকার দেবীর আবির্ভাব হইয়া থাকে। কোন কোন স্থানে স্থায়ীরূপে বারমাস বসিয়া গিয়াছে এবং বহুদুর হইতে শত শত লোক তথায় গমন করিয়া নানাবিধ পূজা দিয়া থাকে। এই প্রকার বেশ দুই পয়সা রোজগারও হইতেছে। সম্প্রতি কোন গ্রামে হরিসংকীর্ত্তনের মধ্যে যাইতে যাইতে দেখিলাম, একটী বাঁশ বনের মধ্যে একটী কায়স্থ যুবকের উপর ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের আবির্ভাব হইল। তিনি সেই বাঁশতলাতেই বসিয়া মাথা দুলাইতে লাগিলেন এবং ভক্তগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন।

যে মহাত্মাগণ তত্ত্ব বিষয় মীমাংসা করিতে নিযুক্ত, তাঁহারা এ বিষয় একটা মীমাংসা করিলে মন্দ হয়না। ভারতের সর্ব্বত্রই একই প্রকার অবস্থা ঘটিবার কারণ কি? এ সম্বন্ধে আমাদের পুরাণ ইতিহাস ইত্যাদিতে কিছু লিখিত আছে কিনা জানিবার বাসনা। সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে, সুতরাং আর অধিকক্ষণ মন্দিরের মধ্যে অবস্থিতি করা সঙ্গত নহে মনে করিয়া নাটমন্দির হইতে বাহির হইলাম। প্রথম যে সদর দরজা দিয়া প্রবেশ করিয়াছিলাম, এবার তাহার বিপরীত অন্য দরজায় উপস্থিত হইয়া উহার নির্ম্মাণকার্য্যটী একটু মনোযোগ করিয়া দেখিলাম। দরজাটী বেশ উচ্চ এবং সমস্তই উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত। এই প্রস্তরগুলি অবশ্য বহু দূর দেশ হইতে আনীত হইয়াছিল। প্রস্তরগুলি কাটিয়া নানাবিধ ঐতিহাসিক মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছে এবং সেইগুলিকে স্তরে স্তরে স্থাপিত করিয়া নানা কৌশলে দরজার কার্য্য সম্পন্ন করা হইয়াছে। প্রাচীরগুলি অতি উচ্চ এবং তাহার উপরেও স্থানে স্থানে নানা প্রকার মূর্ত্তি বিশিষ্ট প্রস্তর স্থাপিত রহিয়াছে।

মন্দির হইতে বাহির হইয়া ষ্টেসনের দিকে আসিবার সময় সদর বড় রাস্তার উপর মহা ধুমধাম ও নানাবিধ বাদ্য ও আলোকাদি